স্বর্গত সুধীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের (১৮১০-৮০) সংগ্রহ হইতে

ক্রোড়পত্র, কবিতা
আশ্বিন, ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম : ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮
৭ মে, ১৮৬১

মৃত্যু : ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮
৭ অগস্ট্, ১৯৪১

বাঙালি লেখক ও শিল্পীর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগ এত বড়োই সর্বনাশ যে এ-বিষয়ে কোনো মন্তব্যপ্রকাশও অনাচার মনে হয়, অথচ সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনের দায়িত্ব এমনই নিষ্ঠুর যে আন্তরিক শুদ্ধাচারের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট না-হ'য়ে উপায় থাকে না। মহামানবেরও মৃত্যু যে অনিবার্য, এ-কথা আমরা নিজের মৃত্যুর অনিবার্যতার মতোই ভুলে থাকি, এবং ভুলে থাকি ব'লেই স্বচ্ছন্দে আহারবিহার ও নিজের কাজকর্ম করতে পারি—বিশেষত জরার অগ্রগামী বাহিনীর কাছে আশ্চর্য স্বাস্থ্যের তিল-তিল পরাজয় সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ও চিরকর্মিষ্ঠ জীবন আমাদের মনে যেন এই সংস্কারই বদ্ধমূল করেছিলো যে তিনি অমর। অন্তত এ-কথা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি যে মাত্র আশি বছরেই তাঁর জীবনের অবসান হবে; এ-বছরে প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ প'ড়ে সেদিনও বন্ধুরা পরিহাস ক'রে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের অসুখের খবরটা নিশ্চয়ই বাজে, রোগশয্যায় ও-রকম লেখা কি সম্ভব! যে-দুর্দম প্রাণশক্তির পরিচয় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দিয়েছেন, তার পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনার জন্য আশি বছরও যে যথেষ্ট নয় তার প্রমাণ সাম্প্রতিক রচনাগুলিতে এমন প্রচুরভাবে ছড়ানো যে তাঁর অতি কঠিন রোগসংকটের খবর পেয়েও আমরা মনে-মনে ভেবেছি যে এ-আতঙ্ক অলীক দুঃস্বপ্নের মতোই কেটে যাবে, কোনো অলৌকিক ঘটনার যদি প্রয়োজন হয় তাও ঘটবে, কিছুতেই আমরা বঞ্চিত হ'বো না তাঁর নব-নব রচনার ঐশ্বর্য থেকে, তাঁর সান্নিধ্যের পুণ্যস্নান থেকে। আশি বছরের কাছাকাছি এসে পৃথিবীর মাত্র দু' তিনজন কবিই পেরেছেন সৃজনীপ্রতিভার আভা অম্লান রাখতে; বেশির ভাগ কবিই হয় দীর্ঘজীবী হননি নয় তো শেষজীবনে হয়েছেন নির্বাক কি অধঃপতিত। যদি এমন-কোনো উপায়

আশ্বিন, ১৩৪৮
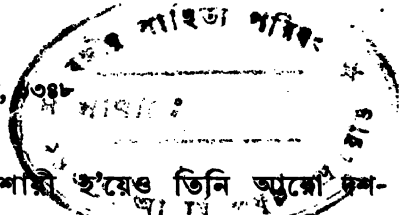
থাকতো যাতে স্থবির ও শয্যাশায়ী হ'য়েও তিনি আরো দশ-পনেরো বছর প্রাণীলোকে থাকতে পারতেন, তাহলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অফুরন্ত প্রবাহিত হ'তো তাঁর সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোত —কখনো ক্লান্ত হ'তেন না, পুরোনো হ'তেন না, ফুরিয়ে যেতেন না। 'পরিশেষ' ও 'পুনশ্চে' তাঁর কাব্যের একটি নতুন পর্যায়ের সূত্রপাত, কিন্তু সেটিই শেষ নয়, তারও পরে নতুন একটি তিথি এসেছিলো পদ্যে 'নবজাতকে' ও গদ্যে 'ছেলেবেলা'য়। কিন্তু এই তিথি অপূর্ণ রইলো, পঞ্চদশী পূর্ণিমায় পৌঁছলো না। তাঁর প্রতিভার অনুযায়ী দীর্ঘজীবন পেলে আরো কত নতুন পর্যায় পার হ'য়ে কোন পূর্ণতায় তিনি পৌঁছতেন আমাদের পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়, কিন্তু এটা ঠিক জানি যে তিনি চলতেন, অজানা থেকে অজানায় ভ্রমণ তাঁর সাঙ্গ হ'তো না। এইজন্যেই এ-কথা মনে না-ক'রে পারিনে যে আশি বছরেও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু অকালমৃত্যু।

অবশ্য এত পেয়েও আরো পেলুম না ব'লে আক্ষেপ করা হয়তো শোভন হয় না, কিন্তু করবোই বা না কেন, সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড়ো প্রতিভাই বা পৃথিবীতে কবে আর দেখা গিয়েছে। তাঁর কথা উঠলেই দান্তে শেক্সপিয়র গ্যোয়টে টলস্টয়ের নাম আমাদের মুখে আসে; কিন্তু সত্যি বলতে তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর আর-কোনো লেখকেরই তুলনা হয় না। শিল্প-সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগে তাঁর তুল্য কেউ-কেউ আছেন সে-কথা ঠিক, কিন্তু একটি বৃহৎ দেশ ও জাতিকে সৃষ্টি করেছেন আর-কোন কবি? আর-কোন কবি নিজের জীবৎকালে তাঁর স্বজাতির হস্তাক্ষর ও আচার-ব্যবহার থেকে শুরু ক'রে অন্তরঙ্গতম ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছেন? হোমর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে

তিনি গ্রীসের স্রষ্টা, কিন্তু হোমরের জীবনকাহিনী ইতিহাসের অংশ নয়, রূপকথার অঙ্গীভূত, তাই এ-কথার যাথার্থ্য অনিশ্চিত। দান্তে ও গ্যোয়টে নিজ নিজ দেশে ও কালে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যত ব্যাপক, যত গভীর, যেমন যুগান্ত-ও জন্মান্তকারী তার তুলনা পেতে হ'লে তাঁদের কাছেই যেতে হয় যাঁরা কোনো-না-কোনো ধর্মের প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রাচ্য কি পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডকে সভ্যতায় দীক্ষিত ক'রে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বতোমুখী প্রতিভা ইতিহাসে কখনো হয়নি এ-কথা আমরা প্রায়ই বলি, কিন্তু আসলে তাঁর প্রতিভা বুদ্ধের কি যীশুর অনুরূপ; যে-উদ্দাম প্রাণস্রোত মরলোকে নবজীবন ব'য়ে আনে সেই প্রাণ তাঁর। এই আধুনিক যুগে 'অবতার' সম্ভব নয়, আজকের দিনে কোনো সৎ ব্যক্তি এসে বলবেন না যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র কিংবা চরম জ্ঞানের অধিকারী, আজ আমরা যে-মহামানবকে দেখবো তিনি আমাদেরই মতো মানুষ, তাঁর সঙ্গে ব'সে খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজবও সম্ভব, সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র হ'য়ে তাঁকে থাকতে হবে না, অথচ তিনি যে সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, আমাদের মধ্যে থেকেও তাঁর দূরত্ব যে অক্ষয় এ-সত্য প্রতি মুহূর্তেই স্পষ্ট হবে। এই মহামানবকে আমরা দেখলুম, আমরা এতই পুণ্যবান। তিনি বাংলা দেশকে একটি নতুন সভ্যতায় দীক্ষিত ক'রে গেলেন, কর্ম দিয়ে নয়, যদিও কর্মও ছিলো, আধ্যাত্মিক সাধনা দিয়ে নয়, যদিও তাকেও অগ্রাহ্য করেননি, তিনি তা করলেন কেবল সাহিত্যরচনা দিয়েই, কেবল কবিতা লিখে, গল্প গেঁথে, গান বেঁধে। এত বড়ো কীর্তি পৃথিবীর আর-কোন লেখকের? ইতালির একজন জন-নায়ক একবার বলেছিলেন, 'আমি পত্ত তৈরি করতে পারিনে, ইতালিকে
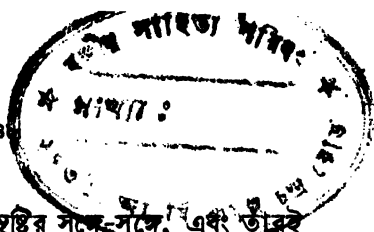
তৈরি করতে পারি।' কিন্তু কাব্য-সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে, এবং তারই ফলে, যে স্বদেশকেও সৃষ্টি করা যায়, রবীন্দ্রনাথের জীবন তারই অনন্য উদাহরণ হ'য়ে রইলো।

আমরা এতই দেরি ক'রে জন্মেছি যে রবীন্দ্রনাথ যতদিন সবল ও সচল ছিলেন ততদিন আমরা তাঁকে প্রায় দেখিইনি, তবু, বয়সের প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ যে পেয়েছি, এমনকি তাঁর স্নেহ লাভেও যে ধন্য হয়েছি, এ-অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের তুলনায় তুচ্ছ মনে হয় আমাদের হতভাগ্য ধিক্কৃত জীবনের সমস্ত পরিতাপ। তাঁর সংস্পর্শে যিনিই এসেছেন তিনিই জানেন তাঁর ব্যক্তিত্বের অনির্বচনীয়তা, তা যেন চারদিকে আলো ছড়ায়, ফুল ফোটায়, সুর ঝরায় —বহু শতাব্দী ধ'রে অসংখ্য ভক্তের আরাধনায় রঞ্জিত হ'য়ে বুদ্ধ কি যীশুর ব্যক্তিস্বরূপের যে অলৌকিক জ্যোতির্ময়তা আজ আজ আমাদের মানসপটে অনির্বাণ, এই গীতময় আভা, এই স্পর্শময় সুর ছাড়া তা আর কী? অসীম তাঁর স্নেহ, অফুরন্ত তাঁর ক্ষমা, তাঁর বাক্যে, তাঁর ব্যবহারে, তাঁর প্রতি ক্ষুদ্র ভঙ্গিতে এমন স্বতঃস্ফূর্ত লাবণ্য যে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই যেন মানবমহিমার পরিপূর্ণ স্বাদ পাওয়া যেতো, আমাদের সকল ক্ষুদ্রতা ও কুশ্রীতা মুহূর্তে ক্ষালন ক'রে নবজাত হ'য়ে ফিরে আসতুম স্বগৃহে ও স্বকর্মে। কী দুর্ভাগা তারা—যারা তাঁকে কখনো দেখলো না।

রবীন্দ্রনাথই যে বাঙালির সভ্যতার উৎস, এ-সত্যে কালক্রমে আমরা হয়তো এতই অভ্যস্ত হ'য়ে যাবো যে কথাটা উল্লেখ করবারও আর দরকার হবে না, কিন্তু এদিকে তাঁর বইয়ের সংখ্যা দু'শোর উপরে, দু'হাজারেরও বেশি গান বেঁধেছেন, ছবি এঁকেছেন

প্রায় দু'হাজার। এ-সব রইলো। এ-সবের মধ্যে তিনি রইলেন। নাম হ'য়ে নয়, স্মৃতি হ'য়ে নয়, প্রত্যক্ষভাবে, জীবন্ত হ'য়ে। এতদিন আমরা বলতুম যে ইংরেজি ভাষা না-জানলে আমাদের পক্ষে সাহিত্যরসের উদার বিচিত্রতা ভোগ করা সম্ভব নয়, আজ এ-আক্ষেপ অচল। যে-কোনো মনীষী, যে-কোনা রসপিপাসু, শুদ্ধু রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প'ড়ে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারবেন, সাহিত্যের কোনো স্বাদ, কোনো সৌরভ থেকেই তাঁকে বঞ্চিত হ'তে হবে না। এমনিও, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা হৃদয়ঙ্গম করা এক জীবনের কাজ. কারণ তাঁর কোনো গ্রন্থই একবার কি মাত্র চার-পাঁচবার পড়লেই ফুরিয়ে যায় না, জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার ও অন্য সমস্ত পঠন-পাঠনের আলোয় বারে-বারেই অপূর্ব হ'য়ে জ্বলে তাঁর বাণী। সুখে দুঃখে উৎসবে অনুষ্ঠানে, সমবেত জীবনের কর্মোদ্যমে আর নির্জন ক্ষণের অসংখ্য ভাবচ্ছায়ায় তাঁর গান আমাদের প্রাণের ভাষা হ'য়ে রইলো, তাঁর হাতের আঁকা ছবিতে আমরা অবাক হ'য়ে চিনবো আমাদের মনের যত অসম্ভব স্বপ্নের চেতন মূর্তি। আর বাংলা ভাষার অনাগত লেখকের দল, যাঁরা আমাদের মতো জীবনের সমস্ত প্রেরণাই তাঁর মধ্যে হয়তো পাবেন না, তাঁরাও মুগ্ধ হবেন তাঁর প্রতিটি গ্রন্থের অনিন্দ্য মধুরিমায়, মনে-মনে তাঁকে স্মরণ না-ক'রে কোনো রচনাই তাঁরা আরম্ভ করবেন না, কেননা যে-ভাষা তাঁদের শিল্পের উপাদান, তা রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি।

শুধু বাংলা ভাষাই নয়, তাঁর সৃষ্টি অন্যান্য লেখকরাও। আজ পর্যন্ত আমরা যারা বাংলা ভাষায় সামান্য রচনায় প্রয়াসী, আমাদেরও স্রষ্টা তিনি। শুধু যে সাহিত্যরচনার কলাকৌশল তাঁর কাছে শিখেছি তা নয়, আমাদের সমস্ত জীবন তাঁর হাতে

গড়া, আমাদের প্রতি চিন্তায়, প্রতি কর্মে, হৃদয়াবেগের প্রতি স্পন্দনে তিনি আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল। তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা প্রেম কি বাৎসল্য কি ঋতুরঙ্গ কিছুই উপভোগ করতে পারিনে, এমন কি তাঁর গান না-হ'লে আমাদের দুঃখের অনুভূতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় না ; মানুষের সঙ্গে, শিশু ও পশু-পাখির সঙ্গে, স্বদেশের, বিশ্বের কি জড়প্রকৃতির সঙ্গে যে-কোনো সম্পর্কস্থাপনই করতে যাই তার মূলে আছে তাঁর প্রেরণা আর তার সার্থকতায় (যদি সার্থক হই) তাঁরই বাণীর বন্দনা। তিনি আমাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন ক'রে আছেন যে তার ব্যাপ্তি উপলব্ধি করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবু জীবনে বার-বার চকিত কোনো মুহূর্তে সহসা বুঝেছি যে তিনিই আমাদের সর্বস্ব।

সেইজন্য, যদিও এটা বুঝি যে সভ্যতার এই সংকটের দিনে তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত বিশ্বই দরিদ্র ও দুর্বল হ'য়ে গেলো, তবু এ-কথাও মনে না-ক'রে পারিনে যে বাঙালি জাতির, বিশেষ ক'রে বাঙালি লেখকদের এ-নিঃস্বতার তুলনা নেই। কেননা যদিও তাঁর কর্ম ও অনুকম্পার পরিধি স্বজাতিজীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে ও সমগ্র বিশ্বজীবনে প্রসারিত, তবু বিশ্বাস করি যে সবার আগে ও সবার উপরে তিনি বাংলাদেশের কবি। সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যে যেমন বাংলার মানুষ, নদী ও ঋতুরই একচ্ছত্র আধিপত্য, তেমনি এটাও দেখি যে যখন বিশ্ব-মানবের সঙ্গে প্রেমের বিনিময়ে ধন্য করেছেন সকলকে, ধন্য হয়েছেন নিজে, সেই একই সময়ে তাঁর প্রাণমন প'ড়ে আছে নগণ্য বাংলা-দেশের ক্ষুদ্র এককোণে। বাংলা ভাষার চেয়ে, বাংলা সাহিত্যের চেয়ে প্রিয় যে তাঁর কিছুই ছিলো না তা এতেই বোঝা যায় যে দ্বিজেন্দ্র-লাল থেকে শুরু ক'রে আজকের নবীনতম লেখক পর্যন্ত যখনই যাঁর রচনায় ক্ষীণতম শক্তির আভাস দেখা গেছে, তিনি

তখনই তাঁকে জানিয়েছেন উন্মুক্ত অভিনন্দন, তাঁর আশীর্বাদ পায়নি এমন হতভাগ্য আমাদের মধ্যে কেউই নেই, বরং আমাদের মতো অতি ক্ষুদ্র অনেক লেখকই তাঁর কাছে প্রাপ্যের অতীত সম্মান পেয়েছে। আমাদের মধ্যে তাঁরই সব মানসপুত্তলিগুলিকে তিনি যখন দেখতেন, এমনকি আমাদের লম্ফঝম্ফও যখন তাঁর চোখে পড়তো, তখন তাঁর মনের অবস্থা লিলিপুশনদের মধ্যে গলিভরের মতো হ'তো কিনা জানি না; কিন্তু এ-কথা নিঃসংশয়ে বলবো যে আমরা সকলেই, অর্থাৎ, যে-কোনো স্তরের যে-কোনো বাঙালি লেখক, যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি তখনই অভিভূত হয়েছি তাঁর উদার অনুকম্পায়, তাঁর ধৈর্যে তাঁর স্নেহে তাঁর অপরূপ আতিথেয়তায়। সর্বত্রই অবমানিত ও উৎপীড়িত যে-বাঙালি সাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথের কাছে, শুধু রবীন্দ্রনাথেরই কাছে, তার সমাদর ও সম্মানের অন্ত নেই; তাঁর শান্তিনিকেতন আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত দেশ। আজকের দিনে স্বতন্ত্রভাবে তাঁকে স্মরণ করাও আমাদের পক্ষে অনর্থক, এমনকি হাস্যকর, কারণ আমাদের সমস্ত জীবনই তো তাঁর, তিনি না-থাকলে আমাদের অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত লোপ পায়, তাই তাঁকে হারিয়ে আজ যতই না শোকাকুল হই এ-কথা কিছুতেই মুখে আনতে পারবো না যে তিনি নেই। আমাদের প্রাণে যেখানে তিনি জ্বলছেন, সেখানে তিনি স্মৃতি নন, ইতিহাস নন, সেখানে তিনি জীবন্ত, তিনি মনোগোচর, এমনকি ইন্দ্রিয়গম্য। তা যদি না হবে তাহ'লে আমরা বেঁচে থেকে সকল কাজকর্ম ক'রে যাচ্ছি কেমন ক'রে?

কবিতা

সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৪৮ ক্রমিক সংখ্যা ২৮

সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা ও সাহিত্যের উৎস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু,

বুদ্ধদেব, কাল তোমার সঙ্গে যখন সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলুম তখন আমি মনে মনে বরাবর জানছিলুম যে অত্যুক্তি করছি। এ রকম জেনে শুনে অত্যুক্তি করার কারণ এই যে, ভিতরে কোনো এক জায়গায় বিরক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে। আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত একথা বার বার শুনেছি এবং বার বার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর কিছু নই—কেবলমাত্র কবি। সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত। বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যস্রষ্টার কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যখন, আমার সেটা অসহ্য হয়। একবার যাওয়া যাক্ কবিজীবনের গোড়াকার সূচনায়।

শীতের রাত্রি—ভোর বেলা, পাণ্ডুবর্ণ আলোক অন্ধকার ভেদ করে দেখা দিতে শুরু করেছে। আমাদের ব্যবহার গরীবের মতো ছিল। শীতবস্ত্রের বাহুল্য একেবারেই ছিল না। গায়ে একখানা মাত্র জামা দিয়ে গরম লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতুম। কিন্তু এমন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অন্যান্য সকলের মতো আমি আরামে অন্তত বেলা ছয়টা পর্যন্ত গুটিসুটি মেরে থাকতে পারতুম। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান সেও আমারই মতো দরিদ্র। তার প্রধান সম্পদ ছিল পুবদিকের পাঁচিল ঘেঁষে এক সার নারকেল গাছ। সেই নারকেল গাছের কম্পমান পাতায় আলো পড়বে, শিশিরবিন্দু ঝলমল করে উঠবে, পাছে আমার এই দৈনিক দেখার ব্যাঘাত হয় এইজন্য আমার ছিল এমন তাড়া। আমি মনে ভাবতুম সকালবেলাকার এই আনন্দের অভ্যর্থনা

সকল বালকেরই মনে আগ্রহ জাগাত। এই যদি সত্য হোত তাহলে সর্বজনীন বালকস্বভাবের মধ্যে এর কারণের সহজ নিষ্পত্তি হয়ে যেত। আমি যে অন্যদের থেকে এই অত্যন্ত ঔৎসুক্যের বেগে বিচ্ছিন্ন নই, আমি যে সাধারণ এইটে জানতে পারলে আর কোনও ব্যাখ্যার দরকার হোত না। কিন্তু কিছু বয়স হ'লেই দেখতে পেলুম আর কোনও ছেলের মনে কেবলমাত্র গাছপালার উপরে আলোকের স্পন্দন দেখবার জন্য এমন ব্যগ্রতা একেবারেই নেই। আমার সঙ্গে যারা একত্রে মানুষ হয়েছে তারা এ পাগলামির কোঠায় কোনোখানেই পড়তো না তা আমি দেখলুম। শুধু তাদের কেন, চারদিকে এমন কেউ ছিল না যে অসময়ে শীতের কাপড় ছেড়ে আলোর খেলা একদিনও দেখতে না পেলে নিজেকে বঞ্চিত মনে করতো। এর পিছনে কোনো ইতিহাসের কোনো ছাঁচ নেই। যদি থাকতো তাহলে সকালবেলায় সেই লক্ষ্মীছাড়া বাগানে ভিড় জমে যেতো, একটা প্রতিযোগিতা দেখা দিত কে সর্বাগ্রে এসে সমস্ত দৃশ্যটাকে অন্তরে গ্রহণ করেছে। কবি যে,—সে এইখানেই। স্কুল থেকে এসেছি সাড়ে চারটার সময়। এসেই দেখেছি আমাদের বাড়ির তেতলার উর্ধ্বে ঘন নীল মেঘপুঞ্জ, সে যে কী আশ্চর্য দেখা। সে একদিনের কথা আমার আজও মনে আছে কিন্তু সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মেঘ সেই চক্ষে দেখে নি এবং পুলকিত হয়ে যায় নি। এইখানে দেখা দিয়েছিল একলা রবীন্দ্রনাথ। একদিন স্কুল থেকে এসে আমাদের পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলুম। ধোপার বাড়ি থেকে গাধা এসে চরে খাচ্ছে ঘাস। এই গাধাগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির বানানো গাধা নয়—এ আমাদের সমাজের চিরকালের গাধা, এর ব্যবহারে কোনও ব্যতিক্রম হয়নি আদিকাল থেকে। আর একটি গাভী সস্নেহে তার গা চেটে দিচ্ছে। এই যে প্রাণের দিকে প্রাণের টান আমার চোখে পড়েছিল, আজ পর্যন্ত সে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। কিন্তু এ কথা আমি নিশ্চিত জানি সেদিনকার সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্য মুগ্ধ চোখে দেখেছিল। সেদিনকার ইতিহাস আর কোনও লোককে এই দেখার গভীর তাৎপর্য এমন করে ব'লে দেয়নি। আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৮
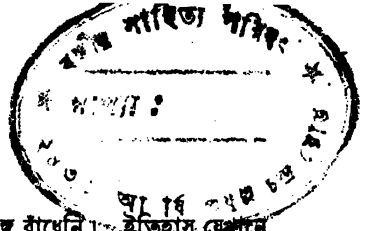
একা, কোনও ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধেনি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ, সেখানে বৃটিশ সবজেক্ট ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্র লীলা চলছিল কিন্তু নারকেল গাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের রাষ্ট্রিক আমদানি নয়। আমার অন্তরাত্মার কোনও রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকশিত হয়েছিল এবং আপনাকে আপনার আনন্দরূপে নানা ভাবে প্রত্যহ প্রকাশ করছিল। আমাদের উপনিষদে আছে, "ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি"। আত্মা পুত্রস্নেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্তারূপে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়। তাই পুত্রস্নেহ তার কাছে মূল্যবান। সৃষ্টিকর্তা যে, তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু বা ইতিহাস জোগায় কিছু বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায় কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপ প্রকাশ করে। অনেক ঘটনা আছে যা জানার অপেক্ষা করে, সেই জানাটা আকস্মিক। এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধকাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ ক'রে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ "কথা ও কাহিনী"র গল্পধারা উৎসের মত নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল সুতরাং বলতে পারা যায় "কথা ও কাহিনী" সেইকালেরই বিশেষ রচনা। কিন্তু এই "কথা ও কাহিনী"র রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ—তাই তো বলেছে আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্যে রেখে ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয়, এবং সেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ, সৃষ্টিকর্তা জানে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত—বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হোত তাহলে সমস্ত দেশ জুড়ে

কথা ও কাহিনীর হরিলুট প'ড়ে যেতো। আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এ সকল চিত্র ঠিক এমন ক'রে দেখতে পায়নি। বস্তুত তারা আনন্দ পেয়েছে এই কারণে, কবির এই সৃষ্টি-কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে। আমি একদা যখন বাংলা দেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল, তার পূর্বে আর কেউ করেনি। কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনা-শালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে বরাবর চ'লে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনও সামন্ততন্ত্র নয় কোনও রাষ্ট্রতন্ত্র নয়। এখনকার সমালোচকেরা যে বিস্তীর্ণ ইতিহাসের মধ্যে অবাধে সঞ্চরণ করেন তার মধ্যে অন্তত বারো আনা পরিমাণে আমি জানিই নে। বোধ করি সেইজন্যই আমার বিশেষ ক'রে রাগ হয়। আমার মন বলে দূর হোকগে তোমার ইতিহাস। হাল ধ'রে আছে আমার সৃষ্টির তরীতে সেই আত্মা যার নিজের প্রকাশের জন্য পুত্রের স্নেহ প্রয়োজন, জগতের নানা দৃশ্য নানা সুখদুঃখকে যে আত্মসাৎ ক'রে বিচিত্র রচনার মধ্যে আনন্দ পায় ও আনন্দ বিতরণ করে। জীবনের ইতিহাসের সব কথা তো বলা হোলো না, কিন্তু সে ইতিহাস গৌণ। কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা-মানুষের আত্মপ্রকাশের কামনায় এই দীর্ঘ যুগ যুগান্তর তারা প্রবৃত্ত হয়েছে। সেইটেকেই বড়ো ক'রে দেখো যে ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা-মানুষের সারথ্যে চলেছে বিরাটের মধ্যে—ইতিহাসের অতীতে সে—মানবের আত্মার কেন্দ্রস্থলে। আমাদের উপনিষদে এ-কথা জেনেছিল এবং সেই উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ করেছি—সে আমিই করেছি, তার মধ্যে আমারই কর্তৃত্ব। তাই তোমাদের ইতিহাসের

শিক্ষা নিয়ে তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে আমিও কোমর বেঁধে লাগব বাড়াবাড়ি করতে।

২

সৃষ্টিকর্তার নানা দান মানুষের জীবনের পাত্র পূর্ণ ক'রে চলেছে। সে সমস্তই তার প'ড়ে পাওয়া। মানুষ তাতে খুশি হয় না। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এমন কিছু চায় যা তার আপনার জিনিস, ধার করা নয়। সৃষ্টির থেকে মানুষ পেয়েছে আপনার ধন, কিন্তু একটা বাড়তির জিনিস পেয়েছে সে হচ্ছে তার আপন মন। সে কেবলই চেয়ে এসেছে যা তার মনের মতো, যা পেয়েছে তার সঙ্গে মেলে না। এই মন কেবল যে চেয়েছে তা নয়, সে যা চায় তা বানিয়েছে। কেননা, যা সে চায়, যা পেলে তার ভাণ্ডার পূর্ণ হয় তা বাইরে নেই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার ক্ষমতা আছে, ভিতরের থেকে তাকে ফলিয়ে তোলে। মানুষের সমস্ত ইতিহাস এই দুই ধারায় অঙ্কিত। এক হচ্ছে—যা তার প্রয়োজন—সে পায় প্রকৃতির নিজ হস্তের পরিবেশন থেকে, তার খাদ্য তার গুহার আশ্রয়, তার নানা কিছু জীবিকার উপকরণ। এই প্রয়োজনের বস্তু প্রচুর তার ভাণ্ডারে, যার অনেক আছে, যথেষ্ট আছে, সে ধনী, যার যথেষ্ট জোটেনি সে গরিব। কিন্তু তবুও প্রয়োজনের সন্ধানে মানুষের দিনরাত্রি তো কাটেনি। সে তার প্রয়োজনের উপকরণকে ছাপিয়ে গিয়েছে। ও সব সঞ্চয়ে একেবারেই নেই, যা তার মন চায়, যাতে তার প্রাণের দরকার। এই মন-চাওয়া জিনিস নিয়ে তার খুব একটা দ্বন্দ্ব চলে। কিছু মনের মতো হ'য়ে উঠেছে, কিছু বা হচ্ছে না। জীবনে যা পাইনি তারই রূপ কিছু বা তার আপন সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে, কিছু বা অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। এই তার প'ড়ে পাওয়া জীবনের পাশাপাশি মানুষ কেবলই আপন মনের মতো সরঞ্জাম সাজিয়ে তুলছে। মানুষ যা আপনার জীবিকার উপকরণ সঞ্চয় করেছে তাতে আপনার পরিচয় নেই—সে বাইরের

---

* এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশের ('সাহিত্যের উৎস') চুম্বক 'সাহিত্য, শিল্প' নামে গত আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিলো। উভয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যদিও এক, এটি বিস্তারিতভাবে লেখা, এবং কবির সম্পূর্ণ বক্তব্য বুঝতে হ'লে এটি পড়া দরকার।—'কবিতা'-সম্পাদক।

জিনিস। মানুষ যা আপনার অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে তার লীলাক্ষেত্র বানিয়ে তুলেছে, যাকে অনায়াসে অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে, তাতেই তার যথার্থ পরিচয়। সর্বকালের সর্বদেশের ইতিহাসে মানুষ আপন সঞ্চয়-ভাণ্ডারের পাশাপাশি আপন পরিচয়-প্রসারের প্রতিষ্ঠা ক'রে চলেছে। সে আপন মনের মতোকে গ'ড়ে তুলে যথার্থ আপনাকে দেখতে পেয়েছে। সেই তার পরিচয় কোথাও বা সুশোভন হয়ে উঠেছে, কোথাও বা তা বর্বর। কিন্তু এই তার আর্ট, এই তার জীবনের স্বরচিত দ্বিতীয় ধারা। এই অপ্রয়োজনীয়ের প্রকাশ দেখেই আমরা মানুষকে বাহবা দিই। বলি, যে-মনের মতোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তাকেই নানা জাতির কীর্তির মধ্যে নানা আকারে দেখতে পাচ্ছি। যাকে দেখে খুশি হই, তাকে দেখতে পাচ্ছি তার সাহিত্যে তার কলানৈপুণ্যে তার নানা অনুষ্ঠানে, যেখানে মানুষের পরিচয় অবিনশ্বর। যাকে দেখে ধিক ধিক বলি তাকে এই শিল্পশালায় আমরা খুঁজিনে। মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে সর্বত্রই এই সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে, যার থেকে দেখতে পেয়েছি কী তার মনের মতো। তাকে বলতে পারো ওসব তো বানানো, ওসব তো ছেলেমানুষি, কিন্তু মানুষের মধ্যে চিরকালের ছেলেমানুষ জয়ী হয়েছে তার কাব্যে, তার গানে, তার রচিত মূর্তিতে, তার চিত্রকলায়। মানুষ ধনীর ধনকে অবজ্ঞা করতে পেরেছে কিন্তু গুণীর কীর্তিকে পারেনি। এই তার প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের যুগল মিলনে মানুষের সম্পূর্ণতা। আশ্চর্য এই সম্পূর্ণতার বিচিত্র রূপ। যে সৃষ্টিকে তুমি আধুনিক বলো বা সনাতনী বলো তার প্রধান প্রেরণা তাই, আর তাই নিয়েই তার আত্মসম্মান। যদি সে এমন কিছু হয় যা চিরকালের মানুষের স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত, যা কদর্যের স্বরূপ দেখে রস পায়—বলে বাহবা, তাহলে বুঝবো মানুষের আর্টের সঙ্গে মানুষের যথার্থ মহিমার কুৎসিত বিচ্ছেদ ঘটেছে। মানুষের জীবনের সম্পূর্ণতা রচনায় তার ফল যে কী তা ক্রমে ক্রমে দেখা যাবে। কিন্তু সেই দুর্দিন যত দূরে থাকে ততই ভালো।

উদয়ন
২৪।৫।৪১

একটি কবিতা

অতিক্রান্ত কতো তরল দিন !
অলস আগুন জ্বলে আকাশে,
প্রাণহীন নগরের ধারে
ধূ ধূ করে ফসল-ঝরা মাঠ।
—রাত্রি তবু ভালো।

তোমার ঘরে আজো নবাবী আমল,
আলো অন্ধকারে পেয়ালা বাজে,
মেঘের মতো বাজে পাখোয়াজের বোল,
শতাব্দীর সঞ্চিত সুরা যেন তোমার গান !
আমার এ স্তব্ধতা ভেঙে দাও,
মাঠে সকালে সবুজ ফসল জ্বালো।
শূদ্রের অসমাপ্ত বৃত্ত পূর্ণ করো
তোমার দানে।

২

যখনি ভেবেছি, নতুন মোড় নিলাম,
হাওয়ায় উড়েছে ধূলো,
মনের আহার্যে বসেছে মাছি।
আর আগেকার লজ্জা, ভয়, গর্ব,
আর সব ব্যর্থতা নিয়েছে সঙ্গ ;
ঘানিটানা অদৃষ্টলিপি,
দিনশেষে কালের মেহেরবাণী যে মামুলি শাস্তি,
তাতে হয়ত শুধু প্রভুদের অধিকার।

আশ্বিন, ১৩৪৮

আর আঁধির পর রুদ্ধমুখ আকাশ স্নিগ্ধ হয়ে আসে,
শরীরের খাঁজে নমনীয় অন্ধকার।
চোখে স্থর্মা টেনে সৌখীন সন্ধ্যা এলো।
সর্বনাশা যতো মেঘ দিগন্তে বন্দী,
এরি মধ্যে পুরাতন অস্বস্তি আমাকে ঘেরে,
দিনশেষের জানোয়ার।

৩

সহর ছেড়ে চলি অনেক দূরের গ্রামে।
সেখানে দেখি, তুখোড় মহাজন,
তার তৃতীয় নয়নের সামনে
জীর্ণ বলদে চষা মাঠে সোনালি ফসল ফলে না,
দিনে দিনে পশ্চিমের যুদ্ধ শক্তিশেল হানে।
তাই অনেক কিষাণ আজ জমায়েৎ, সরবে হাঁকে—
'লাঙল যার জমি তার।'
পড়ন্ত রোদে অনেক বুড়ো চাষা বাইরে ব'সে
উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাপার দেখে,
বৈশাখী দিন আসন্ন, তারাও জানে।

আমাদের ডাল-ভাঙা ক্রোশের শেষ নাই,
গুমোট কাল,
এক দিন ছেড়ে অন্য মজ্জাহীন দিনে হাঁটি;
উড়ন্ত চিল আকাশে নীল বিন্দু,
এক-একবার ঘুঘু ডাকে।

৪

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানুষ, ছিন্নপত্র হাওয়ায়,
এ প্রাচীন জরদ্গব দেশে
বিরোধী স্বার্থের হীন সন্ধিতে
জনসমুদ্র চক্রান্তের সেতুবন্ধে বাঁধা,
আর স্লোগানে আর স্বদেশী গানে
সরবে মাঝে-মাঝে রাস্তার মোড় ভরে।
আমাদের সব আশা আজ আকাশকুসুম।

লোকে লোকারণ্য, কতো লোক
রক্তাক্ত শরীর,
অনেক পঙ্গু আর কবন্ধের ভিড়,
পায়ে পায়ে অনেক প্রাণহীন দেহ লাগে।
অগণন জনগণ অচিরাৎ মিশে যাবে এ ভিড়ে,
রক্তাক্ত শরীর।

৫

বিতর্ক বৃথা ; আজ হৃদয় সঙ্কীর্ণ গলি,
পুঞ্জীভূত জঞ্জাল, দুর্বার দক্ষিণের দিন
ফেরে না আর ফাল্গুনের অপরাহ্নে,
চকিতে আলোড়িত করে ধোঁয়াটে সহর ;
দিনরাত্রি লোহিত ধূলোয় রুদ্ধমুখ আকাশ,
বিতর্ক বৃথা, আজ হৃদয় সঙ্কীর্ণ গলি।

আশ্বিন, ১৩৪৮

প্রণয়-গাথা

বুদ্ধদেব বসু

কবে দেখেছিলেম তোমার
নয়ন-কোণে কুটিলতা,
মিলনহীন প্রেমের দিনে
কী ফুল হ'য়ে ফুটিলো তা !
তোমার চোখে নিয়েছি দেখে যে-স্বপন
চুম্বনের অঙ্গীকারে করিনি তার সমাপন।
হায়রে আমার সাহস হ'লো না,
ভেবেছিলেম নয়নে তব প্রণয়-ছলনা।
বিরহে তবু পেয়েছি তোমা, পেয়েছি,
কটাক্ষের কুটিলতায় আকাশ ছেয়েছি।
জানিনি আমি তুমিও
স্বপ্ন বুনে রাত্রিদিনে করেছো অসহনীয়।
ভাবিনি আমি ভাবিনি
আমারি স্মৃতি জপিছে তব নিদ্রাহারা যামিনী।
ও-বাহুলতা চঞ্চলতা ভুলে
প্রার্থনার ভঙ্গিখানি আপনি নিলো তুলে,
নিঃসহায় ব্যাকুলতায় জড়ালো অমাযামিনী,
আমারি খোঁজে অবুঝ ও যে বুঝিনি আমি জানিনি।
মিলনহীন প্রেমের দিন কাটিলো একে-একে
কোকিল-হানা আতপ্ত বৈশাখে।
আষাঢ় এলো মেঘের ঘনঘটায়,
আকাশে খোলা জানালা কার নয়ন-বাণী রটায়—
এমন সময় তোমার চিঠি এলো,
বানান ভুলে নানান কথা উতল এলোমেলো।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৮
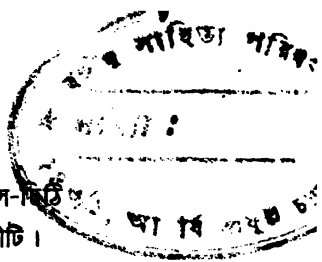
মেঘলা দিনে একলা ঘরে অফুরান সে-চিঠি
গুঞ্জরিলো বিরহিণীর গোপন কাহিনীটি।
হায়রে তবু সাহস হ'লো না,
ভেবে নিলেম লিখনে তব আপন-ছলনা।
বর্ষা কেটে গিয়ে যখন এলো পুজোর ছুটি
খবর পেলুম তুমি যাচ্ছো উটি,
সঙ্গে যাচ্ছে নরেন
বিলেত-ফেরৎ, মস্ত কর্ম করেন।
মনে মনে হেসে বললেম, হায়রে পোড়াকপাল
কত ভাগ্যি একটুকুও হইনি যে বেসামাল।
স্ত্রী-চরিত্র মনস্তত্ত্ব আলোচনার ছলে
খুব খানিকটা মনের জ্বালা ঝাড়া গেলো বন্ধু-মহলে।
পুজোর ছুটি ফুরালো,
শীতের দিন মধুরতায় শরীর-মন জুড়ালো।
বিরহে আমি পেয়েছি তোমা, পেয়েছি,
চাহনি ছেনে কাহিনী বুনে জীবনমন ছেয়েছি।
হারাবে না, হারাবে না,
ঐ চাহনি রইলো আমার চির-চেনা।
যেখানে যাও, যা-খুশি করো, আমার তুমি আমারি,
প্রেম-কলার চরম খেলায় নরেন র'বেন আনাড়ি—
এই কথাটা ভাবছি যখন ক্ষুব্ধ মনের সমস্ত জোর দিয়ে
এমন সময়, প্রিয়ে,
তুমি এলে।
অবাক হ'য়ে দু'চোখ মেলে
দেখি তোমার তরুণ শ্যামল চিকণ তনুখানি
যেন চিরকালের প্রেমের বাণী
হাতে নিয়ে অসহ্য আশ্চর্য কোন আলো,
সামনে এসে দাঁড়ালো।

কথা বললে, ভাঙলো তখন হুঁশ।
বললে, 'ছি ছি, তুমি পুরুষ !
নরেন রায় কি শুধবে তোমার দেনা !
লজ্জা করে না !'
না না, লজ্জা নেই আমার লজ্জা নেই,
জীর্ণ গৃহ তার সজ্জা নেই,
নাও আমার দারিদ্র্যে দীক্ষা,
দাও আমারে পৌরুষে শিক্ষা,
তুমি আমার, তুমি আমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, আমি তোমার, তা তো জানতে,
তবে কেন কাঁদালে ?
আমার জীবন-যৌবনের সীমান্তে
কেন যুদ্ধ বাধালে ?
না না, যুদ্ধ নয়, আর যুদ্ধ নয়, আজ শান্তি
আর দ্বন্দ্ব নয়, আজ ছন্দ,
জীবনযৌবন ভাসিলো বন্যায়
এ কী আনন্দ !
কী আনন্দ উঠলো জ্ব'লে তোমার চোখে
কটাক্ষের কুটিলতা মিলিয়ে গেলো স্বপ্নালোকে,
কী ফুল হ'য়ে ফুটলো আমার বুকের তলে
মিলন-রাতের অশ্রুজলে।

আশ্বিন, ১৩৪৮

এলিয়টের দুটি কবিতার অনুবাদ

বিষ্ণু দে

মারিনা

কোন্ সে সমুদ্র, কোন্ বালুতীর, ধূসর-পাহাড় আর কোন্ সব দ্বীপ
কত জল ছলছল্ গলুই-এর গায়ে
আর বেতসের গন্ধ আর বন-দোয়েলের গান কুয়াসাকে চিরে
কত ছবি ফিরে আসে
হে কন্যা আমার।

কুকুরের দাঁতে যারা শান দেয়, অর্থাৎ
মরণ
মনিয়া পাখীর রংবাহারে যারা শোভা পায়, অর্থাৎ
মরণ
যারা সব ব'সে থাকে প্রসাদের খোঁয়াড়ে, অর্থাৎ
মরণ
যারা পশুর পুলকে বাঁচে, অর্থাৎ
মরণ

তারা হয় অশরীরী, হাওয়ায় ক্ষয়িষ্ণু,
বেতসের দীর্ঘশ্বাস, বন্যগান-মুখর কুয়াসা,
স্থানকালহীন এ কী মধুরলীলায়

এ কোন্ মুখ, কার, অস্পষ্ট, স্পষ্টতর
হাতের ধমনী বুঝি লীন, বেগবান
এ কি দান না এ ঋণ? নক্ষত্রের চেয়ে দূর, চোখের চেয়েও কাছে

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৮

নেপথ্যে গুঞ্জন আর মিহি হাসি তালপাতা আর ছুটন্ত পায়ের রেশে
ঘুমের পাতালদেশে, যেখানে সব জল মেশে।

চণ্ডীপাঠে চিড় লাগে, বরফের চাপে চড়া রোদে রং চটে' যায়।
আমারই রচনা এ তো, ভুলে' যাই
আর মনে পড়ে।
দড়াদড়ি ছেঁড়াখোঁড়া, চট্ পচে' গেছে
একটি বৈশাখ আর আশ্বিনের মাঝে।
আমারই রচনা এ তো, না জেনেই, আধো জেনে,
হে না-জানা, আমার আপন।
পাটাতন ফুটিফাটা জলুইতে পাটের দরকার।

এই রূপ, এই মুখ, এ জীবন কোন কালের
আমাকে ছাড়িয়ে জগতে জীবনের তরে
এ জীবন; দিতে চাই
আমার জীবন এনে মেনে দিই এ জীবনে, আমার যতেক কথা
ঐ অকথিতে
এই জাগরিত, ঠোঁট দুটি ফুটফুটে, এই আশা, এই সব
নূতন জাহাজ।

কোন্ সে সমুদ্র সব বালুতীর কষ্টিপাথরের কোন্ দ্বীপ আমার
কাঠের দিকে আর
বনদোয়েলের ডাক কুয়াসাকে চিরে' চিরে'
কন্যা আমার॥

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৮

চারটে নাগাদ লাফিয়ে উঠল হাওয়া

চারটে নাগাদ লাফিয়ে উঠল হাওয়া
লাফিয়ে উঠল, ভাঙল ঘণ্টাঘড়ি
জীবনমরণে দোদুল্যমান হাওয়া
হেথা, মরণের স্বপ্নরাজধানীতে
অন্ধ দ্বন্দ্বে জাগল প্রতিধ্বনি
এ কি স্বপ্ন কিম্বা অন্য কিছুই হবে
কালো নদীটার রূপে যবে মনে হয়
অশ্রুর ঘাসে ভিজা সে কারো বা মুখ ?
দেখেছি সে কালো নদীর অপরপারে
ছাউনি-আগুন নাচায় বর্শা কত
হেথা, মরণের অপর নদীর পারে
তাতার সওয়ার নাচায় বর্শা যত ॥

আশ্বাস

অমিয় চক্রবর্ত্তী

"মৃত্যুর পূর্ব্বরজনীতে এই কথা লিখে রাখি—
আমার মৃত্যু নেই।
যাদের ভালোবাসি তাদের রক্তের রাখী
আমায় বাঁধল : শোকের কৃত্য নেই।
তাদের আছির মধ্যে রইলাম,
চেনার অনন্তে খানিক আড়াল সইলাম।"

"তোমার শ্রাদ্ধদিন সন্ধ্যায়, স্মৃতির রাখী
জ্বলচে ; ছাইয়ের উদ্বৃত্ত নেই,
মর্ত্ত্য হাওয়ায় চিহ্ন কোথা রাখি ?
আছে কি লোক যেখানে লুপ্তির নৃত্য নেই ?
তোমার অমর্ত্ত্যের সম্ভাবনায় রইলাম,
হয়তো সেখানে টি঳কবো—এই আশায় শোক সইলাম।"

জানুয়ারি, ১৯৪১

আশ্বিন, ১৩৪৮

ত্রয়ী

অমিয় চক্রবর্ত্তী

আল্‌গা মানুষ

"চাঁদটা প্রেমেরও আগের।
তোমরা দুজনে মায়া করো
ছায়া ধরো প্রাণে প্রাণে
নূতন মেলানো রাগের।
একলা পাথুরে ফর্নে-ফ্যাকাশে ছায়াতে
চাঁদের আদিম রৌদ্র পোহাবো রাতে।
ঝিঁঝিঁ ঝঞ্চন ভিত্তির হাড়ে সত্তার পাবো মানে,
চ্যাপটা সেগুনপাতার গন্ধে বিকলতর।"

তরুণ

"আমাদেরও বোবা বুক-জোড়া রয়
প্রাচীন আলোর কুয়োতলে আশা ভয়।
কাছাকাছি প্রাণ
স্থির হয়ে করে স্নান।
যখন চেনার সুখেতে চেতন বক্ষ
মাটিতে আকাশে পাই প্রাথমিক সখ্য;
তা ছাড়া কে জানে মেসে ফিরে চেয়ে দেয়ালে
গ্যাসের আলোয় ভিজে যেথা পথ,
ব্যথার খেয়ালে
কোন্ কাল হতে আসে মনোরথ?"

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৮

তরুণী

"তোমাদের কথা শুন্‌লাম,
আমার ভাগ্য গুণ্‌লাম।
কথার অঙ্কে মন সাড়া দেয়, তবু
যা হই, যা রই বহু অকুলান্‌ বেশি।
পুরোপুরি বাঁচা। নেই, নেই কভু
প্রাণে মনে ভাঙা যুগে যুগে রেশারেশি।
এ কি ব্যথা, এ কি ভয়?
শাঁখ-নীল হাওয়া, লুকোনো কেয়ার গন্ধ,
ঘরের চাতালে স্খলিত চাঁদের ছন্দ,
রান্নার ধোঁয়া, চিঠি পিয়নের, কলেজের পড়া, ছুটির বন্ধ?
সব নিয়ে থাকা—নতুন পুরোনো নয়।"

আল্‌গা মানুষ

শুক্‌নো খেজুর ডালটা
ফুলের বিকারে হয় না উল্টো পাল্টা।
শেয়াল-ডাকানো চাঁদ,
চল্‌চি এবার, নিয়ো নাকো অপরাধ॥

সমুদ্র

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সমস্তক্ষণ একটানা মেঘের মত শব্দ।

ওই সমুদ্র আশ্চর্য ঐতিহাসিক :
পৃথিবীর পাতায় পাতায়
কত মহাদেশের ইতিহাস রচনা করেছে।
কাঁকড়ার মত দ্রুত পা ফেলে
সহস্র মানুষ ঘুরে বেড়ালো,
ওই সমুদ্র
এক নিমেষে তা মুছে দিলো : ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার আবার
নতুন বালির পাতা।

সেখানে আমাদের পদচিহ্ন পড়লো
আর অদ্ভুত দুঃসাহসে কেঁপে উঠলুম ;
আমাদের স্বাক্ষর রেখে গেলুম।

কতবার তুমি, সমুদ্র, সেই পায়ের চিহ্ন মুছে দেবে,
আর দূরের পাইন বন বাতাসে রোমাঞ্চিত হবে,
ক্যাক্‌টাসে বালি উড়ে আস্‌বে,
ধারালো কাঁটাগুলি বাতাসে সন্‌সন্‌ কর্‌বে।
তবু আমাদের সেই পদচিহ্ন, তাকে তুমি স্পর্শ কর্‌বে কী করে ?

আমার মধ্যে আশ্চর্য এক সমুদ্র
সমস্তক্ষণ মেঘের মত ডাকে,
কখনো মহাদেশের আসন্ন প্রসব-কল্পনায় থরথরিয়ে ওঠে,

আশ্বিন, ১৩৪৮

কখনো
সূর্যাস্তের রঙে সোনা হয়।

ফিকে সবুজ চাঁদ
দূরের অরণ্য স্পর্শ ক'রে উঠে এলো।
আর আমরা
সমুদ্রের একটানা গুমরুনির মধ্যে
নিজেদের পদচিহ্ন এঁকে এলুম।

আশ্বিন, ১৩৪৮

সঙ্গ

কল্যিতা দেবী

বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা খুঁজে ফেরে
সঙ্গরস।

উষার উন্মুক্ত নেত্রে
অবগুণ্ঠিত আঁধারের তলায় তলায়
চলেছে তার খোঁজ।
নীহারিকার বাষ্প আবেষ্টনে
আলোর গতি ছুটে চলে,
তারই তরঙ্গ তোলে
নয়ন ভরে রঙের আভা।
উড়ন্ত প্রজাপতি তৃণে তৃণে ছায়া ফেলে
নিঃসারে চলেছে ফুলের সন্ধানে—
সঙ্গ-কাঙাল প্রাণ অবাক হোয়ে ভাবে,
তার চাওয়ার কী কোনো রূপ আছে ?
না সে কেবল চিন্ময় পাত্র থেকে উপচে-পড়া
অনুভূতির
নীরব পদক্ষেপ !

অথচ এই কায়াহীন মোহ কী নিবিড়
জীবনের প্রতি কোণ ঘিরে—
শত সম্বন্ধের গ্রন্থিডোরে বাঁধা মাটির টান
সৃষ্টির মহিমা প্রতি ক্ষণে
রূপের আধার ভেঙে-ভেঙে গড়ছে,
বিচিত্র আবেদন ভরা নিখিলের প্রাণ।

আশ্বিন, ১৩৪৮

শুক্ল চন্দ্র—বাড়ে
বাজে ঐ ঝিল্লির মঞ্জীর
পাল-তোলা নিভৃত রজনী
পাড়ি দেয় আষাঢ়ের
মেঘের ছায়ায়—
কাজরীর সুরের করুণা পথের সঙ্গিনী তার।
সঙ্গের বন্ধন স্পৃহা
নীরব বিস্ময়ে চেয়ে থাকে,
চেতনার নগ্ন কান্তি শূন্যতা প্লাবিয়া
বিছায় যেখানে আঁচলের ধানী রাঙা মায়া
শুক্লতার দীর্ণ বুক জুড়ে ॥

১

আশ্বিন, ১৩৪৮

সিনেমা

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

মনের সিনেমা-গৃহে ক্ষণে ক্ষণে রোজ
বিভিন্ন চিন্তার রীলে গেঁথে চলে ছবি।
মুহূর্ত্তের সঙ্গে কত মুহূর্ত্তের খেলা,
স্মৃতি-বিস্মৃতির বর্ণে বর্ণে অভিনয়।
লুপ্ত ঘটনার দৃশ্য উঠে উঠে আসে
অতীতের নীল গর্ত্ত হতে বারে বারে,—
বিচিত্র দ্বীপের সারি, ডুবে যায় ফের
অতর্কিতে কোন তলে কোথা কোন দূরে
চিত্ত মঞ্চে হিংসা ক্ষমা মার্জ্জনায় মিশে
বৈচিত্র্যের ভাব-রাশি করে আনাগোনা।
বেদনার জনহীন মরুভূমি-বুকে
হা-ঘরের দল বাঁধে বারে বারে বাসা
বারে বারে যায় চলে। নভ-তলে সেথা
প্রচণ্ড রৌদ্রের পাশে ঝরে বর্ষা-ধারা।

ঘাস

জীবনানন্দ দাশ

মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেল নদীটির পারে।
সফেন আলোক তাকে চেটে গেল দুপুরবেলায়।
সবুজ বাতাস এসে পৃথিবীতে যাহা কোঁচকায়
তাহাকে নিটোল ক'রে নিতে গেল নিজের সঞ্চারে।
উৎসাহে আলাপী জল তাহাকে মসৃণ
ক'রে নিতে গেল—তবু—সময়ের ঋণ
ধীরে ধীরে ডেকে নিয়ে গেল তাকে কুৎসিত, কাঠ নগ্নতায়।
তখন নরক তার অকৃত্রিম প্রাচীন দুয়ার
খুলে দিতে গেল দেখে কানসোনা ঘাসের ভিতরে
সহসা লুকায়ে গেল ঘাসের মতন তার হাড়।
সেই থেকে হাসায় এ পৃথিবীর ঘাস
ছ'মাস গাধাকে, আর মনীষীকে মিহি ছয়মাস।

আশ্বিন, ১৩৪৮

সমিতিতে

জীবনানন্দ দাশ

ঐখানে বিকেলের সমিতিতে অগণন লোক।
উঠেছে বক্তা এক—ষড়যন্ত্রহীনভাবে—দেখে
দশ বিশ বছরের আগে এক সূর্য্যের আলোক
সহসা দেখেছে কেউ ;—যদিও অনেকে
আশীর্ব্বাদ করে ওর সূত্র উষ্ণ হোক ;
আরো অবারিত সুর বার হোক মাইক্রোফোন থেকে।

আরো বিস্তারিত সুর বার হোক—বার হয় যদি।
কেননা যুগের গালে কালি আর চূন।
আমাদের জলের গেলাস তবু হতে পারে নদী ;
গোলকধাঁধার পথ—আকাশে বেলুন।
তাহ'লে বলুন এই শতাব্দীর সমাপ্তি অবধি—
কি ক'রে একটি চোর সাতজন প্রেমিককে ক'রেছিল খুন

আশ্বিন, ১৩৪৮

শেষের কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় রিক্ত ঋতু কাটে
জনতার হাটে,
কাঁকর-ছড়ানো পথে অনেক রুধির,
গোপন বন্ধন-নীবী
টুটে গেছে আজ পৃথিবীর।

অরণ্যের বর্ণডোরে স্পন্দিত পল্লবে
স্বর্ণরৌদ্রে মাধবীশাখায়
স্বপ্নে-স্বপ্নে ইন্দ্রজালে নানা গাঢ়তায়
একদা দেখেছি বটে মদমত্ত জীবনের রূপ ;
মেঘে-মেঘে বর্ণচ্ছটা, গোধূলির গাঢ় ইন্দ্রজাল
আজ সবি মিশেছে হাওয়ায়,
কোনো চিহ্ন রাখেনি তো জীবনের কোনও শাখায়।

ধ্বংসের স্তূপের মাঝে আজো তাই অপেক্ষায় আছি—
উৎসব-শেষের রিক্ত নর্ত্তকীর মতো
এখন পৃথিবী ;
গোপন বন্ধন-নীবী
অনাচারে এতোদিনে খসে’ গেছে তার ;
বিপরীত দিক হ’তে আসে
বাঁধ-ভাঙা অদ্ভুত উচ্ছ্বাসে
সম্ভাবনা নিয়ে নব মুক্তপক্ষ কালের জোয়ার ॥

আশ্বিন, ১৩৪৮

স্বপ্ন

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ মেরু ; তুষার-দীপ্ত দিনের চাঁদোয়া-তলে
শাদা বিথারের উপরে উড়েছে মজ্জা-জমানো হাওয়া
রাতের আকাশে মেঘের ফুঁয়েতে নেভানো ময়লা চাঁদ
তিমিরগর্ভ সাগরের নীচে তিমি-র পিছল গতি—

এ সব স্বপ্ন ; তুষার-ভ্রান্তি দ্বিপ্রহরের সূর্য্যে ।
অনেক উর্দ্ধে যেখানে ক্লান্ত ঈথরের চাপে কাঁপে
প্রখর দিনের নীল প্রাণ, সেথা অণু-পরমাণু ভাসে—
ঘোরে অনটন-রিক্ত পৃথিবী বিষুব জীবনচক্রে ।

ডুব দেয় মন । উড়ে চলে যায় শীতল উদাস পথে ।
মহুয়া মদির নিরাপদ বনে শ্বাপদেরা ঘোরে-ফেরে
কালো-সবুজের মাখামাখি যতো শুষ্ক গাছের চূড়ায়
ঠাণ্ডা সুদূর স্লেটের পাহাড়—এ সব চোখের যাদু ।

মাৎস্যন্যায় মনেতে জগতে । ছোটো ছোট ফাঁক দিয়ে
ঢুকে পড়ে সব অশরীরী ছায়া সহসা হিসেব ভুলে'
প্রেক্ষাগৃহের জমাট কালোয় আলোর পুতুল নাচে
স্বপ্নশেষের সজ-পাথেয়, বন্ধু ! জীবন-শেষে ।

আশ্বিন, ১৩৪৮

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটির প্রার্থনা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এখানের কর্ম্মহীন দীর্ঘ অবকাশে
সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত তোমারি স্মরণ করি।
বাণপ্রস্থ : পুরীতে ছোট্ট বাড়ী,—আনন্দ আশ্রম।
রায় সাহেবের সুনামে খাঁটি তেল আর টাটকা দুধ।
আর বাজার ফেরতা মন্দিরে প্রত্যহ প্রার্থনা—
শেয়ার বাজারে যেন আমার গচ্ছিত অর্থ
পুষ্টি পায় (তোমারি কৃপায়)।
তারপর সমুদ্রের জল এনে বাড়ী বসে স্নান,
আহারান্তে প্রতিবেশীর সংবাদ সমাচার—(পরনিন্দার অবসরে)—
কিশোরী দর্শনে আর ওজোন সেবনে
সমুদ্রের তীরে সন্ধ্যা নামে।
যৌবনের অনাচার করেছি অর্পণ তোমার রথের তলে,
এখন ত্রিসন্ধ্যা আর মাস গেলে পেনসেন গোনা।
জীবন যেন বয়ে চলে মন্দাক্রান্তা তালে।

ওগো প্রেমের ঠাকুর,
সহসা এ কী ছলনা তোমার!
দৈনিক পত্রিকা আনে কী দুর্য্যোগ আশ্রমে আমার!
—রাক্ষসেরা ঘেরে চারিধার,
সুয়েজের খাল ধ্বংস, ইরাক চড়াও,
আফগানিস্থানের পথে পথ খোঁজে কেউ
কেউ হানা দেয় ব্রহ্মদেশে!

ওগো প্রভু,
সব চেয়ে বর্ব্বরতা, সব চেয়ে ভয়াবহ দিন,

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৮

সব চেয়ে সর্ব্বনাশ, সব চেয়ে নির্ম্মম কল্পনা,
আমার প্রাণেতে আনে সোভিয়েট সৈন্যের পাল।
আমার এ আনন্দ আশ্রম
আমার সঞ্চয় আজীবন,
(ক্ষমার সাগর ওগো তুমি জান আর আমি জানি
কত পাপ কত গ্লানি জুটেছে আমার
শুধু এই সঞ্চয়ের দায়ে)—
দেবদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী রাক্ষসের পাল
সে সঞ্চয় ভাগ করে দেবে
ঘৃণ্য যত চাষা আর মজুরের মাঝে ?
—তোমার আঙিনা মাড়াবার
অধিকার দাও নি যাদের,
তোমার মন্দির তারা পাবে ?

একদিন প্রার্থনা ত' শুনেছ আমার
ডেপুটি হবার,
আজ তাই প্রার্থনা আবার,
(জগন্নাথ, প্রার্থনা আমার,)
হানো তব তীব্র অভিশাপ
এ দুর্ব্বার বর্ব্বর-উদ্দেশে।

তোমার মন্দিরে,
আমার সঞ্চিত অর্থ
প্রণতি জানাবে প্রতিদিন।

আশ্বিন, ১৩৪৮

রাহু

বীরেন্দ্র মল্লিক

আকাশের সুন্দর, সম্পূর্ণ চাঁদকে
দুরন্ত রাহু নিঃশেষে শেষ ক'রে ফেললো।
শুধু,
স্থবির আঁধার
মুমূর্ষু বৃদ্ধের মত ধুঁকছে।
চারদিকে ঘনিয়ে আসছে প্রেতের সমাধি,
হাজার বিভীষিকা শুধু ডমরু বাজাচ্ছে।

ম্রিয়মাণ দিন কবে কেটে গেছে,
অনিয়মে, আর অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রমে
পচা আঙুরের মত পঙ্গু শরীর,
আর ঘোলাটে মন।

অতীতের অনেক চোখের জল সাঁতরে
আমার তরী আজ,
তোমার কূলে গিয়ে ঠেকলো!
জানি,
চাঁদ কখনো শিউরে উঠবে না,
দুরন্ত রাহু তোমায় মুক্তি দেবে না,
মৃত্যুর অন্ধকারে
হাজার বিভীষিকা শুধু ডমরু বাজাবে,
আর গাইবে রাহুর গান।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৮
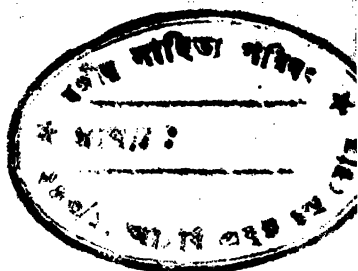
তোমাকে বেশ ভুলে থাকি !
কিন্তু
যখনি গ্রহণ লাগে,
দুরন্ত রাহু আকাশে নিশ্চাঁদ করে,
আমার আকাশে তোমার চাঁদ কেঁদে ওঠে
সেতারের মত করুণ সুরে।

অতীতের অনেক চোখের জল সাঁতরে
তখনি আমার তরী
তোমার কূলে গিয়ে ঠেকে।

আশ্বিন, ১৩৪৮

সনেট

ইমরুল কয়েস

১

চাহি না বেহেস্ত আমি ডরি না দোজখ
বিধাতা, আমারে দাও পার্থিব পুলক !
যে ফুল ফোটে এ বনে তাই আমি চাই,
যে ফুল ফোটেনি তারে ভুলে যেন যাই।
পাষাণী যে পরী-রাণী ভালোবাসিলাম—
বিধাতা, তাহারে দাও, প্রার্থিত সকাম।
পুর-নারী-প্রেমে পূর্ণ প্রাণ-মন-দেহ,
বিধাতা তাহারে দাও, শূন্য মোর গেহ !
সিন্ধুর উচ্ছ্বাস সম সুন্দর নিটোল
দেহে ঢলঢল রূপ যৌবন চঞ্চল !
আর অপরূপ দু'টি স্তনের কোরক—
তোমারি সৃজিত বৃন্তে তোমারি আলোক !
বিধাতা আমারে দাও, আর চাহি নাকো,
তারপর পরলোকে যেথা খুশি রাখো।

২

ঢলঢল সুরা সখি সুন্দর আঁখির,
কাজল-কালো ও জল—বিচ্ছেদে যা গলে,
আর তব অপরূপ দেহ-সোরাহীর
তীব্র সুরা ঢালো, ঢালো পিপাসার্ত্ত গলে !
আকণ্ঠ করিব পান মোরা দুইজনে
তারপর চ'লে যাব। ততক্ষণ আনো
নিত্য নব নৃত্যগীত, আর দেহে-মনে
অনন্ত সম্ভোগ-ইচ্ছা হানো, বন্ধু, হানো।

আশ্বিন, ১৩৪৮

পান করি প্রাণ-রস প্রাণ-পুষ্প হ'তে
মোরা দোঁহে মধুলোভী মাটির মানুষ,
আর আঁখি জলে ভরে যেতে-যেতে পথে—
রূপের নেশায় মরি! বিরহে বেঁহুস!
অনন্ত মিলন বিশ্বে অনন্ত বিরহ
অনন্ত আনন্দ আর বেদনা দুর্ব্বহ!

৩

কহিতে কহিতে কথা কাহিনী ফুরায়
নিশি যেন নাহি যায় যেন নাহি যায়!
এখনো অনেক বাকী, আকাঙ্ক্ষা অযুত,
অপেক্ষিছে লক্ষ লক্ষ আনন্দের দূত!
কথা থাক—এমন নিশীতে কথা কেন?
অবোধ প্রলাপে রাত না ফুরায় যেন।
কথা তো কেবল ফাঁকি! আঁখি জেলে রাখি,
প্রদীপ যেন না নেবে, আরো আছে বাকি।
বাসনা বহ্নিয়া বিশ্বে ঘোরে চাঁদ তারা
মোদের ফুরালে কথা জাগে আঁখি-তারা,
ঘুরে ঘুরে দেহে দেহে মহা আবর্ত্তনে
বিশ্বের সঙ্গীত বাজে, ঘুমাব কেমনে?
এসেছে যুগল দেহে অমৃতের স্বাদ
এই রাত্রে নিদ্রা সে যে দুঃসহ প্রমাদ।

হাইনে অবলম্বনে

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

[Die Geissblattlaube—Ein Sommerabend—]

মধুমালতীর কুঞ্জ—চৈত্র সন্ধ্যা—আমরা দু জনে
আবার আগের মতো ব'সে আছি খোলা জানালায়—
চাঁদ ওঠে ধীরে ধীরে ; স্নাত মর্ত্ত্য স্নিগ্ধ সঞ্জীবনে—
কেবল আমরা যেন প্রেতচ্ছায়া, গলগ্রহ দায় ॥

দ্বাদশ বৎসর আগে শেষ বসেছিলুম উভয়ে
এখানে যুগলাসনে এ-রকম কবোষ্ণ প্রদোষে ;
নবানুরাগের জ্বালা ইতিমধ্যে নিবেছে হৃদয়ে,
সম্প্রতি মন্দাগ্নি কাম অনুচিত পারণে, উপোষে ॥

নিতান্ত নিঃসাড় আমি, তথাচ সে কথার জাহাজ ;
মুখের বিরাম নেই, সঙ্গে সঙ্গে নাড়ে নিরন্তর
প্রণয়ের চিতাভস্ম ; বোঝে না সে কোনো মতে আজ
নির্ব্বাপিত বিস্ফুলিঙ্গ পুনরায় হবে না ভাস্বর ॥

অফুরন্ত ইতিহাস : কুচিন্তার বিরুদ্ধে সে নাকি
এত দিন যুদ্ধ ক'রে উপনীত আর্ত্তির চরমে ;
অপ্রতিষ্ঠ একনিষ্ঠা, পাপস্পর্শে নষ্ট তার রাখী ।
তাকাই বোকার মতো সে যখন সায় চায় সমে ॥

অগত্যা পালিয়ে বাঁচি ; কিন্তু মৃত লাগে চন্দ্রালোক ;
ভূতের কাতার দেখি দু পাশের অতিক্রান্ত গাছে ;
নিরালায় কথা কয় পৃথিবীর পুঞ্জীভূত শোক ;
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলি, তবু সঙ্গ ছাড়ে না পিশাচে ॥

'গল্পসল্প'*
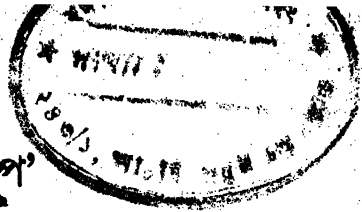
এক রকমের ছেলেমানুষি আছে পাঁচ থেকে পঁচানব্বুই পর্যন্ত সব বয়সের শিশুদের যা ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথের ছেলেমানুষি সেই জাতের। কনিষ্ঠদের তা মোহিত করে, বয়স্কদের পক্ষেও তার তীব্র আকর্ষণ। এর পরিচয় আমরা পেয়েছি 'সে' ও 'খাপছাড়া'য়, নতুন প্রমাণ এলো 'গল্পসল্পে'।

ভেবে দেখতে গেলে বুড়োদের পক্ষে ছেলেমানুষি করা অত্যন্ত দুরূহ। বেশির ভাগ লোকের মন পঁচিশের পর থেকেই আঁটো হ'য়ে আসতে থাকে, কৌতূহল আর বিস্ময় এ দু'টি বৃত্তিই আসে ক'মে, না-ডাইনে না-বাঁয়ে তাকিয়ে কাজের বাঁধা সড়ক ধ'রে তারা জীবনের বাকি বছরগুলো কাটিয়ে দেয়। এর মধ্যে হঠাৎ যদি কেউ ছেলেমানুষি করে, পাড়ার লোক তাকে 'বুড়ো খোকা' ব'লে ক্ষ্যাপায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল করে না। এক ধরণের বুড়ো-ছেলেমানুষি আছে, সেটা হাস্যকর; কিন্তু ছেলেমানুষের ছেলেমানুষি করতে পারেন এমন বুড়োমানুষ ক'জন আছেন! সেটা প্রতিভাসাপেক্ষ; সে-প্রতিভা দেখলুম রবীন্দ্রনাথে।

গল্প শুনেছি, শান্তিনিকেতনে একবার এক চীনে কবি বেড়াতে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ একটি কুকুর তাঁর চোখে পড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি চেঁচিয়ে ব'লে ওঠেন, 'Look, Rabikaka, a dog!' (Dog-এর বদলে goat কি cow হ'তে পারে, তাতে কিছু এসে যায় না।) এই হ'লো গিয়ে প্রতিভাশালী ছেলেমানুষি। একটা কুকুর, একটা ইঁদুর কি পাগলাটে ধরনের একটা লোক, যাকে ভদ্রলোকেরা সাধারণত গ্রাহ্যই করেন না—তারাও যে দ্রষ্টব্য, এ-জ্ঞান শৈশবে সকলেরই থাকে, বড়ো হ'তে-হ'তে প্রায় সকলেই হারিয়ে ফেলে। যাঁরা হারান না, শিশু-সাহিত্যের ছল ক'রে আশ্চর্য সাহিত্য রচনা করেন তাঁরাই। তাঁরা সর্বদাই কৌতূহলী, সর্বদাই বিস্মিত; তাঁদের কাছে জাত-বিচার নেই, ভদ্রতার আদর্শও তাঁরা মানেন না, যা দেখবার মতো তা তাঁদের চোখে পড়ে, অন্যকেও দেখান। এই দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের।

---

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, এক টাকা।

আমাদের পাঁচজনের দৃষ্টি ভব্যতার আদর্শে ঝাপসা। কোঁচা লুটিয়ে ধোপদুরস্ত জামা প'রে এলে তবে বসতে বলি, তা নয় তো এক কথাতেই বিদায়। কিন্তু ঐ কোঁচা-লুটোনো ভদ্রলোকটি দেখবার মতোই নয়, কারণ সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনি, সামাজিক ছক-কাটা রীতিতে সে আগাগোড়া মোড়া। মানুষ যখন নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, তখনই সে দেখবার মতো হ'য়ে ওঠে, যদিও আশে-পাশের লোক হয়তো তাকে বলবে eccentric কি abnormal কি সোজা কথায় পাগল।

মুনশীজির কথা ধরুন। কে ইনি?

"তিনি বুঝি পাগল ছিলেন।"

"হাঁ, যেমন পাগল আমি।"

"তুমি আবার পাগল, কী যে বলো তার ঠিক নেই।"

"তাঁর পাগলামির লক্ষণ শুনলে বুঝতে পারবে আমার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল।"

"কী রকম শুনি।"

"যেমন তিনি বলতেন জগতে তিনি অদ্বিতীয়। আমিও তাই বলি।"

"তুমি যা বলো সে তো সত্যি কথা। কিন্তু তিনি যা বলতেন তা যে মিথ্যে।"

"দেখো দিদি, সত্য কখনো সত্যাই হয় না যদি সকলের সম্বন্ধেই সে না খাটে। বিধাতা লক্ষ কোটি মানুষ বানিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। তাঁদের ছাঁচ ভেঙে ফেলেছেন। অধিকাংশ লোকে নিজেকে পাঁচজনের সমান মনে ক'রে আরাম বোধ করে। দৈবাৎ এক-একজন লোককে পাওয়া যায় যারা জানে তাদের জুড়ি নেই। মুনশী ছিলেন সেই জাতের মানুষ।"

গল্পসল্পের সত্যিকার সমালোচনা এখানেই পাওয়া যাবে। এই রকম অদ্বিতীয় কয়েকটি মানুষ কবি জুটিয়েছেন এই ছোটো বইটিতে। এখানে এডওঅর্ড লিয়রের সঙ্গে আশ্চর্য মিল। লিয়রের প্রতিটি ছোটো পদ্যের নায়ক এক-একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। কেউ বা এট্‌নার গহ্বরে লাফিয়ে পড়ছে, কারো বা দাড়িতে পাখিরা বেঁধেছে বাসা, কেউ বা হোমর পড়ছে গাছের ডালে ব'সে। এদিকে "they," অর্থাৎ পাড়ার লোকরা—যাকে বলা যেতে পারে সামাজিক বুদ্ধি—দুয়ো দিচ্ছে, হাত-তালি দিচ্ছে, শাস্তি দিচ্ছে নানারকমে। এখানেও মুনশীজি, যাঁর 'হাড় ক'খানার উপরে একটা চামড়া ছিল লেগে', তিনি ফারসি পড়ান, এদিকে তাঁর ধারণা
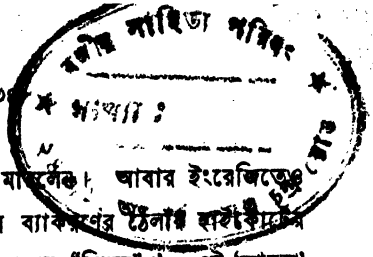
তিনি মস্ত গাইয়ে, বিষ্ণু ওস্তাদের বুঝি রুটিই মা[illegible]। আবার ইংরেজিতেও তাঁর দখল, সে কী সাংঘাতিক! 'কেবল ব্যাকরণের ঠেলায় হাইকোর্টের জজের রায় ঘুরিয়ে দিতে পারত। আমরা বলতুম, "নিশ্চয়"।' এই 'আমরা' আর লিয়রের 'they' একই জিনিস।

'আমরা' ঠাট্টা করি, আড়ালে মুখ টিপে হাসি, কিন্তু মুনশীজি তাঁর নিজের অসামান্যতায় প্রতিষ্ঠিত, সাধ্য কি আমাদের সেখান থেকে তাঁকে নড়াই। আর শুধু কি মুনশীজি—চণ্ডী, বাচস্পতি, ম্যাজিসিয়ান, ম্যানেজারবাবু, পান্নালাল আর সব-শেষে আমাদের ভালোমানুষটি (যিনি স্বয়ং রবিঠাকুর ব'লে সন্দেহ হয়) এঁরা কেউ কারো চেয়ে কম নন। চণ্ডী লোকটা আস্ত একটা কাড, কিন্তু কী উজ্জ্বল তার ব্যক্তিস্বরূপ। বাচস্পতির নাম সার্থক বটে, কথার রাজা তিনি, বিরাট সাহিত্যিক। তাঁর কথা একটু শুনুন: 'আমার নায়িকা যখন নায়ককে বলেছিল হাত নেড়ে, "দিন রাত তোমার ঐ ছিদ্‌হিদ্‌ হিদিক্কারে আমার পাঁজঝুরিতে তিড়িতঙ্ক লাগে" তখন তার মানে বোঝাতে পণ্ডিতকে ডাকতে হয়নি। যেমন পিঠে কিল মেরে সেটাকে কিল প্রমাণ করতে মহামহোপাধ্যায়ের দরকার হয় না।' রচনা আর মন্তব্য দুই-ই চমৎকার। জয়েস এঁকে পেলে জড়িয়ে ধরতেন নিশ্চয়ই, আর এঁর কিছু রচনা পেলে আমরাও ছাপতে রাজি আছি 'কবিতা'য়।

মুনশীজি, চণ্ডী, বাচস্পতি এঁরা তো অমর হ'য়ে রইলেনই, আমাদেরও দিলেন নতুন দৃষ্টি। এ-সব লোক কি আমাদেরও চোখে পড়ে না, কিন্তু আমরা দেখতে পারি কই। এঁদের সঙ্গে বসবাস করতে-করতে হয়তো সে-বিদ্যে শিখে নিতে পারবো। আর-একটি আশ্চর্য রচনা এ-বইয়ে, নাম তার 'রাজরানী'। 'লিপিকা'র সেই রাজপুত্তুর আর কালো মেয়ের গল্প মনে পড়বে, সেই যে পরী ধরা দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিলো জ্যোছনায়। এ-গল্প অবশ্য মিলনাত্মক, রাজপুত্র রানি খুঁজে পেলেন বনের মধ্যে ছাগল-চরানো মেয়েতে, আর অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের রাজকন্যারা শুনে বললে—ছি। এখানে আবার শুনলুম লিয়রের 'they'-র গলার আওয়াজ। কখনো এই 'they' দুর্ধর্ষ উন্মত্ততায় ধ্বংসের ঢল নামায়, সে-কথা আছে 'ধ্বংস' গল্পে।

আশ্বিন, ১৩৪৮

মহামূল্য ফুলবাগান কামানের গোলায় ছারখার হ'য়ে গেল, 'যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণসুদ্ধ', এদিকে 'সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব ক'রে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল তফাত থেকে। একে বলে কালের উন্নতি।'

'গল্পসল্প' কেবলই গল্প নয়, কবিতা আছে তাও স্বল্প নয়। এটুকু শুনুন—

পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে
সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খিচিয়ে।
সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা,
আজ দেখি কী অশুচি কী যে অপমানিতা।
কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের
তার সব চেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।

মজার কবিতা আছে, আছে শিশু-কবিতা, মনস্তত্ত্বের কবিতা, শুধু-কবিতাও আছে। শুধু-কবিতা বলতে বুঝি বিশুদ্ধ লিরিক :

যখনি আমার শোনে নূপুরের ধ্বনি
ঘাসে ঘাসে শিহরণ জাগে যে তখনি।
তোমার বাগানে সাজে ফুলের কেয়ারি,
কানাকানি করে তারা এসেছে পিয়ারী।...
পূর্ণিমা রাতে আসে ফাগুনের দোল
পিয়ারী পিয়ারী রবে ওঠে উতরোল।
আমের মুকুলে হাওয়া মেতে ওঠে গ্রামে,
চারিদিকে বাঁশি বাজে পিয়ারীর নামে।
শরতে ভরিয়া উঠে যমুনার বারি
কূলে কূলে গেয়ে চলে পিয়ারী পিয়ারী।

এ কি চির পুরোনো? এ কি চির নতুন? এমন শিশুভাষণের সঙ্গে লিরিকের কাকলি এর আগে কে মিশিয়েছে? তত্ত্ববহ কবিতাও আছে, 'কণিকা'র মতো aphorism, উদ্দেশ্যে হয়তো আরো গভীর। পালের সঙ্গে দাঁড়ের গোপন রেষারেষির কথা যে-পদ্যটিতে লিখেছেন সেটি মন দিয়ে পড়তে হবে। 'আমি চলি আকাশ থেকে যখনি পাই সাড়া'—পালের এ-কথা যেন রবীন্দ্রনাথেরই কবিপ্রকৃতির কথা; কোনো আইন, কোনো শাসন, কোনো

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৮

'ইজ্‌ম্‌' তিনি মানেন না, নিজের অন্তর থেকে যখন যে রকম তাগিদ আসে তারই হাওয়ায় ফোটে তাঁর লেখা। পাল-তোলা নৌকো তাঁর কাব্যের প্রতীক বরাবরই; শুধু 'সোনার তরী' 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' নয়, 'লেগেছে অমল ধবল পালে'-র কথাও মনে রাখতে হবে। ছড়ার ছন্দে লেখা শিশুবিষয়ক কবিতাটি (১২-১৩ পৃষ্ঠা) আজো মনে আনবে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুরে'র উন্মাদনা, উৎসর্গের ছোটো কবিতাটি মনে লাগবে, শেষ কবিতাটি চুপ করিয়ে রাখবে অনেকক্ষণ।

> সময় হয়ে এল এবার
> ষ্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,
> নেবে আসছে আঁধার যবনিকা—

হাসির সঙ্গে করুণ রস এমনভাবে মিশলে মন যে কেমন ক'রে ওঠে ঠিক বোঝানো যায় না। 'আবোল তাবোলে'র শেষ কবিতা মনে পড়বে। আর-একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'আমি যখন ছোটো ছিলুম ছিলুম যখন ছোটো' (৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা), এও ছড়ার ছন্দে। এ-ছন্দটি রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি একটু বেশি ব্যবহার করছেন, আর এর অফুরন্ত সম্ভাবনার দিকে চোখ খুলে দিয়েছেন আমাদের, যারা অনেকদিন পর্যন্ত একে ভালো ক'রে লক্ষ্যই করিনি। ৬৮ পৃষ্ঠার কবিতাটিতে যেন এই বইয়ের ও এ-জাতের বইয়ের আবহাওয়াটিই আমাদের জড়ায়—

> দিন খাটুনির শেষে
> বৈকালে ঘরে এসে
> আরাম-কেদারা যদি মেলে,
> গল্পটি মনগড়া
> কিছু বা কবিতা পড়া
> সময়টা যায় হেসে খেলে।

'গল্পসল্পে' গদ্য পদ্য ইচ্ছে ক'রেই মেশানো, এবং এই মেশানোর কাজটি করা হয়েছে নিখুঁত হাতে। গদ্য পদ্য চলেছে পাশাপাশি, এ ওকে ভরাচ্ছে, ও একে ফোটাচ্ছে, এ-বইয়ে ছবি নেই বোধ হয় সেই জন্যেই। গল্প আর ছন্দ মিলে সম্পূর্ণ হয়েছে, ফাঁক নেই, ছবি বসবে কোথায়?

আশ্বিন, ১৩৪৮

'গল্পসল্পে'র সম্পূর্ণ রস তাঁরাই শুধু পাবেন যাঁরা নিজেরা সাহিত্যিক। তাঁরা লক্ষ্য করবেন কেমন সরল, সংহত এর গদ্য—যেমন তার আঁটো বাঁধুনি তেমনি কমনীয়তা। হু-হু ক'রে পড়বার নয়, চেখে-চেখে পড়বার, বার-বার পড়বার। গল্পের নেশায় গরম-দুপুরের দীর্ঘতা ভুলতে চান যাঁরা, তাঁরা কাছে ঘেঁষবেন না। শিশুরা হাতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হবে, কিন্তু শিশুপাঠ্য ভেবে যে-সব বয়স্ক ভিড়বেন না, তাঁরা ঠ'কে যাবেন। এখানে দিলুম উপভোগের অল্প আভাস, আশা করি কোনো পাঠকেরই এতে তৃপ্তি হবে না, বরং তৃষ্ণা বাড়বে সবটুকু পড়বার। সত্যি বলতে, সবটুকু প'ড়েও তৃষ্ণা মেটে না; আমি তো আশা ক'রে রইলুম 'গল্পসল্পে'র দ্বিতীয় পর্ব শিগগিরই দেখবার, আরো অনেক অসামান্য পাগলের গল্প নিশ্চয়ই আছে রবীন্দ্রনাথের ঝুলিতে।

আরো দু'একটি কথা বাকি রইলো। পালের কবিতাটির কথা বলেছি ও-প্রসঙ্গে একটি গল্পও আছে। তবে গল্প আর কবিতার ইঙ্গিত স্বতন্ত্র। গল্পে তিনি দেখিয়েছেন দাঁড়ে আর পালে বাধলো ঝগড়া, মাঝি একবার গিয়ে করছে ও-দলকে তোয়াজ, একবার এসে খুশি করছে এ-দলকে। যখন মন্দ মধুর হাওয়া বয়, 'পাল করেন ফাঁকা বাবুয়ানা উপরের মহলে', কিন্তু ঝড়ের সময় 'চৌচির হ'য়ে যাবে পালের গুমর।' শেষ পর্যন্ত ধরা পড়বে দাঁড়েই চালায় নৌকা, ঝড় হোক ঝাপট হোক, উজান হোক, ভাঁটা হোক্।' এই হচ্ছে নাৎনির কাছে দাদামশায়ের 'বড়ো খবর।' বড়ো খবর নামটি ইঙ্গিতময়। ধনিক শ্রমিকের প্রতীক এখানে স্পষ্ট। মার্কসবাদীরা খুশি হবেন, আর যারা কবি মাত্র তাদেও সান্ত্বনার কথা রইলো একই বিষয়ের কবিতাটিতে।

'বাচস্পতি' সম্পর্কে জয়সের উল্লেখ করেছি। জানি না রবীন্দ্রনাথ জয়স পড়েছেন কিনা। কিন্তু পঞ্জরের বদলে পাঁজঝুরি, তিড়িং আর আতঙ্ক যোগ ক'রে তিড়িতঙ্ক, এ-সব দেখলে জয়স নিশ্চয়ই লাফিয়ে উঠতেন এতদিনে সাহিত্যে তাঁর সমধর্মী পেয়েছেন ব'লে। এ-ধরনের শব্দ সৃষ্টি ও ব্যবহার ক'রে রবীন্দ্রনাথ একটি সম্পূর্ণ গল্প—ও serious গল্প—লিখবেন কি? যেমন

আশ্বিন, ১৩৪৮

একটা কথা আছে ভারতে যা নেই জগতে তা নেই, তেমনি রবীন্দ্রনাথে যা নেই পৃথিবীর কোনো সাহিত্যে কি সাহিত্যিকেই তা নেই, এই প্রবাদও হয়তো একদিন রাষ্ট্র হবে।

বুদ্ধদেব বসু

* রচনাকাল—মে, ১৯৪১

মৃত্যুর কবিতা

'জন্মদিনে' রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মদিনে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এর বেশির ভাগ কবিতাই ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১-এর মার্চের মধ্যে, অর্থাৎ তাঁর রোগসংকটের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে, কালিম্পঙে ও শান্তিনিকেতনে ব'সে লেখা। শেষ কবিতাটির তারিখ ৯ মার্চ, ১৯৪১। এর পরেও কিছু কবিতা তিনি লিখেছিলেন, শুনতে পাই অসমাপ্ত টুকরো অনেকগুলো আছে, সেগুলি সংগৃহীত হ'য়ে প্রকাশিতও হবে নিশ্চয়ই, তবু রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের পূর্ণতার ইতিহাসে এটিই শেষ কাব্যগ্রন্থ হ'য়ে রইলো। সে-হিসেবে 'জন্মদিনে' নামটি গভীর ইঙ্গিতময়। জন্ম-মৃত্যুর মিলন-সরোবরে এই গ্রন্থ পদ্মের মতো টলোমলো।

সমালোচনা করতে পারবো না। শুধু বলতে পারি, এর পাতায় পাতায় দেখছি মৃত্যুর ছায়ায় সঞ্চরণ। কালো নয়, সে-ছায়া রঙিন। বিষণ্ণ নয়, সুন্দর। নিজের হাতে মৃত্যুর আয়োজন সম্পূর্ণ করেছেন তিনি। নিখুঁত ক'রে সাজিয়েছেন নিজের মৃত্যু-দিবস। 'Have you built the ship of death, O have you ?' হাঁ, মৃত্যুর তরী প্রস্তুত। কখন জোয়ার ?

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৮

বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে।...
মন বলে, আমি চলিলাম,
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো।

পশ্চিমের সভ্যতার বিকটতম রূপ যখন প্রকাশিত, রক্তোন্মত্ত পৃথিবী যখন ধ্বংসোন্মুখ, কবির শেষ আস্থা তখন অনির্বাণ মানবমহিমায়, আর চিরন্তন জড়-প্রকৃতিতে। বুদ্ধকে তিনি স্মরণ করছেন :

এ-ধরার জন্ম নিয়ে যে-মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন
তাঁহারে স্মরণ করি' জানিলাম মনে,—
প্রবেশি' মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।

পৃথিবীর মানুষকে ডাক দিয়ে তিনি বলছেন :

মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।...
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়॥

মহামানবের জয়ধ্বনি কবির সাম্প্রতিক রচনায় কতবার কত সুরে বাজলো। এখন দুর্যোগ।

দামামা ঐ বাজে
দিন-বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।

আশ্বিন, ১৩৪৮

পাপ জমেছে, চুকিয়ে দিতে হবে তার দাম।

মহা ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার…
এক পাখা শীর্ণ যে পাখীর
ঝড়ের সংকটদিনে রহিবে না স্থির,—
সমুচ্চ আকাশ হতে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।

হিসেব চুকিয়ে দেবার দিন এসেছে, তাই এই প্রলয়। কিন্তু প্রলয়ের জলেই যে-নবজন্ম তার প্রথম বন্দনাগান কবি গেয়ে গেলেন—

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ-যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বী-বেশে
চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
আজ সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

'ঘোষিছে কামান'—কথাটি কী সুন্দর বসেছে এখানে।

'জন্মদিনের' অনেকগুলি কবিতাই স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে, শুধু বিচ্ছেদের পটভূমিতে নয়, কাব্যের চিরকালের বিচারেই। বিশেষ ক'রে দশ নম্বর কবিতাটি ('বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি') অতি আশ্চর্য, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। এ-কবিতার প্রথম অংশ ভৌগলিক, বার-বার সমগ্র সভ্য জগৎ ভ্রমণ ক'রেও তাঁর আক্ষেপ, বিশাল বিশ্বে কত কিছুই অগোচর র'য়ে গেলো। ভ্রমণকাহিনী প'ড়ে এ-অপূর্ণতার পরোক্ষ তৃপ্তি হ'তে পারে, কিন্তু মানবজীবনের যে-সব প্রদেশের সঙ্গে পরিচয় হ'লো না, সে-ব্যবধান ঘুচবে কেমন ক'রে?

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৮

চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল ;—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে-মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবনে যোগ করা
না হোলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

এমন মধুর সরলতা, এমন আভা-ভরা সততা, অনুভূতির গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ভাষার এমন নির্বহুল নম্রতা—এ আমরা আর কোথায় পাবো! যে-সব সমালোচক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'বাস্তবে'র অথবা 'সমাজ-চেতনা'র অভাব দেখেন তাঁরা জবাব পাবেন, আর যে-সব কবি আজ জনগণের জয়গানে মুখর তাঁদের (আশা করি) আত্মশুদ্ধির সুযোগ মিলবে।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।

শৌখিন মজদুরিতে দেশ যখন ছেয়ে যাচ্ছে তখন মহা মূল্যবান কবির এই নির্ভয় সত্য বাণী। সেই কবিকে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন যাঁর রচনায় ফুটবে জন-জীবনের স্বরূপ, এতদিন যারা বোবা ছিলো তাদের প্রাণের কথা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠবে যাঁর মুখে। হয়তো এ-কবির জন্য বহুকাল অপেক্ষা করতে হবে, কারণ তাঁকে জন্মাতে হবে কৃষাণের ঘরেই, তাদের জীবনের সুখদুঃখের যথার্থ অংশীদার হ'তে হবে, তা না হ'লে কেমন ক'রে সেই কথাটি বলা যাবে যা বক্তৃতার বুলি নয়, অন্তরের বাণী।

> এসো কবি, অখ্যাতজনের
> নির্বাক মনের।
> মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার
> প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
> অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
> রসে পূর্ণ করি' দাও তুমি।
> অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
> তাই তুমি দাও তো উদ্বারি'।
> সাহিত্যের ঐক্যতান সংগীতসভায়
> একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়।
> মূক যারা দুঃখে সুখে
> নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
> ওগো গুণী,
> কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
> তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি
> তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি,—
> আমি বারংবার
> তোমারে করিব নমস্কার।

এ-কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের শেষ দানপত্র হ'য়ে রইলো।

এ তো একদিকের কথা; অন্যদিকে, জীবনের শেষ মাসগুলিতে চলেছে তাঁর কবিহৃদয়ের নব নব কম্পন, বিশ্বপ্রকৃতির হাতে নতুন ক'রে সেই পুরোনো রাখী বাঁধা। প্রকৃতি তাঁর অফুরন্ত সান্ত্বনা, ধ্বংসহীন আনন্দ-উৎস। মৃত্যুর কালিমাতেও তা মলিন হবার নয়।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৮

আর বার ফিরে এল উৎসবের দিন।
বসন্তের অজস্র সম্মান
ভরি' দিল তরুশাখা কবির প্রাঙ্গণে
নব জন্মদিনের ডালিতে।
রুদ্ধ কক্ষে দূরে আছি আমি—
এ-বৎসরে বৃথা হলো পলাশবনের নিমন্ত্রণ।
মনে করি গান গাই বসন্তবাহারে।
আসন্ন বিরহস্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।
জানি জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে।
পুষ্পবীথিকার ছায়া এ বিষাদে করে না করুণ,
বাজে না স্মৃতির ব্যথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জনে।
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
বিচ্ছেদের বেদনারে পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া।

যখন দুঃখ আসে, নৈরাশ্য তীব্র হ'য়ে বাজে, তখন চেয়ে ছাখো—

বিরাট আকাশে
বনে বনে ধরণীর ঘাসে ঘাসে
সুগভীর অবকাশ পূর্ণ হয়ে আছে
গাছে গাছে
অন্তহীন শান্তি-উৎসস্রোতে।

মৃত্যুর পরিব্যাপ্ত ছায়ার মধ্যে হঠাৎ জ্ব'লে উঠলো একটি নির্মল আনন্দের মুহূর্ত—

আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ।

১৯নং কবিতায় শৈশব-স্মৃতি মুক্ত, 'ছেলেবেলা'র পাশাপাশি পড়বার মতো, ২০নং কবিতায় বিধি-শৃঙ্খলিত ভাষার আদিম উদ্দাম ধ্বনিতে প্রত্যাবর্তনের অদ্ভুত কাহিনী—

আশ্বিন, ১৩৪৮

মনে মনে দেখিতেছি সারা বেলা ধরি
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি,
আকাশে আকাশে যেন বাজে
আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে ॥

'জন্মদিনে' 'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্যে'র সঙ্গী তাতে সন্দেহ নেই, তবে একটু তফাৎ আছে। ঐ দুই গ্রন্থে রোগযন্ত্রণার চেয়ে অনেক বেশি বড়ো হয়ে ফুটেছে রোগমুক্তির প্রসন্নতা, বেজেছে জীবনের আশ্বাসের সুর, আর এখানে মৃত্যু যেন নিশ্চিত, যদিও সেই মহা আবির্ভাব যে এতই আসন্ন তা বোধ হয় তিনিও ভাবেননি—

সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্ত্যনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্য প্রদক্ষিণ
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে ॥

নিজের মৃত্যুকে তিনি কল্পনা করেছেন ফুলের ঝ'রে পড়ার মতো—

ফুলের জগতে
মৃত্যুর বিকৃতি নাহি দেখি।
শেষ ব্যঙ্গ নাহি হানে জীবনের পানে অসুন্দর।
জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচল অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টি বিনিময়
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান ॥

দেশ-বিদেশের আথিতেয়তায় তাঁর জন্মদিনের ডালি বারে-বারে ভরেছে, চীনদেশের মানুষ তাঁর কপালে এঁকে দিয়েছে পরিচয়ের চিহ্ন, পাহাড়িয়ার দল এসেছে ফুলের অঞ্জলি নিয়ে; কত দেশ কত জাতি কত বিচিত্র ভাষা—সকলের সঙ্গে তাঁর প্রেমের বিনিময়, আজ বিদায়ের দিনে এ-কথাই বারে বারে মনে পড়ছে। একদিন লিখেছিলেন—

আশ্বিন, ১৩৪৮

…কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়

ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

এই একটি বাক্যেই তাঁর জীবনকাহিনী বাঁধা। জীবন তাঁকে বঞ্চিত করেনি, তিনিও জীবনকে দ্বিগুণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুকেও তিনি শূন্য হাতে বরণ করতে পারবেন না, তার সঙ্গেও দেয়া-নেয়ায় সমান হতে হবে। তাই এ-বইয়ের শেষ কবিতায় তিনি লিখলেন নিজের মৃত্যুর বর্ণনা—

ভয় হয় রিক্ত পাত্র বুঝি…

বুঝি আদানে প্রদানে

রবে না সম্মান, তাই আশঙ্কায় এ দুরত্ব হতে

এ সিন্ধুর নিঃসঙ্গতা মাঝে তোমাদের ডেকে বলি,—

যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে

তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ

দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় ঘটাবে না কভু অসম্মান,

অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে

ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা,

তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে

সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে

দিগন্তের পরপারে শুভ শঙ্খধ্বনি।

এর পরে আর কিছু বলবার নেই, ফিরে আসা যাক কবির জীবনসাধনায়:

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি

আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।

তাঁর সম্বন্ধে যা-কিছু বলবার রবীন্দ্রনাথ নিজেই বললেন, সমালোচক আজ চুপ। মানবজীবনে কি বিশ্বপ্রকৃতিতে এমন-কিছু ঘটেনি যা তখুনি সাড়া তোলেনি তাঁর মনে, এমন অনুভূতিশীল মন পৃথিবীতে আর কখনোই কি দেখা গিয়েছে? সেই তো চাঁদ ওঠে, পাখি ডাকে, রোদে বৃষ্টিতে মেশা শ্রাবণ শরতে গিয়ে মেশে, দেশে-বিদেশে জীবনের নিত্য লীলা প্রবহমান, কিন্তু আমাদের প্রাণে কিছুই ঘা দেয় না। প্রাত্যহিক অভ্যেসে জীবন আমাদের অনড়। তাঁর তুলনায় আমরা সব মৃত।

* জন্মদিনে: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, এক টাকা।

সম্পাদক ও প্রকাশক: বুদ্ধদেব বসু
কার্যালয়: ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা
প্রিণ্টার: শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন, মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা

শিল্পী : যামিনী রায়

কবিতা, কার্তিক

১৩৪৮
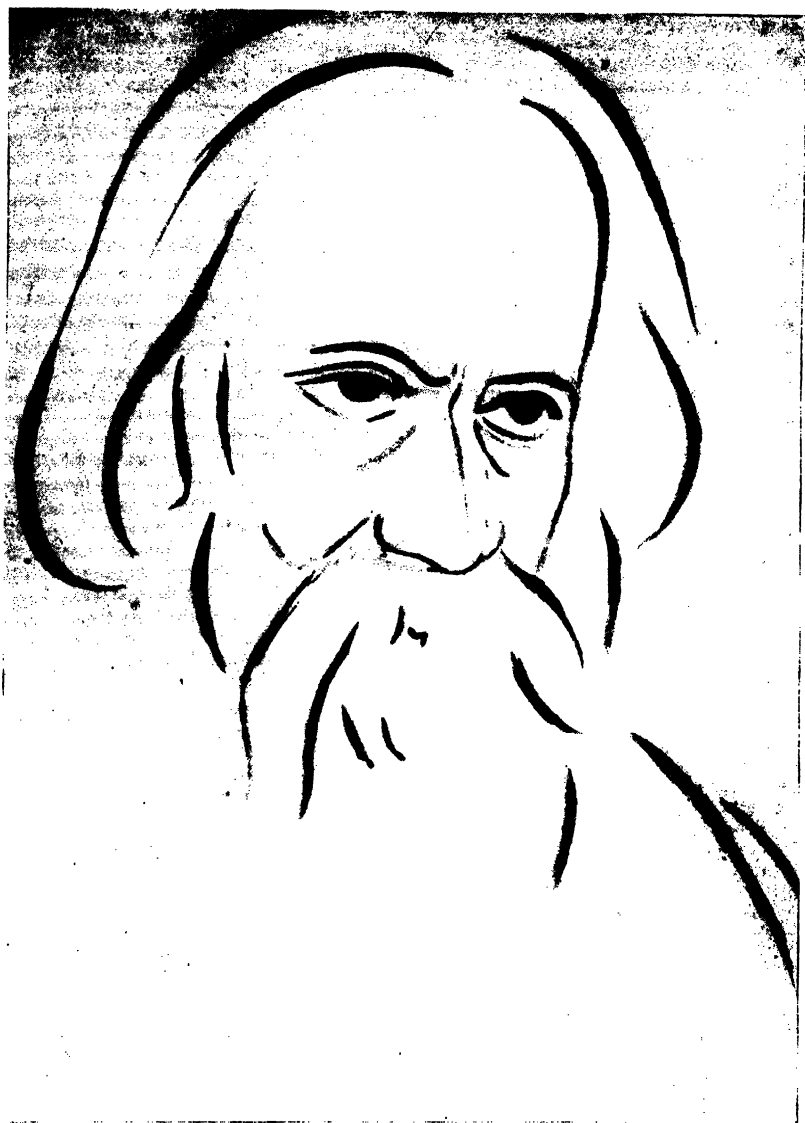
এতদিন পরে আমার দ্বারে দেখা দিল কদম্ব, স্তবকে স্তবকে, পত্রগুচ্ছের অন্তরাল থেকে নবীন প্রাণের কৌতূহলে। এলো বাদলের বিচিত্র দান অজস্র মালতী, এল গরবিনী রজনী-গন্ধা। বনের মধ্যে নিয়ে এলো সৌন্দর্যপ্রকাশসভায় প্রতিযোগিতা। অপরূপের মহাসঙ্গীতে নতুন নতুন তান দেবার জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে এলো। নানা রুচিকে নানা দিক থেকে রসের জোগান দিতে লাগল। কবি দেখছিল সৌন্দর্যের এই শান্তি। এক সময়ে জানতে পারলে প্রকৃতির ব্যবস্থায় শান্তিও নিরবচ্ছিন্ন একটানা স্রোতে চলে না। এলো অনাবৃষ্টি, নিকুঞ্জের সহজ জীবনের পথে পথে জাগিয়ে তুললে হিংসার কণ্টক। নৈরাশ্যে ম্লান হয়ে শুকনো মাটির উপরে ঝ'রে পড়তে লাগল রসমাধুর্যের এতদিনকার বিচিত্র আয়োজন। তখন প্রকৃতির যজ্ঞশালায় একটা নিষ্ঠুর মন্ত্র বেজে উঠল—জয় করো, তবে ভোগের অধিকার পাবে। প্রেমের শাসনের মধ্যে খড়্গ ধ'রে দাঁড়াল শক্তি। সে পরীক্ষা করল, দয়া করল না। যোগ্যতার দ্বন্দ্বে সব কিছু ভেঙে চুরে ছিঁড়ে একাকার করতে লাগল। বহু যত্নে যা সাজানো হয়েছিল তাকে মানল না। অনায়াসে দলন ক'রে যেতে লাগল। যারা কষ্ট পেল, যারা বঞ্চিত হোলো, তারা তাকে অকল্যাণ ব'লে অন্যায় ব'লে উর্ধ্বকণ্ঠে ভর্ৎসনা করতে লাগল, আবার তারাই পরক্ষণে

সুযোগ পাওয়া মাত্র লোভের দস্যুতায় তাদের অস্ত্রেশস্ত্রে শান দিতে লাগল। তাহ'লে মনে এই প্রশ্ন জাগে বিরাট সৃষ্টি-প্রণালীর চরম তাৎপর্য কোথায়। রক্তাক্ত কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে মহাচিতানলের ভস্মরাশিতেই কি তার শক্তির অবসান? ইতিহাসে তাই তো এতদিন দেখে এলুম তাতার এলো, পাঠান এলো, মোগল এলো, তাদের জয়পতাকাকে মানবমহিমার সর্বোচ্চে তুলে ধরবে ব'লে। জয় জয় শব্দে তারা বলেছিল, তার ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। কিন্তু আজ তারা কোথায়, তাদের জয়পতাকা ধুলোয় লুটিয়ে প'ড়ে কী প্রমাণ করছে? শক্তির মধ্যে পরিণাম নেই—মানুষ এ বার বার দেখেছে। আজও তার ধ্বংসলীলা চারদিকেই দেখছি। কোথায় শেষ, মৃত্যুতেই শেষ হবে জানি কিন্তু সে কি এমন বীভৎস মৃত্যুতে? নানা মহাজন নানা ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন চরম তত্ত্বের কথা। যার যেটাতে অভিরুচি সে সেটায় বিশ্বাস ক'রে নিয়েছে। তারপরে দেখছি সেই মন্ত্রধ্বনি বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে কালের রথচক্র ঘড়্ঘড়্ শব্দে চলেছে শান্তির উপরে, সুন্দরের উপরে, শক্তির বিচিত্র কুৎসিত রূপ প্রকাশ করবার পথে। সৃষ্টির এই যদি শেষ তাৎপর্য হয় তাহ'লে মানুষের কল্পনা কোন্ শূন্যপথে আপনার স্বর্গ খুঁজে পাবে? সে স্বর্গ একটা কোথাও শান্তির পথ নির্দেশ করছে। তার সত্যতা মানুষ কোনো এক জায়গায় কি সপ্রমাণ করবে এই প্রশ্ন আজ মহাপ্রলয়ের দিনে বার বার মনে উদয় হয়। তার উত্তর শূন্যপথে হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছে। তার কোনও উত্তর নেই, এমনতরো নাস্তিকতার ভিত্তিহীনতার উপরে সংসার কখনো টিঁকতে পারে না। কোথাও এক জায়গায় আছে, তাই যা কিছু আছে তা

আছে। নইলে কালারম্ভকালেই সমস্ত বিলীন হয়ে যেত। ইতিমধ্যে আধেক রাত্রে শালবনে বৃষ্টি নেমে আসে, সকাল-বেলায় জেগে উঠে দেখি অরুণ আলোর সঙ্গে মালতীবনের প্রচুর সখ্য চলছে, আর আমার পাটলী গাভীটি সকালবেলার তরুণ রৌদ্রে নধর দেহ নিয়ে মন্থর গমনে নব তৃণাঙ্কুর সঞ্চয় ক'রে বেড়াচ্ছে। এই রূপের ধারায় বিচ্ছেদ নেই। কামানের গর্জন তাকে পরাস্ত করতে পারেনি। কবির দরজায় জানিয়ে দিয়ে যায় নানা নিঃশব্দ ভাষায় পরিবর্তমান ঋতুর আশ্বাসবাণী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের পত্র

(শ্রীযুক্ত যামিনী রায়কে লেখা)

Uttarayan
Santiniketan, Bengal
২৫।৫।৪১

কল্যাণীয়েষু,

এখনো আমি শয্যাতলশায়ী। এই অবস্থায় আমার ছবি সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি। আমার আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে আমার ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র নিঃসংশয় নই, আজ সুদীর্ঘকাল ভাষার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমার অধিকার জন্মেছে এ আমার মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কোনো দ্বিধা করিনে। আমার ছবির তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাঁকি দিচ্ছে কিনা আমি নিজে তা জানিনে। সেইজন্যে তোমাদের মতো গুণীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয়। যখন প্যারিসের আর্টিস্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোনখানে আমার কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বোধ করি শেষ পর্যন্তই তুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধা দূর হবে না। আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাঁদের দোষ দেইনে। আমি জানি চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায় আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্র সৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারে না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে

সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে, তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না, এইজন্য তোমাকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি এবং কামনা করি তোমার কীর্তির পথ জয়যুক্ত হোক। ইতি

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ

* এই পত্রে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে যামিনীবাবুর প্রবন্ধ 'কবিতা'র রবীন্দ্র-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। —সম্পাদক।

কার্তিক, ১৩৪৮

মৃত্যুশোক

(শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমি মনে খুব বেদনা বোধ করেছি। তার কারণ, এক সময়ে যখন আমার বয়স তোমারই মত ছিল তখন আমি যে নিদারুণ শোক পেয়েছিলুম সে ঠিক তোমারই মত। আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি। তাই তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল, আমার আকাশ থেকে আলোক নিভে গেল। আমার জগৎ শূন্য হল, আমার জীবনের সাধ চলে গেল। সেই শূন্যতার কুহক কোনোদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারিনি। কিন্তু তার পরে সেই প্রচণ্ড বেদনা থেকেই আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ লাভ করলে। আমি ক্রমে বুঝতে পারলুম জীবনকে মৃত্যুর জানলার ভিতর থেকে না দেখলে তাকে সত্যরূপে দেখা যায় না। মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট মুক্তরূপ প্রকাশ পায় প্রথমে তা বড় দুঃসহ। কিন্তু তার পরে তার ঔদার্য মনকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ অনন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হালকা হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বের রথ চলেছে, মানুষের ইতিহাসের ধারা চলেছে — অতীতের বিরাট অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যে অনন্তের গতিবেগ অনন্তের পথ খুলেছে — সেই পথই মুক্তির পথ। আমার জীবনের যা [illegible] তাও অসীমের [illegible] — সেও [illegible] মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আপনাকে এবং আপনার পথকে সৃষ্টি করতে চলেছে লোকলোকান্তরে, যুগযুগান্তরে। কোনো শোক দুঃখের খুঁটিতে আমরা কেউই বাঁধা থাকব না। মনে হয় দুর্নিবার্য — অথচ অনন্ত উৎসের মত সকল ঘটনার মধ্য দিয়েই নিজেকে নিত্য উৎসারিত করছে, কোনো ঘটনা পাথরের মত আমাকে অন্ধকারের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখবে না। এই কথা মনে রেখে যাত্রীর পথ ধর — বিশ্বযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে নির্মল চিত্তে চিরজীবনের পথে অনায়াসে চলে যাও। শোকই তোমার বন্ধন মুক্ত করুক, বিচ্ছেদই তোমাকে বৃহৎ মিলনের অভিমুখে পথ দেখিয়ে দিক। মৃত্যু তোমার যা হরণ করেছে তার চেয়ে ঢের বেশি পূর্ণ করুক [illegible] তুমি দিন দিন আপনাকে [illegible] তোমার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হোক।

[illegible] আষাঢ় ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদকীয়

প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট দান তাঁর গদ্য। গদ্যরচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান, এবং ঠিক তাঁর পরেই নাম করা যেতে পারে এমন কাউকে অদ্যাবধি দেখা যাচ্ছে না। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ও চৌধুরী মহাশয়ের পারস্পরিক প্রভাবের ইতিহাস গবেষণার বিষয়। রবীন্দ্র-নাথের বয়োকনিষ্ঠ এমন-কোনো বাঙালি লেখক নেই যাঁর উপর তাঁর প্রভাব না পড়েছে, কিন্তু বয়োকনিষ্ঠ লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন একমাত্র প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথকে চলতি বাংলা তিনিই ধরালেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চলতি ভাষা নতুন ছিলো না। সতেরো বছর বয়েসে লেখা 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে' ও তার পরে 'ছিন্নপত্রে' ও অনেক নাটকের কথোপকথনে, হাস্যকৌতুকের কোনো-কোনো রচনায় যে চলতি বাংলা তিনি লিখেছেন আজকের দিনেও তা নবীন লেখকের আদর্শ হ'তে পারে। তবু, কোথায় যেন একটু দ্বিধা ছিলো। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের সাধু ভাষাই ছিলো বাহন—ব্যক্তিগত চিঠিপত্র তিনি সাধুভাষায় খুব কমই লিখেছেন—তবে সে-সাধুভাষা ক্রমশই অসাধু হ'য়ে উঠছিলো, শুধু ক্রিয়াপদগুলির ইয়া-প্রত্যয়ে নির্ভর ক'রে অতি কষ্টে সাধুত্ব বজায় রেখে চলছিলো। 'চতুরঙ্গে'র কথোপকথনসুদ্ধু সাধুভাষায় লেখা, কিন্তু এ-বইটিতে আগাগোড়া পাওয়া যাবে চলতি ভাষার নির্ভার স্বাচ্ছন্দ্য; এর আত্মীয়তা বঙ্কিমের সঙ্গে নয়, 'লিপিকা'র সঙ্গে। আর 'জীবনস্মৃতি'র সাধুভাষায় সরসতা ও চিন্তাশীলতা, কবিত্ব ও কৌতুকের যে-সমন্বয়সাধন তিনি করেছিলেন তা বাঙালি পাঠকের চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু। কোনো-কোনো কবিতায় যেমন মিল না থাকলেও মিলের অভাব লক্ষিত হয় না, মিল আছে কি নেই তা ভেবে বার করতে হয়, তেমনি 'জীবনস্মৃতি' কি 'চতুরঙ্গ'ও যে চলতিভাষায় লেখা নয় তা পড়বার সময় হয়তো খেয়ালই হয় না, পরে লক্ষ্য ক'রে বুঝতে হয় যে এ

সাধুভাষাই বটে। এ থেকে বোঝা যায় যে চলতি ভাষায় লেখবার তাগিদ রবীন্দ্রনাথের নিজের ভিতরেই ছিলো, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে 'সবুজপত্রে'র পতাকা উড়িয়ে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব তাঁকে নির্ভয় করলে; অকুণ্ঠিত সাহসে তিনি যে চলতি ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করলেন এর পিছনে প্রমথবাবুর দায়িত্ব অনেকখানি। জন্ম নিলো 'ঘরে বাইরে,' আর তার পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পরচনাই চলতিভাষায়। এই ভাষা, যা আমাদের প্রাণের ভাষা, যাতে নব-নব আভার বিচ্ছুরণ আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি, যার সম্ভাবনা এখনো অফুরন্ত মনে হয়, তাকে প্রমথবাবুই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন এ তাঁর এক মহান কীর্তি। 'সবুজপত্র' ঘিরে যে নবীন ও নব্যপন্থী লেখকের দল গ'ড়ে উঠলো, তাঁদের অনেকেই আজ বিখ্যাত; এদিকে চলতি ভাষা নিয়ে সে-সময়কার উচ্চকিত বাক্‌বিতণ্ডার কথা আমাদের অনেকেরই মনে আছে। প্রমথ চৌধুরীর অধিনায়কত্বে সে-বিতর্ক এ কথাই প্রমাণ করেছিলো যে শত্রুপক্ষ সংখ্যায় বড়ো ও কলরবে প্রবল হ'লেও বুদ্ধিতে খাটো। সে-বিতর্কের অবসান আজও যে হয়েছে তা বলা যায় না, কেননা মাথা গুনলে দেখা যাবে যে জীবিত বাঙালি লেখকদের মধ্যে বেশির ভাগই এখনো সাধু ভাষাকে আঁকড়ে আছেন—তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে সাধু ভাষা লেখা অপেক্ষাকৃত সোজা, বহুদিনের অভ্যেসে তার একটা নির্দিষ্ট ছাঁচ দাঁড়িয়ে গেছে, লিখতে গেলে মাথা ঘামাতে হয় না, কিন্তু চলতি ভাষা প'ড়ে-পাওয়া জিনিস নয়, লিখতে-লিখতে তাকে সৃষ্টি ক'রে নিতে হয়। তবু এ-বিষয়েও আমার সন্দেহ নেই যে সাধুভাষার এখন মরণদশা, তার যা হবার হ'য়ে গেছে, তাতে নতুন আর-কিছু হবে না, এবং বাংলা সাহিত্যে এমন দিন আসবেই যখন চলতিভাষা ছাড়া আর-কিছু থাকবেই না।

চলতি ভাষার প্রতিষ্ঠা প্রমথ চৌধুরীর মহৎ কীর্তি হলেও একমাত্র, এমনকি প্রধান কীর্তিও নয়। তাঁর সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে গদ্যে তিনি অনিন্দ্য শিল্পী। ভালো স্টাইলের অধিকারী না-হ'য়েও ভালো গল্পলেখক কি ঔপন্যাসিক হওয়া যায়—যদিও প্রাবন্ধিক হয়তো হওয়া যায় না, যদি না আমরা প্রবন্ধ বলতে শুধু তথ্যবহ রচনা বুঝি। গল্প তার

ঘটনাপ্রবাহের বেগেই চ'লে যায়; রচনায় শৈথিল্য, ভাষার জড়তা, গল্পের নেশায় পাঠক সবই ক্ষমা করতে প্রস্তুত। এই কারণে গল্পলেখকের ভাষাবিন্যাসের দিকটা আমরা সাধারণত তেমন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার ক'রে দেখিনে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে অনেক নামজাদা লেখকের রচনাতেও ভাষার নানারকম দুর্বলতা ধরা পড়ে। আগোছালো এলোমেলো রচনার বিরুদ্ধে প্রমথবাবুর উজ্জ্বল বিদ্রোহ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হ'য়ে রইলো। তিনি সেই দুর্লভ লেখকদের একজন যিনি সত্যিই একটি স্টাইলের অধিকারী। ভাবলুতা, অস্পষ্টতা, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি, অকারণ বিশেষণবাহুল্য, অনুরূপ ক্রিয়াপদের একঘেয়েমি প্রভৃতি যে-সব লক্ষণ বাংলা গদ্যের অভিশাপ, প্রমথবাবু সেগুলো সমূলে উচ্ছেদ করেছেন তাঁর রচনায়; তাঁর গল্পে, প্রবন্ধে আমরা বাংলা ভাষার যে একটি পরিমিত, সুসভ্য ও সহাস্য চেহারা দেখতে পাই তার প্রভাব আজকের দিনের লেখকদের উপরে যে আরো বেশি ক'রে পড়েনি সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য। আধুনিক যুগের গাল্পিকদের মধ্যে তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য অন্নদাশঙ্কর রায় ও শিবরাম চক্রবর্তী ছাড়া আর কাউকেই বোধ হয় বলা যায় না। এর কারণও বোঝা শক্ত নয়, এর কারণ সমস্ত দেশের মনে শরৎচন্দ্রের গল্পধারার অদম্য সম্মোহন। শৈলজানন্দ থেকে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রায় সকল আধুনিক গল্পলেখকদের রচনাতেই শরৎচন্দ্রের গভীর প্রভাব কোনো-না-কোনো দিক থেকে স্পষ্ট ধরা পড়ে, যে-দু'একজনের উপর তা পড়েনি তাঁরা মনে-প্রাণে রবীন্দ্রনাথেরই অনুসরণ করেছেন। প্রমথবাবুর প্রভাব আরো বিস্তৃত হ'লে বাংলা গদ্যের উন্নতি যে আরো দ্রুত হ'তো তাতে সন্দেহ নেই, হয়তো এতদিনে বিশিষ্ট রীতিসম্পন্ন আরো কয়েকজন গদ্যলেখক আমরা পেতাম।

যদিও বসুমতী সংস্করণ বেরিয়েছে, তবু আমাদের প্রধান লেখকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে সব চেয়ে কম। আর তাঁর মতো আভিজাতিক লেখকের পক্ষে এই বোধ হয় যোগ্য সম্মান। এতদিনে তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন ক'রে আমরা নিজেরা সম্মানিত হলুম। তাঁর রচনাবলীকে বসুমতী সংস্করণের গ্লানি থেকে উদ্ধার ক'রে সুন্দর শোভন আকারে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এ কর্তব্য আংশিকরূপে সম্পাদিত হ'লো তাঁর

গল্পসংগ্রহের প্রকাশে, আশা করি তাঁর প্রবন্ধাবলী ও কবিতাগুচ্ছ অনুরূপ আকারে প্রকাশিত হ'তে দেরি হবে না। আর তাঁর অভিনন্দন ধ্বনিত হোক্ বাঙালি লেখকসম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে, কারণ তিনি লেখকদের লেখক; এই দুর্ভাগা দেশের মূঢ় মধ্যবিত্ত সমাজে আজও তিনি অপুরস্কৃত, কিন্তু যত দিন যাবে ততই ফুটবে তাঁর রচনার দীপ্তি, ভবিষ্যতের বাঙালি লেখকের তিনি হবেন অন্যতম প্রধান শিক্ষক। খাবার ঘরে তাঁর ডাক পড়বে দেরিতে, কিন্তু ঘরটিতে থাকবে উজ্জ্বল আলো, আর সঙ্গীরা হবেন সংখ্যায় অল্প, কিন্তু সুনির্বাচিত। ভ্রমণের শেষে হয়তো রবীন্দ্রনাথ আর মধুসূদনের সঙ্গে তিনি আহারে বসবেন। ['রূপ ও রীতি'র সৌজন্যে—পরিবর্ধিত।]

'কল্লোল' ও দীনেশরঞ্জন দাশ

কয়েক মাস আগে দীনেশরঞ্জন দাশের মৃত্যুসংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলাম। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'কল্লোল' পত্রিকা সেই সব লেখকদের প্রথম লীলাক্ষেত্র, যাঁরা, আমার মতো, প্রায় পনেরো বছর আগে অতি-আধুনিকতার শীলমোহরে চিহ্নিত হ'য়ে আজ প্রায় অনাধুনিক হ'তে বসেছেন। গল্পসর্বস্ব সিকিমূল্যের মাসিকী হিসেবে জীবন আরম্ভ ক'রে 'কল্লোল' যে ক্রমে নতুন লেখকদলের মুখপত্র হ'য়ে উঠলো তার পিছনে ছিলো গোকুল নাগের প্রেরণা, যিনি তাঁর হ্রস্ব জীবনের শেষ বছরগুলিতে 'কল্লোলে'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। গোকুল নাগকে আমি কখনো দেখিনি, তবে তাঁর রচনা প'ড়ে তখন মুগ্ধ হয়েছিলাম, আর নানা বিষয়ে তাঁর গুণপনার কথা বন্ধুদের মুখে শুনেছি। 'কল্লোলে'র গল্পসাহিত্যে বার-বার বর্ণিত যক্ষ্মামুমূর্ষু তরুণ শিল্পী যে একান্তই অবাস্তব নয়, জীবনে সত্যই যে ও-রকম ঘটে, যেন নেহাৎই ও-কথা প্রমাণ করবার জন্যে গোকুল নাগের শোচনীয় মৃত্যু। অতি তরুণ বয়সে দুর্দান্ত যক্ষ্মারোগে তাঁকে যখন গ্রাস করলো আমরা ভাবলুম এবার বুঝি 'কল্লোলে'রও সংকট উপস্থিত, কিন্তু দীনেশরঞ্জন 'কল্লোল'কে শুধু যে বাঁচিয়ে রাখলেন তা নয়, নানাভাবে পূর্ণতর ক'রে তুলতে লাগলেন। তাঁর উৎসাহে নানাদিক থেকে নানা লোক এসে জুটলো 'কল্লোলে'র আসরে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও আরো কয়েকজন নবীন ও সেকালে

অজ্ঞাত লেখকের সানন্দ সহকর্মিতা তিনি যে পেয়েছিলেন সে তাঁরই যোগ্যতা। 'কল্লোল' সম্পাদনা ছাড়া আর-কোনো কাজ তিনি করতেন না, তাতেই ঢেলেছিলেন তাঁর সমস্ত সময়, সম্বল ও উদ্যম, এবং 'কল্লোলে'র আয়ু ঠিক তখনই ফুরিয়ে এলো, যখন সদ্য আগত দিশি সিনেমার চাকচিক্য তাঁর সময় ও মনঃসংযোগ খুব বেশি ক'রে দখল করতে লাগলো।

ক্রমে 'কল্লোলে'র আকার বাড়লো, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার নতুন লেখকরা তার পৃষ্ঠায় একে-একে দেখা দিলেন, তার খ্যাতি ও অখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত দেশে। তখন আমরা যারা ও-পত্রিকায় লিখতুম আমরা সকলেই 'কল্লোলের দল' নামে পরিচিত ছিলুম, এবং আমাদের নিন্দুকরা যতই সংখ্যায় ও তেজে বর্ধিষ্ণু হ'তে লাগলো, আমাদের আনন্দও ততই যেন উথলে উঠলো, কারণ লোকে নিন্দে করলেও আনন্দ হ'তো এতই ছেলেমানুষ তখন আমরা ছিলাম। একটা সময়ে নিন্দার মাত্রা এতই চড়েছিলো যে সাহিত্যের কোনো-কোনো শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি বিচলিত হ'য়ে একটি সভার আয়োজন করেন যাতে 'কল্লোল' ও 'কল্লোল'-বিরোধী উভয় দল একত্র হ'য়ে একটা 'বোঝাপড়া'য় পৌঁছতে পারে। বোঝাপড়া হবার কোনোই সম্ভাবনা ছিলো না, কিন্তু সভাটি ঐতিহাসিক, কারণ সেটি হয়েছিলো জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা-ভবনে আর তার নায়ক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই বিচিত্র সম্মিলন দু'দিন অনুষ্ঠিত হয়, আর দু'দিনই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বিষয়ে তাঁর নিজের কথা বলেন, তাঁর সেই মূর্তিটি আর সেই আশ্চর্য অনর্গল কথকতা এখনো চোখে ভাসে, কানে বাজে। তাঁর সে-সব কথাই অনতিপরে বিখ্যাত 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের আকার নেয়। কিছুদিন পরে দেখা গেলো 'কল্লোল' দলের ঐকান্তিকতা আর থাকছে না; শৈলজানন্দ আর প্রেমেন্দ্র শ্রীযুক্ত মুরলীধর বসুর সঙ্গে আলাদা কাগজ বের করলেন 'কালি কলম', এদিকে অজিত দত্তের আর আমার যৌথ সম্পাদনায় 'প্রগতি' দেখা দিলো ঢাকা থেকে। 'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার, জীবনানন্দ ও তখন সদ্য সমাগত বিষ্ণু দে, ওদিকে 'কালি কলমে' জুটলেন মোহিতলাল, প্রবোধ সান্যাল ও জগদীশ গুপ্ত। নজরুল ইসলাম—তখন তাঁর সুজনীদিনের মধ্যাহ্ন—তিনটি

পত্রিকারই ঝুলি সমানে ভর্তি ক'রে চললেন। 'কল্লোল' তিন ভাগ হ'লো, কিন্তু 'কল্লোলে'র মূল লেখকদের তার প্রতি আসক্তি কমলো না। তাঁদের অনেকেরই অনেক ভালো লেখা অন্য পত্রিকা দুটির প্রলোভন সত্ত্বেও 'কল্লোলে'ই বেরিয়েছে।

'কালি-কলম' আর 'প্রগতি' দুটিই স্বল্পজীবী হয়েছিলো, কিন্তু 'কল্লোলে'র স্রোত যে তার পূর্ণতার সময়েই সহসা থেমে যাবে তা আমরা কেউ কল্পনা করিনি। 'কল্লোল' আর চলবে না এ-খবর যেদিন শুনেছিলাম সেদিন মনে যে-আঘাত পেয়েছিলাম, তার রেশ এখনো পর্যন্ত মন থেকে একেবারে মিলোয়নি। সেদিন মনে-মনে বলেছিলাম দীনেশ-দা মস্ত ভুল করলেন, আজও সে-কথা অভিমানে আর্দ্র হ'য়ে মাঝে-মাঝে মনে পড়ে। যদি 'কল্লোল' আজ পর্যন্ত চ'লে আসতো এবং এ-ক' বছরে সমাগত নবীন লেখকদেরও নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতো তা'হলে সেটি হ'তো বাংলা দেশের একটি প্রধান—এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রধানতম—মাসিকপত্র, আর দীনেশরঞ্জনের নাম প্রসিদ্ধ সম্পাদক হিসেবে হয়তো রামানন্দবাবুর পরেই উল্লিখিত হ'তে পারতো। এ-কথা মনে না-ক'রে পারিনে যে এ-গৌরব দীনেশরঞ্জন ইচ্ছে ক'রেই হারালেন—বাংলা সিনেমা বাংলা সাহিত্যের প্রথম ক্ষতি করলো 'কল্লোলে'র অপমৃত্যুর জন্য অন্তত আংশিক-রূপে দায়ী হ'য়ে। সত্যি বলতে, আজ পর্যন্তও আমি 'কল্লোলে'র অভাব অনুভব করি, কারণ ঠিক ঐ ধরনের আর একটি সাহিত্যিক মাসিকপত্র এখনও আমাদের দেশে হ'লো না—মাঝখানে 'স্বদেশ' ও তার পরে 'পূর্বাশা' উঠেছিল, দুটির একটিও চললো না। 'উত্তরা' এককালে জাত-লিখিয়ের লোভনীয় পত্রিকা ছিলো, এখন থেকেও নেই। আমাদের মতো লেখকরা, যারা দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখে না, যারা নেহাৎই গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখে, অথচ যথেষ্টরকম গতানুগতিক ভাবে লেখে না, আমরা আমাদের আপন মনে করতে পারি এমন একটি পত্রিকাও আজ বাংলাদেশে নেই।

'কল্লোল' উঠে যাবার পরে দীনেশরঞ্জন কলকাতা ত্যাগ করলেন, কয়েক বছর পরে ফিরে এসে পুরোপুরি লাগলেন সিনেমার কাজে। এতগুলি

বছরের মধ্যে, একই মহানগরীতে বাস ক'রে, তাঁর সঙ্গে আমার একবার চাক্ষুষ দেখা পর্যন্ত হয়নি। এ নিয়ে মনে ক্ষোভ থেকে যেতো, যদি না গত বছর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের একটি সভায় ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যেতো। এক যুগ পরে দেখা, আর 'কল্লোল'-যুগের পরে এই প্রথম! তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে শেষ দেখাও হবে এই।

দীনেশরঞ্জন মানুষটি ভারি মনোহর ছিলেন। সুপুরুষ, আলাপ-ব্যবহার সুন্দর, নানা গুণে গুণী। তিনি লিখতেন, কিন্তু মুখ্যত লেখক ছিলেন না ব'লেই বোধ হয় সম্পাদক হিসেবে এত বেশি যোগ্য ছিলেন। তাঁর আঁকা D. R. স্বাক্ষরিত ব্যঙ্গচিত্রগুলি এখনো হয়তো অনেকের মনে আছে। তাছাড়া গানে ও অভিনয়েও তাঁর দখল ছিলো। তাঁর কথা মনে হ'লে এখনো আমার সেই দিনটির কথা মনে পড়ে যেদিন প্রথম কম্পিতবক্ষে 'কল্লোল' আপিশে ঢুকেছিলাম। ১০।২ পটুয়াটোলা লেনের সেই বিখ্যাত আড্ডাগুলি কখনো কি ভুলবো! সে-আড্ডায় সকলেই আসতেন—নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধ সান্যাল, হেমেন্দ্রকুমার, মণীন্দ্রলাল, মণীশ ঘটক ('যুবনাশ্ব'), ধূর্জটিপ্রসাদ, কালিদাস নাগ, নলিনী সরকার (গায়ক) জসীম উদ্‌দিন, হেমচন্দ্র বাগচী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি চৌধুরী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে ও আরো অনেকে। এমন উদার ও বিচিত্র আড্ডার স্বাদ আমার জীবনে সেই প্রথম। মাঝখানে কিছুদিন দীনেশরঞ্জন সাপ্তাহিক 'বিজলী'রও সম্পাদক ছিলেন, গ্রীষ্মের তীব্রতপ্ত দুপুরে বৌবাজারের সেই তেতলায় গিয়ে হাজির হয়েছি আড্ডার লোভে-লোভে। উপরে যাঁদের নাম করলুম তাঁরা প্রায় সকলেই অবশ্য 'কল্লোলে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং বেশির ভাগেরই খ্যাতির প্রথম সোপানও 'কল্লোল'। তাছাড়া আমাদের আড্ডায় যাঁদের কখনো দেখিনি, কিংবা কমই দেখেছি, এমন অনেকের লেখাও প্রথম 'কল্লোলে' বেরোয়, এবং 'কল্লোলে'র সূত্রেই তাঁদের নাম বাইরে ছড়ায়—যেমন অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত ও জীবনানন্দ দাশ। প্রবীণদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও নরেন্দ্র দেবের রচনা 'কল্লোলে' প্রায়ই বেরুতো—রাধারানী

দেবীও নিয়মিত লিখতেন—এবং এ-কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে তৎকালীন তরুণ লেখকসমাজে যতীন্দ্র সেনগুপ্ত ও মোহিতলালের প্রতিপত্তির জন্য 'কল্লোল'ই প্রধানত দায়ী। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের অনুকম্পা থেকেও 'কল্লোল' বঞ্চিত হয়নি, তাঁর অন্য নানা রচনার মধ্যে 'বাঁশি যখন থামবে ঘরে' কবিতাটি 'কল্লোলে'ই প্রথম বেরোয়। সে-সময়ে যামিনী রায় এতখানি মর্যাদা লাভ করেননি, কিন্তু তাঁর ছবি 'কল্লোলে' দেখেছি ব'লে মনে পড়ে। এ-কথা এখানকার অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে নজরুলের গজল গানগুলি 'কল্লোলে'ই প্রথম বেরোয়, আর 'কল্লোল' আপিশের তক্তাপোষে ব'সে নজরুল যখন ও-সব গান গেয়েছেন তখনও তা সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েনি। বস্তুত, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের যে-ক'টি যুবক সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের সকলেরই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন ছিলো 'কল্লোল', এবং সে-হিসেবে 'সবুজপত্র' ও 'ভারতী'র সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোলে'র নামও রইলো।

রবীন্দ্র-পুরস্কার

সম্প্রতি পঁচিশজন বাঙালি সাহিত্যিক ও শিল্পী স্বাক্ষরিত একটি ইস্তাহার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন যে কবি-হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর নামে বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি পুরস্কারের প্রতিষ্ঠা করা। সাহিত্য বলতে তাঁরা যে শুধু কল্পনাপ্রবণ রচনাই বোঝেন সে-কথাও তাঁরা ব'লে নিয়েছেন, এবং ব'লে নিয়ে ভালোই করেছেন, কারণ যে-ধরনের রচনার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি কিংবা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি দেয়া হয় তা যে সাহিত্য নয় আমাদের দেশে অনেকেরই সে-ধারণা নেই। বাঙালি লেখকের দারিদ্র্য-দুর্দশার উল্লেখও ইস্তাহারে আছে; কথাটা খুব বেশি জানাজানি হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও মাঝে-মাঝে স্পষ্ট ক'রে বলা ভালো, দারিদ্র্যেই প্রতিভা ফোটে এ-কুসংস্কার অন্তত যদি এতে কেটে যায় সেটুকুই হবে লাভ। এ তো স্পষ্টই দেখা যায় যে প্রাচীন সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার কাজে কিংবা যে-সব কেরানিকর্ম এ-দেশে 'স্কলারশিপ' নামে চলে তাতে বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে উৎসাহদাতার অভাব নেই,

অথচ নবীন সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে চারদিকেই কঠোর উদাসীনতা। যাকে ভুলে গেলে কোনোই ক্ষতি ছিলো না, মধ্যযুগের এমন-কোনো নগণ্য কবির কোনো তুচ্ছ রচনার পুনরুদ্ধার মস্ত কৃতিত্বের কথা, তার পুরস্কারও হাতে-হাতে মেলে, কিন্তু সাহিত্যের স্রোত যাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখছেন, যাঁরা সৃষ্টি করছেন, তাঁরা হয়তো মৃত্যুর নিরাপদ ক্ষেত্রে পৌঁছবার পরে গবেষণার বিষয় হ'তে পারেন, কিন্তু জীবিতকালে কোনোদিক থেকেই কোনো উৎসাহ কি সম্মান তাঁদের ভোগ্য হয় না। বিশেষত বাংলাদেশে, যেখানে বইয়ের বিক্রি বলতে গেলে নেই-ই; এবং সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না-হ'লে বিক্রি বাড়বার আশাও নেই, সেখানে সৃজনী সাহিত্যের জন্য পুরস্কার অনেক আগেই প্রবর্তিত হওয়া উচিত ছিলো, একটি নয়, অনেকগুলি। তা যে হয়নি, একটিও যে হয়নি, তাও সাহিত্যবিষয়ে বাঙালি সমাজের একান্ত উদাসীনতারই প্রমাণ। বাঙালিদের মধ্যে ধনী আছেন, দাতাও আছেন, কিন্তু এ-পর্যন্ত সাহিত্যের কথা কারো মনে হ'লো না, এমন-কোনো বৃত্তিস্থাপন করা হ'লো না যা পুরুষানুক্রমে লেখকদের কাজে লাগতে পারে। আমেরিকায়, ফ্রান্সে ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে, যেখানে বইয়ের কাটতি প্রচুর ও লেখকরা স্বাধীন ও আত্মসম্মানী জীবনযাপনে সক্ষম, সেখানেও এ-ধরণের বহু পুরস্কার আছে, এবং সে-সব পুরস্কারেরই কোনো-না-কোনোটি লাভ ক'রে অনেক তরুণ লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এ-সবই আমরা জানি, তারিফও করি, কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা এতই অল্প যে স্বদেশের জন্য সামান্য চেষ্টাতেও আমরা বিমুখ, যদিও বিদেশের বাহবায় সর্বদাই উচ্ছ্বসিত। এতদিনে এ-বিষয়ে যখন একটা কথা উঠেছে, তখন এ যাতে কয়েকদিনের বাকবিতণ্ডায় নিঃশেষ না-হ'য়ে বাস্তবে রূপ নিতে পারে সে-বিষয়ে তাঁদের সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত, সাহিত্যে যাঁরা উৎসাহী। বিশেষত, ইস্তাহারের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা যখন আছেন তখন এমন আশা করা অন্যায় হয় না যে প্রস্তাবটি হাওয়ায় ভেসে যাবে না। এক বছর পর-পর এক হাজার টাকার পুরস্কার দিতে খুব বেশি মূলধন লাগে না, বাংলাদেশে এমন ধনীও আছেন যিনি একাই

সমস্ত টাকাটা দিয়ে দিলে কিছুই টের পাবেন না। মূলধন সংগৃহীত হ'লে সেটা বিশ্বভারতীর হাতে অর্পণ করা যেতে পারে, কারণ এই 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' বিশ্বভারতী থেকে প্রদত্ত হ'লেই সব চেয়ে শোভন হয়।

বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ

রবীন্দ্রনাথ বিদায় নেবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাঙালির মনে যে বিশ্বভারতীর ভাবনা সব চেয়ে বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েছে সেটা স্বাভাবিক। রবীন্দ্র-নাথ যাকে সৃষ্টি করেছেন ও লালন করেছেন, যার জন্যে অশেষ দুঃখ-ভোগও করেছেন, প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালির হৃদয়কে তা তো এখন টানবেই। এত বড়ো একটি আদর্শ আমাদের এই বাংলা দেশের মাটিতেই যে অঙ্কুরিত হ'লো রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের অফুরন্ত ঋণরাশির মধ্যে এটিও কম নয়। আমাদের, এবং সমস্ত জগতের, উত্তরাধিকারের এ একটি অংশ।

বিশ্বভারতীকে বাঁচিয়ে রাখতে ও বিকশিত ক'রে তুলতে হ'লে আমাদের ঠিক কী-কী করা ও না-করা দরকার, সে-বিষয়ে আলোচনা এ-সময়ে অসঙ্গত নয়। বাঁচিয়ে রাখবার কথাটা অবশ্য এক্ষুনি উঠছে না, কেননা রবীন্দ্রনাথকে হারিয়ে বিশ্বভারতী যে অচিরেই অচল হবে সে-রকম আশঙ্কা অমূলক মনে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বের অভাবে কিছু-কিছু অসুবিধে ক্রমশ অনুভূত হ'তে পারে; অর্থসংকটের আশঙ্কাই সব চেয়ে বড়ো। তাই বিশ্বভারতীর জন্য টাকা তোলবার চেষ্টা চলেছে নানা অঞ্চলে। বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হওয়া খুবই দরকার, এবং এ-বিষয়ে শুধু বাংলাদেশ নয়, সমস্ত ভারতবর্ষই সচেতন ব'লে মনে হয়।

এ-বিষয়ে এটুকু শুধু বলবার থাকে যে বিশ্বভারতীকে বিরাট একটি বিশ্ববিদ্যালয়রূপে কিংবা শান্তিনিকেতনকে মস্ত একটি ধনোৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে কল্পনা করা যায় না। বিশ্বভারতী যদি ঢাকা বা লক্ষ্ণৌর মতো একটি গতানুগতিক ছাত্রাবাস-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়, কিম্বা শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন যদি টাটানগরে রূপান্তরিত হয়, তাতে দেশের কোনো লাভ

নেই। আসল কথা এই যে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ থেকে বিশ্বভারতী কোনোদিনই একটুও যেন ভ্রষ্ট না হয়, তার জন্যে যে-দামই দিতে হোক্ না। প্রাকৃতিক কারণে ওখানে যে-সব অসুবিধে আছে তা না-হয় রইলোই, আড়ম্বর তো শান্তিনিকেতনের সত্তার বিরোধী, নব-নব বিভাগ এখুনি খোলবার কী দরকার, যেটুকু আছে সেটুকুই সুন্দরভাবে চলুক, অক্ষয় হ'য়ে থাক সেই সরল সুন্দর জীবনযাত্রা; আর-কিছু না হোক্, শান্তিনিকেতন আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত দেশ হ'য়ে থাক্।

অবশ্য প্রাণের লক্ষণই এই যে তা স্থাণু নয়, হয় বিকাশ নয় ক্ষয়, যে-কোনো সময়ে এ দুই প্রক্রিয়ার কোনো-একটির সে বশবর্তী। বিশ্বভারতীও বাড়বে, বিকশিত হবে ফুলে-ফলে পল্লবে, কিন্তু সে হবে তার নিজেরই আন্তরিক তাগিদে, বাইরে থেকে সে-প্রাণরস জোগান দেবার কথা ভাবাই ভুল। যে-বিকাশ স্বতই হয় সেটাই সত্য; আমরা বাইরে থেকে সহায়তা করতে পারি, কিন্তু রাতারাতি রূপান্তর ঘটাতে পারিনে। সেটা ঘটলেও ভালো হবে না। বিশ্বভারতী বিরাট একটি প্রতিষ্ঠান না-ই বা হ'লো, সাহিত্য সংগীত চিত্র নৃত্য নাট্যকলার একটি কেন্দ্র হ'য়েই যদি সে থাকে সেটাও তো কম নয়, বরং সেটাই তার সব চেয়ে বড়ো সার্থকতা। ম্যাট্রিকুলেশন কি বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করানোর ব্যাপারটা ওখানে অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ, অন্তত তা-ই হওয়া উচিত। বিশেষ ক'রে এখনই বিশ্বভারতীর সাংস্কৃতিক দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেলো, কেননা রবীন্দ্রনাথের নানা সৃষ্টি ঠিকমতো রক্ষা করাই এখন তাঁদের প্রধান কাজ। রবীন্দ্রনাথের ছবি, গান ও নাটকের অভিনয়, এ-তিনটি জিনিস তো সম্পূর্ণই তাঁদের অধিকারে। মাঝে-মাঝে কবির ছবির প্রদর্শনী তাঁরা আশা করি করবেন ও সেই সঙ্গে আরো বেশি ছবি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ ক'রে জনসাধারণের অধিগম্য করবেন—রবীন্দ্রনাথের আঁকা সমস্ত ছবি দেখবার সুযোগ শান্তিনিকেতনে না-থাকলে কোথায় আর থাকবে! রবীন্দ্রনাথের গানের সুর যাতে বিশুদ্ধ অবস্থায় বাঙালি জাতির মধ্যে বংশানুক্রমে প্রবাহিত হ'তে পারে, এ-দায়িত্বও বিশ্বভারতীর। সে-জন্য সমস্ত গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হওয়া দরকার, কিন্তু শুধু তা-ই যথেষ্ট নয়, কারণ ছাপার অক্ষর

দেখে সুর শেখা গেলেও ঢং শেখা যায় না। এইজন্যে বিশ্বভারতীর নিজস্ব রেকর্ড হ'তে পারে, কিছু রাখবার জন্যে, কিছু বিক্রির জন্যে। শুনেছি এ-রকম আয়োজনও হচ্ছে, আশা করি কাজ আরম্ভ হ'তে খুব বেশি দেরি হবে না। গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বভারতী নিজের রেকর্ড যে কেন এতদিন করেননি তা আমার প্রায়ই অবাক লেগেছে; রবীন্দ্রনাথের নিজের গলার রেকর্ড আরো অনেক বেশি থাকা উচিত ছিলো, বিশ্বভারতী হাতে নিলে থাকতো। তাঁর নাটকগুলির অভিনয়ও শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় পূর্বের মতোই, কিংবা পূর্বের চেয়েও ঘন-ঘন হওয়া দরকার; গানে ও নাট্যাভিনয়ে স্বয়ং কবির কাছ থেকে যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন জিনিসগুলি চলিষ্ণু রাখবার ভার তাঁদেরই উপর, তাছাড়া যেহেতু কোনো ব্যক্তিবিশেষই স্থায়ী নন, নতুন-নতুন দলকে অনুরূপ শিক্ষায় অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সুর, অভিনয় ও নৃত্যের অপূর্ব পরিকল্পনা, এর কিছুই যেন আদিম গৌরব থেকে চ্যুত না হয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চার ও সাধারণভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অবারিত প্রাঙ্গণ যেন শান্তিনিকেতনই হ'য়ে ওঠে—এখানেই তো বিশ্বভারতীর সার্থকতা। সাধারণ অর্থে যাকে প্রসার বলে, বিশ্বভারতীর হয়তো তা না-হ'লেও চলবে, কিন্তু শিল্পচর্চার যে-সানন্দ স্বাধীন আবহাওয়া শান্তিনিকেতনে আমরা দেখেছি সেটুকু না-হ'লে আমাদের চলবে না।

অবনীন্দ্র-জন্মোৎসব

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ সপ্তাহে দুটি বাণী তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন; প্রথমটি প্রমথ-সম্বর্ধনা সম্পর্কে—'সাহিত্যে নূতন পথপ্রদর্শক প্রমথনাথের এই জয়ন্তীর দিনে আমার দুর্বল কণ্ঠের আশীর্বাদ তাঁর জয় ঘোষণা করুক'—আর এরই সঙ্গে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে তাঁর দেশবাসী যেন অবনীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিনের উৎসবে তাঁকে অভিনন্দিত করে। বিশ্বভারতীতে ও কলকাতার সরকারি আর্টস্কুলে তাঁর সম্বর্ধনা হ'য়ে গেলো। অনেকদিন আগে চিত্রকলায় নতুন রাস্তা যিনি খুলে দিয়েছিলেন, যে-পথ আজ আরো অনেক শিল্পীর পদরেখাঙ্কিত, বাংলার সমস্ত শিল্পীসমাজের আন্তরিক
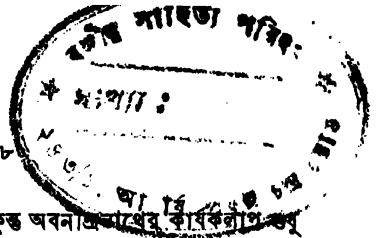
কৃতজ্ঞতা তাঁর অভিনন্দনের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কার্যকলাপ শুধু চিত্রকলাতেই সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্যেও তিনি অনিন্দ্য শিল্পী। ছোটোদের জন্য রচিত তাঁর আশ্চর্য বইগুলি অনেকদিন ধ'রেই দুষ্প্রাপ্য, সেগুলির পুনরুদ্ধারের কথা এতদিন কারো মনেও হয়নি, নিজেদের সাহিত্য ব্যাপারে আমরা এমনি উদাসীন। এই জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সে-সব বইগুলির সংগৃহীত ও সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হ'লে আমাদের সাহিত্যের মস্ত লাভ হয়; আশা করা যায় বিশ্বভারতী অবনীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী প্রকাশ ক'রেই ক্ষান্ত হবেন না, এদিকেও মন দেবেন। 'বুড়ো আংলা' নামে তাঁর শিশু-উপন্যাসটি এতদিনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'লো—অনেক বছর আগে বালক বয়সে এটি 'মৌচাকে' পড়েছিলাম, তখন কিছুই বুঝিনি, এখন প'ড়ে প্রতি পদে মুগ্ধ হ'তে হ'লো ভাষার অপরূপ কারিগরিতে, গদ্যের নিখুঁত ছন্দোবোধে, স্বচ্ছ স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বে। এ-সব বই আসলে সাবালকভোগ্য—শিশুদের নাম ক'রে লেখা কোন ভালো বই-ই বা তা নয়! 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত তাঁর গদ্যকবিতাগুলি ও সাম্প্রতিক 'চটজলদি' কবিতাগুলিও একসঙ্গে প্রকাশিত করবার ভার কোনো প্রকাশক নিশ্চয়ই নেবেন—নয়তো এই বিচিত্ররসের রচনাগুলি কালক্রমে হয়তো বিস্মৃতই হবে। বাংলা ভাষার অনেক আধুনিক ভালো বই ফুটপাথে দু'আনা চার আনায় বিক্রি হয়, তাও একদিন আর পাওয়া যায়, যাকে 'ক্লাসিক্‌স্‌' বলা হয় তা পড়তে হ'লে তো বসুমতীর যত্নহীন সংস্করণই ভরসা—কিন্তু এ-অবস্থা আর কতকাল চলবে?

'ছোট্ট রামায়ণ'

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পদ্যে রচিত 'ছোট্ট রামায়ণ' শিশুদের জন্য একখানি মনোরম বই। এ-বইটি অনেক বছর ধ'রেই আর পাওয়া যাচ্ছে না। এবং এর নানা অক্ষম রংচঙে অনুকরণে বাজার ভর্তি। অনেক বইয়ের দোকানে গিয়ে দেখা যায় যে ও-বইয়ের নামই তারা শোনেনি, কিংবা হয়তো অবজ্ঞাভরে এমন মন্তব্যও প্রকাশ করে যে 'ও-সব বই আজকাল আর চলে না।' এ-অবস্থাই যদি চলতে থাকে তাহ'লে হয়তো একখানা অতি উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য বই বাংলা সাহিত্য থেকে লোপ পেয়েই যাবে—সে-দুর্ঘটনা নিবারণে

সচেষ্ট হবার সময় কি এখনো আসেনি? তাছাড়া বইটির পুনর্মুদ্রণ ব্যবসা হিসেবেও উত্তম প্রস্তাব, কারণ এ-বইয়ের যে প্রচুর কাটতি হবে তা নিশ্চিত।

এ-রকম বই আরো আছে, তার মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'র নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। 'মনে পড়ে অভাগিনী কঙ্কাবতীর কথা'—এ সেই কঙ্কাবতী। এমন চমৎকার একখানা বইয়ের যে আজকাল গ্রন্থাকারে অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই তা যে আমাদের পক্ষে কত বড়ো লজ্জার কথা এই বন্দে-মাতরং-প্রতিধ্বনিত দেশে কেউ কি সে-বিষয়ে সচেতন? এ-বই ইওরোপের কোনো ভাষায় লেখা হ'লে তার শতাধিক বিচিত্র সংস্করণ থাকতো, এবং আমরা এখানে ব'সে তা সাগ্রহে পড়তুম ও লেখকের জয়ধ্বনি করতুম—তাছাড়া তা থেকে অনুবাদ, আংশিক অনুবাদ, 'ছায়াবলম্বন' ও অপহরণ সবই চলতো। কিন্তু যেহেতু বইটি বাংলায় লেখা, বইটির নাম পর্যন্ত ভুলতে বসেছি। অবশ্য 'কঙ্কাবতী' বসুমতীর গ্রন্থাবলীতে প্রাপ্য, কিন্তু ও-আকারে থাকা না-থাকা সমান, বসুমতীর বই ছোটোদের হাতে দেয়া যায় না, একবারের বেশি পড়া যায় না, এবং একবার পড়তেও কষ্ট হয়। 'কঙ্কাবতী'র একটি স্বতন্ত্র সুন্দর সংস্করণ কেউ কি প্রকাশ করবেন না?

এ ছাড়া সুকুমার রায়চৌধুরীর গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা এখনো অনেক আছে, সে-বিষয়েও প্রকাশকদের সচেতন হ'তে বলি।

হ্যাভলক এলিস

হ্যাভলক এলিসের মৃত্যুতে ইংলণ্ডের ভিক্টোরীয় যুগের একটি প্রধান বিপ্লবী ভাব-ধারার অবসান হলো। প্রথম যৌবন থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত এই মনীষীর বহুমুখী ও অক্লান্ত কর্মকাণ্ডের ইতিহাস অতি বিচিত্র—সে-ইতিহাস তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। নাবিকের ছেলে, স্বদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাননি, সতেরো বছর বয়সেই ইস্কুলমাষ্টার হ'য়ে চ'লে গেলেন সুদূর অস্ট্রেলিয়ায়, ছেলেবয়েসে পাঠানুরাগী ছিলেন, ভাবুক ছিলেন, কিন্তু মোটের উপর সাধারণই ছিলেন। দৈবাৎ একদিন তাঁর মনে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে উৎসাহ জন্মালো—তখন এই বিজ্ঞান সদ্যোজাত—অস্ট্রেলিয়ার মাষ্টারি ছেড়ে ফিরে এলেন দেশে, ভর্তি হলেন মেডিক্যাল কলেজে। ডাক্তার হলেন, কিন্তু

কার্তিক, ১৩৪৮

ডাক্তারিতে বসলেন না, অবিশ্রাম চললো মানুষের মনের গহনে অন্বেষণ আর সেই সঙ্গে সাহিত্যচর্চা। তাঁর Psychology of Sex-এর প্রথম খণ্ড লণ্ডনের পুলিশ 'অশ্লীলতা'র অভিযোগে বাজেয়াপ্ত করলো, মামলাও হ'লো—আর মজার কথা, এই যে সে-সংকটে বিলেতের কোনো ডাক্তার তাঁর পক্ষ নেননি, যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্যিকের সংখ্যাই বেশি। তাঁকে সমর্থন ক'রে যে-ইস্তাহার বেরোয় তার স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন জর্জ বর্নার্ড শ—তখন একজন অজ্ঞাত লেখক।

এলিস যদি শুধুই বৈজ্ঞানিক হতেন তাহ'লে আমাদের পক্ষে তাঁর মূল্য এত বেশি হ'তো না। বিজ্ঞানের ধর্মই এই যে তার ফল যদিও বিশ্ববাসীর লভ্য, তার তত্ত্বের দিকটা আবদ্ধ অতি স্বল্পসংখ্যক বিশেষজ্ঞে, কিন্তু সাহিত্য সর্বজনভোগ্য। এলিস সাহিত্যিকও ছিলেন, সাহিত্যশিল্পী ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর দর্শনের বইয়েও সাহিত্যরসের অভাব নেই, তাছাড়া এমন অনেক গ্রন্থও তিনি লিখেছেন যার মূল্য নিছক সাহিত্যিক। সাহিত্য-সমালোচনা বিভাগেও তিনি ছিলেন কৃতী কর্মী। এলিজাবীথান নাটকের এখনো যেটা প্রামাণ্য সংস্করণ, সেই Mermaid Series-এর তিনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক, জোলার 'Germinal' বইটি তিনিই প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতায়, নবীন ও প্রাচীন নানা গ্রন্থের ভূমিকারচনায় ও সমালোচনায় তিনি বারে-বারেই পরিচয় দিয়েছেন তাঁর উদার সংস্কৃতির ও একাধারে উন্নাসিকতা ও ভাবালুতাবর্জিত সুরুচির। শুনেছি তাঁকে বলা হতো 'the most cultured man in Europe—তাঁর অধিগম্য ক্ষেত্র ছিলো এতই ব্যাপক যে ও-গৌরবময় আখ্যা তাঁর সম্বন্ধে সত্যই শোভন। নীতির ক্ষেত্রে বিপ্লব আনলেন, মানুষকে মানুষের মূল্য শেখালেন উনিশ শতকে ইওরোপের যে-ক'জন মনীষী, এলিস নিঃসন্দেহে তাঁদের অগ্রগণ্য, তাছাড়া সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে, সমগ্রভাবে মানবজীবনে তাঁর অসাধারণ উৎসাহ ও অধিকার দেখে মনে হয় যে সব মিলিয়ে তিনি তাঁদেরই একজন যাঁদের মনুষ্যজন্ম সর্বতোভাবে সার্থক।

নতুন বই

My Boyhood Days, Rabindranath Tagore

Tr. by Marjorie Sykes, Visva-Bharati, 2/-

মানসী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, ১৷৷০

প্রথম বইটি 'ছেলেবেলা'র ইংরেজি অনুবাদ, এবং অনুবাদ হিসেবে ভালোই। বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদের কাজটি সোজা নয়, কারণ বাংলা স্বভাবতই আবেগপ্রধান ভাষা, আর ইংরেজি আবেগলাজুক। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের ভাষা, যার প্রায় প্রতি ছত্র আবেগে বিদ্যুৎময়, তার ইংরেজি অনুবাদে অত্যন্ত সাবধানতা দরকার। রবীন্দ্রনাথের নিজের করা অনুবাদ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই এ দুই ভাষার জাতের তফাৎ বোঝা যাবে, তাছাড়া সার্থক অনুবাদের ইঙ্গিতও মিলবে। ইংরেজি রূপান্তরে তিনি মূলকে প্রায়ই খানিকটা বদলিয়ে নিতেন, কিছুটা বাদও দিতেন, মূল রচনার আশ্চর্য উপমা ও প্রতীকগুলির কিছু হয়তো বর্জিত হ'তো, কারণ তিনি জানতেন, বাংলায় যতখানি অলঙ্কারের ভার সয় ইংরেজিতে তা সয় না। সহজ প্রবৃত্তি থেকেই তিনি বুঝতেন ঠিক কতটুকু রাখলে রচনাটির উজ্জ্বলতম রূপ ইংরেজি ভাষায় ফুটতে পারে, তাঁর স্বকৃত অনুবাদগুলি তাই এমন আশ্চর্য।

অবশ্য নিজের রচনা অনুবাদে যে-স্বাধীনতা আছে, অন্যের রচনায় তা নেই ; বিশেষত মূল লেখক যখন রবীন্দ্রনাথ, দায়িত্ব তখন বিরাট। রবীন্দ্রনাথ অন্যের রচনাও অনুবাদ করেছেন, তখনও তাকে গ'ড়ে নিয়েছেন নিজের মনের মতো ক'রে, কিন্তু অন্য লেখকের রচনার উপরে রবীন্দ্রনাথের যে-অধিকার ছিলো, তাঁর রচনার উপরে সে-অধিকার কারুরই নেই। কবিতার অনুবাদে আক্ষরিকতার দাবি খুব কড়া না-হ'তে পারে, কিন্তু গদ্য অনুবাদে ভিন্নগামিতা প্রায়ই মার্জনীয় হয় না। এ-কারণে গদ্য-অনুবাদের সমস্যা একটু ভিন্ন ধরনের।

এত সব মুশকিল সত্বেও রবীন্দ্রনাথের ভালো অনুবাদ যাঁরা করতে পেরেছেন মার্জরি সাইক্‌স্‌ তাঁদের একজন। 'ছেলেবেলা' অমন অসাধারণ চলতি ভাষায়

লেখা ব'লেই তার অনুবাদ দুঃসাধ্য মনে হয়, মিস সাইক্‌স্‌ যে একটি অনুবাদ দাঁড় করাতে পেরেছেন তার জন্যেই তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হয়। মূলের অপরূপ সরসতা এতে কেউ পাবেন এ-কথা বললে বেশি বলা হবে, তবে বাংলা যাঁরা পড়তে পারেন না, তাঁদের পক্ষে এটিই উপভোগ্য ও মূল্যবান। 'ছেলেবেলা' বাংলা গদ্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা, সে-সৌরভ অনুবাদে আশা করা বৃথা। তবে অনুবাদিকা মূলের সরলতা বজায় রেখেছেন, দীপ্তির আভাসও পাওয়া যায় এটা তাঁর কৃতিত্ব। তাছাড়া কবির বাল্যকাহিনীর তথ্যগত মূল্য তো রইলো, বিদেশিরা তাতে লুব্ধ হবেন। বইটির যে চার মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে গেছে তাতে বোঝা যায় যে এর সমাদরও হচ্ছে খুব। এ-সমাদর এখন বাড়বে সে-কথা বলাই বাহুল্য।

'মানসী'র নবতম সংস্করণ রয়্যাল সাইজে চমৎকার কাগজে ছাপা। গ্রন্থাবলীগুলি বাদ দিয়ে এটি 'মানসীর' মাত্র চতুর্থ সংস্করণ। 'মানসী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে, অর্থাৎ ৫১ বছর আগে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের 'স্মৃতিরক্ষা'র জন্য নানারকম প্রস্তাব চারদিক থেকে হচ্ছে। তাঁর 'স্মৃতি'ও যে 'রক্ষা' করবার জন্য ভাবতে হয় সে-কথাই ভাবা যায় না। তিনি তো মুক্ত হাতে নিজেকে দান ক'রে গেছেন, তাঁর অজস্র রচনায়, সে-ই তো তিনি। তাঁর স্মৃতি! স্মৃতি কেন, তিনিই তো রইলেন; হয়তো মূর্তি হবে, রাস্তার নাম হবে, আরো কত কিছু হবে, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সবই খুব ছোটো জিনিস মনে হয়। আসল কথা, বাঙালিরা তাঁর রচনাবলী আরো বেশি ক'রে পড়বে কি? তা যদি না পড়ে, যদি আমরা ও-বিষয়ে এই রকমই উদাসীন থাকি তাহ'লে আয়োজন যত বড়ো হবে তত বড়োই প্রসহন হবে মাত্র।

পরিচয়, রবীন্দ্র-সংখ্যা, সম্পাদক: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হিরণকুমার সান্যাল। ॥০

The Calcutta Municipal Gazatte, with Tagore Birthday Special Supplement, Edited by Amal Home. -/4/-

Visva-Bharati Quarterly, Tagore Birthday Number, Edited by K. R. Kripalani. 5/-

কবিতা

কার্তিক, ১৩৪৮

'কবিতা'য় সাময়িক পত্রের সমালোচনা করা হয় না, কিন্তু উপরের তিনটি পত্রিকার উল্লেখ না-করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। রবীন্দ্রনাথের গত জন্মদিন উপলক্ষ্যে খুব বেশি পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বার করেননি; যাঁরা করেছেন, তাঁদের সংগ্রহ সার্থক হয়েছে কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে ও রবীন্দ্র-ভক্তের অনুমোদনে। আধুনিক বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে 'পরিচয়' পত্রিকার যতখানি মর্যাদা, এ-কথা বলতেই হয় যে এঁদের রবীন্দ্র-সংখ্যাটি তার উপযোগী হয়নি, আমরা আরো অনেক বেশি আশা করেছিলাম। এ-সংখ্যায় যে-প্রবন্ধটি সব চেয়ে মূল্যবান তার লেখক এজরা পাউণ্ড ও রচনাকাল ১৯১৩। পাউণ্ডের এ-প্রবন্ধের সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম না, এ-উপলক্ষ্যে এটির পুনরুদ্ধার খুব ভালো হলো। কারণ প্রবন্ধটি সত্যি অসাধারণ, রবীন্দ্র-প্রতিভার এ-আলোচনা এমন উচ্ছ্বসিত অথচ সংযত, এমন আবেগময় অথচ নির্ভুল যে ইএটস্-এর গীতাঞ্জলি-ভূমিকার পাশেই এর স্থান। বিষ্ণু দে-র অনুবাদও স্বচ্ছ, কিন্তু কিছু অংশ বর্জিত হয়েছে; সম্পূর্ণ মূল প্রবন্ধটি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির আলোচ্য সংখ্যায় ছাপা হয়েছে, রবীন্দ্র-উৎসাহী ব্যক্তি অবশ্য প'ড়ে দেখবেন।

এ ছাড়া 'পরিচয়ে' আরো অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে, তার মধ্যে হরপ্রসাদ মিত্রের রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প সম্বন্ধে আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। এটি প'ড়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি হয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন—'এতদিনে দেখলুম গল্পগুচ্ছের একটা সত্যিকার সমালোচনা'—কথাটা হুবহু আমার মনে আছে। তাঁর ধারণা ছিলো—এবং এ-ধারণা ভুলও নয়—যে গল্পগুচ্ছের যথেষ্ট সমাদর বাংলাদেশে হয়নি। শেষ মুহূর্তে এ-বিষয়ে কোনো একটি প্রবন্ধ যে তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, এটুকুই আমাদের সান্ত্বনা।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে জ্যোতির্ময় রায়ের প্রবন্ধটি ভালো। এই একই বিষয়ে অন্য প্রবন্ধটি না-হ'লেও ক্ষতি ছিলো না, বিশেষত যখন রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্য অনেক দিক সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্যই নেই। সংগীত বিষয়ে লিখেছেন হেমেন্দ্রলাল রায়; তাঁর আন্তরিক মত ও উপলক্ষ্যের মহিমা এ দুয়ের বিরোধে লেখাটি অস্পষ্ট হয়েছে। এর উপর আবার তাঁর সম্বন্ধে প্রতিকূল সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে, তাতে তাঁর প্রতি সুবিচার কিংবা সম্পাদকীয়

সৌজন্যরক্ষা কোনোটাই হয়নি। লেখকের মত যে সম্পাদকের নয় এ তো জানা কথা, রচনা ভালো না-লাগলে না-ছাপাবার অধিকারও সম্পাদকের আছে, কিন্তু কোনো লেখা প্রকাশ ক'রে তারপর সম্পাদকের আসন থেকে তাকে খণ্ডন করা বোধ হয় রীতিবিরুদ্ধ। এ ছাড়া জীবনময় রায়ের শান্তিনিকেতন আশ্রমের স্মৃতিকথা কৌতূহলী পাঠককে আকর্ষণ করবে, কিন্তু 'মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মার্কস্‌বাদ, রবীন্দ্রনাথ ও পাঠক সকলের উপরেই কিছু অত্যাচার করা হয়েছে ব'লে মনে হয়।

এটা লক্ষ্য করলুম যে এই সংখ্যায় 'পরিচয়ে'র প্রথম সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় একেবারেই অনুপস্থিত। অন্য কোনো পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি কিছু লেখেননি। বোধ হয় তাঁর সময়ের অভাব ছিলো; কিন্তু তিনি কিছু লিখলে 'পরিচয়ে'র এ-সংখ্যাটি এতটা নিরাশ হয়তো করতো না, তাছাড়া শোভনতারক্ষাও হতো।

কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের স্বনামধন্য সম্পাদক অমল হোম মহাশয় আমাদের একেবারে অবাক ক'রে দিয়েছেন। এত ছবি, এত তথ্য, এত বিচিত্র উপাদান, এক সঙ্গে এত ভালো জিনিস যে বিশ্বাস করা যায় না। সম্পাদকের 'Tagore Chronicle' সাংবাদিকতার একটি মাস্টারপীস; ১৯৪১-এর মে মাস পর্যন্ত বিচিত্র ও অসংখ্য ঘটনাসংবলিত কবিজীবনের চুম্বক এখানে দেয়া হয়েছে সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণভাবে। সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জীও আছে। বহু চিত্রসংবলিত এই মস্ত আকারের তিরিশটি পাতা এমনভাবে রচিত ও সজ্জিত যে চোখ বুলিয়ে গেলেও রবীন্দ্র-জীবনী সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হয়। অবশ্য চোখ বুলিয়ে যাবার জিনিস এ মোটেও নয়, কবির প্রকৃত অনুরাগী যাঁরা তাঁরা প্রতিটি অক্ষর পড়বেন ও এই সংখ্যাটি সযত্নে রক্ষা করবেন, কারণ এ যে কত ভাবে কত সময়ে কাজে লাগতে পারে তার অন্ত নেই। সংখ্যাটির চার আনা মূল্য এতই অল্প যে হাস্যকর বলতে হয়, কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের কিছুদিন পরে অনেকে চারগুণ মূল্যেও একখানা সংগ্রহ করতে পারেননি। শুনে খুশি হলুম যে সংখ্যাটি শিগগিরই আবার ছাপা হচ্ছে—হওয়া দরকার, কারণ কবির প্রত্যেক অনুরাগীই এর এক কপি রাখতে চাইবেন, এবং প্রথমবারে অনেকেই চেষ্টা ক'রেও পাননি।

কবিতা

কার্তিক, ১৩৪৮

বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি বেরিয়েছে সব চেয়ে দেরি ক'রে, কিন্তু এক হিসেবে এটি সব চেয়ে ভালো। প্রথমত এটি দেখতে একটি মস্ত বইয়ের মতো—মলাটেও কোনোখানে পত্রিকার নাম লেখা নেই—কাগজের চমৎকারিত্ব স্থায়িত্বের সহায়তা করবে। দেশ-বিদেশের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির রচনাই এতে স্থান পেয়েছে, কিন্তু ছবি যেন বড়োই কম; অন্তত রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি আরো অনেক থাকলে ভালো হ'তো। এ-সংখ্যাটিরও প্রধান আকর্ষণ সম্পাদক সংকলিত "Tagore Chronicle"। অমলবাবুর ক্রনিক্‌ল্ আগে বেরিয়ে যাওয়ায় এর কোনো ক্ষতি হয়নি; মোটামুটি একই ঘটনাবলীর সংগ্রহ হ'লেও দুটি রচনাই স্বতন্ত্রভাবে মূল্যবান। একটি অন্যটিকে সম্পূর্ণ করে, খণ্ডন করে না, সুতরাং কবিজীবনে যথার্থ উৎসাহী যাঁরা তাঁরা দুটিই রাখবেন। সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি আরো অনেক দরকারি জিনিস আছে। দু'একটি বিষয়ে একটু সংশয় রইলো, যেমন 'My Boyhood Days'-এর প্রকাশের তারিখ ১৯৪১-এ দেয়া আছে, কিন্তু ঐ গ্রন্থের টাইটেল পেজে প্রথম প্রকাশ ১৯৪০-এ ব'লে লেখা আছে। 'চিরকুমার সভা'—'from a novel of the same name' বললে আজকাল অনেকেরই খটকা লাগবে, কারণ উপন্যাসটি বহুদিন ধ'রে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামেই প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় যে-সব বই আছে তার মধ্যে V. Lesny-র বইটির নাম দেখলুম কিন্তু সেটি তো আসলে চেক ভাষায় লেখা, ইংরেজিটা অনুবাদ, সুতরাং চেকভাষার বই ব'লেই উল্লেখ করাই যুক্তিসঙ্গত। 'প্রশ্ন' কবিতাটি 'on Gandhiji' লেখা এ-কথা বললে যেন ঠিক কথাটি বলা হয় না, কবিতাটি মহাত্মার প্রতি না মহাত্মার জন্য সে-বিষয়ে প্রশ্ন থাকে।

অবশ্য এ-সব খুব ছোটো কথা, এগুলোর উল্লেখও করতুম না, যদি না আমার আশা থাকতো এই ক্রনিক্‌ল্ শেষ পর্যন্ত এনে গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি সমেত বিশ্বভারতী স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করবেন। অন্য এক কারণেও এই প্রকাশের প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে সাহিত্য-উৎসাহী ব্যক্তির আর্থিক দুরবস্থা কুখ্যাত, পাঁচ টাকা দামের কোয়ার্টার্লি তাঁদের হাতেই পৌঁছবে যাঁরা প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের ধার ধারেন না, আন্তরিকভাবে যাঁরা সাহিত্য ভালোবাসেন তাঁরা বেশির ভাগই বঞ্চিত হবেন। অতএব ক্রনিকল আর

গ্রন্থপঞ্জীগুলি স্বতন্ত্রভাবে সুলভ মূল্যে প্রকাশ করলে অনেকেই উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই, আমার তো মনে হয় বিশ্বভারতীর এটি একটি জরুরি কর্তব্য। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের একটি তালিকা, নানা বিদেশী ভাষায় তাঁর অনুবাদের একটি গ্রন্থপঞ্জী, তাঁর সম্বন্ধে রচিত না-হ'য়েও যে-সব গ্রন্থে তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আছে তাদের নাম—এ-ধরণের আরো কিছু তথ্য জুড়ে দিলে জিনিসটির সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা হ'তে পারে।

পরিশেষে একটি কথা না-ব'লে পারিনে। এই দুটি ক্রনিক্‌ল্‌ই এমনভাবে গ্রথিত যে কবির সাহিত্যিক জীবন প্রাধান্য পায়নি, এবং স্বদেশের জীবনের চাইতে বিদেশ ভ্রমণের ছবিই হয়েছে উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের 'public life-এর বর্ণনায় কৃপণতা নেই, তাঁর কবিজীবনের কাহিনী আছে অল্পই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলতে পারি, কবে তাঁর সঙ্গে আইনস্টাইন কিংবা বর্নার্ড শ'র দেখা হয় তা পাওয়া যাবে, কিন্তু কবে এবং কতবার তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমের দেখা হয় তার কোনো উল্লেখ নেই। বিদেশে কোথায় তিনি কবে কোন বক্তৃতা দেন সে-সব কিছুই বাদ পড়েনি, কিন্তু তাঁর বইগুলো সম্বন্ধে রচনার ও প্রকাশের তারিখ ছাড়া আর যা তথ্য আছে তা সামান্যই। রমেশ দত্তর কন্যার বিবাহসভায় বঙ্কিম যে তাঁর গলার মালা খুলে কিশোর রবীন্দ্রনাথকে পরিয়ে দেন এই বিখ্যাত গল্পটিও কোথাও পেলুম না। বালক বয়সে লেখা মেঘবধকাব্যের সমালোচনার কথাও নেই। নানা বিষয়ে নানা ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিতর্ক, বাঙালি লেখকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, নিজের সম্পাদিত পত্রিকা ক'টি ছাড়া অন্যান্য বাংলা পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তৎকালীন বঙ্গসমাজের উপর তাঁর যৌবনের রচনার প্রতিক্রিয়া, কাব্যবিশারদ, সমাজপতি প্রভৃতির কুখ্যাত 'সমালোচনা',—এ-সব বিষয়ে দুটি ক্রনিক্‌ল্‌ই নীরব—কেবল দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র, 'সবুজপত্র' ও প্রমথ চৌধুরীর উল্লেখ আছে। কিন্তু এ ছাড়াও কবির সাহিত্যিক জীবন বহু বন্ধুতায় ও শত্রুতায়, বহু লেখক ও সম্পাদকের বিচিত্র সংযোগে পরিপূর্ণ, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাঙালি লেখকদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ গভীর ও ব্যাপক ছিলো—সে-সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ক'রে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী অদূর ভবিষ্যতে কেউ যদি প্রকাশ করেন,

তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হবেন অনেকেই। বিশেষত তিনি যখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ হননি, রবীন্দ্রবাবু মাত্র ছিলেন, তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সেই পর্যায়ের ইতিহাস এখন প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ সেটা ক্রমেই জীবিত ব্যক্তির স্মৃতির বাইরে চ'লে যাচ্ছে। এ কাহিনী দুটি একদিক থেকে আমাদের অত্যন্ত আদরণীয় হ'য়ে রইলো, কিন্তু কবির সাহিত্যিক কার্যকলাপই যে তাঁর যথার্থ জীবনচরিত এ-কথাও ভুলতে পারি না।

সহজপাঠ, তৃতীয় ভাগ
পাঠপ্রচয়, প্রথম ভাগ } সম্পাদক, ক্ষিতীশ রায়, বিশ্বভারতী

বাংলাভাষায় শিশুদের পাঠোপযোগী বইয়ের একান্ত অভাব। যতদিন না তারা 'শিশু' 'আবোলতাবোল' ও নানারকম গল্পের বই পড়বার আন্দাজ বড়ো হয় ততদিন অতি নীরস ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কু-লিখিত পাঠ্যপুস্তকই তাদের পঠনের সীমা নির্দেশ ক'রে দেয়, এটি সমস্ত জাতির দুর্ভাগ্য। সত্যি বলতে, সত্ত-পড়তে-শেখা শিশুর হাতে কী বই দেয়া যায়, প্রত্যেক বিবেকবান পিতামাতারই এ এক মহা সমস্যা। এ-সমস্যার পূরণ রবীন্দ্রনাথই করেছেন তাঁর দুই খণ্ড 'সহজ পাঠে'। বর্ণপরিচয় শেষ ক'রেই প্রথম খণ্ডটি পড়া যায়, তারপরে দ্বিতীয় খণ্ডটি ধরিয়ে দেয়া যায় অনায়াসেই। চার থেকে ছ'বছরের শিশুদের সত্যিকার পড়বার মতো বই এই দুই খণ্ড 'সহজ পাঠ' ছাড়া বাংলাতে আর নেই-ই এ-কথা বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হয় না।

আরো একটু অগ্রসর শিশুদের জন্য বিশ্বভারতী 'সহজ পাঠে'র তৃতীয় ভাগ ও 'পাঠপ্রচয়' প্রথম ভাগ প্রকাশ করেছেন। এ-বই দুটির লেখক রবীন্দ্রনাথ নন, তবে কবিতা শুধু রবীন্দ্রনাথেরই দেয়া হয়েছে, 'অপেক্ষাকৃত ভালোর চাইতে সব চেয়ে ভালোর মূল্য বেশি—এই ভেবে।' প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন লেখকের লেখা, বিষয় বেশির ভাগই ঐতিহাসিক কি বৈজ্ঞানিক। সব চেয়ে যা উল্লেখযোগ্য তা এই যে প্রবন্ধগুলি সবই চলতি বাংলায় লেখা, এবং সে-ভাষা স্বচ্ছ, সহজ ও সুন্দর। সম্পাদক তাঁর 'নিবেদনে' বলছেন, 'সচরাচর যাকে আমরা চলতি বাংলা ব'লে থাকি সে ভাষা ছোটদের পাঠ্যকেতাবে কেন

যে অচল হবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত।' কারণ আর কিছুই নেই, শুধু বঙ্গীয় টেক্সটবুক কমিটির দুঃসহ রক্ষণশীলতা। এই কমিটি বাংলা ভাষার যে-সব অপাঠ্য পাঠ্যকেতাব দেশের ছেলেমেয়েদের পড়তে বাধ্য করেন তা যেন গুরুমশাইর উদ্যত বেতের মতোই তাদের মারতে আসে, তা যেমন কটমট তেমনি মামুলি। এ এক তাজ্জব কাণ্ড যে আমাদের পাঠ্যকেতাব কিংবা সংবাদপত্র (যে-দুই বস্তুর মধ্যস্থতায় বেশির ভাগ সাধারণ লোকের ভাষা-শিক্ষা) এখনো চলতি ভাষায় লেখা হচ্ছে না—যে-ভাষা রবীন্দ্রনাথের, তা টেক্সটবুক কমিটি আর খবর-কাগজ-ওয়ালারা যথেষ্ট সাধু মনে করেন না, এর উপরে কিছু বলবার নেই।

যা-ই হোক্, এ বই দুটির জন্য আমরা বিশ্বভারতীর কাছে কৃতজ্ঞ, এবং আমরা আশা করি তাঁরা এই ধরণের আরো অনেক বই বের ক'রে মামুলি পাঠ্যকেতাবের বিভীষিকা থেকে বাঙালি ছেলেমেয়েদের ত্রাণ করবেন। এ বই দুটি শান্তিনিকেতনের পাঠ-ভবনের পাঠ্যরূপে মনোনীত, অন্যান্য বিদ্যালয়ে পাঠ্য হবার আশা কম, কারণ চলতি ভাষার বই সরকারি টেক্সটবুক কমিটির 'অনুমোদন' পাবে এত বড়ো সৌভাগ্য আমাদের কখনো হবে কিনা জানি না। তবে পাঠ্যকেতাব হিসেবে না হোক, rapid reading-এর জন্য এ বই দুটি অনেক বিদ্যালয়েই প্রবর্তিত হওয়া উচিত, এবং হয়তো হবেও। এ-প্রসঙ্গে এটুকু মনে হয় যে একান্তই শান্তিনিকেতন বিষয়ক যে-রচনা ক'টি আছে, বাইরের ছেলেমেয়েরা, যারা হয়তো কখনো শান্তিনিকেতনে ছাখেওনি, তাতে কোনো রস পাবে না, অতএব তার বদলে কোনো ব্যাপক বিষয় দিলে ক্ষতি নেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বা দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের জীবনচরিতের ক্ষেত্রে এ-আপত্তি অবশ্য ওঠে না, কিন্তু দু'একটি প্রবন্ধ আছে যা শুধুই আশ্রমের বালকবালিকাদের জন্য রচিত। এ-ধরণের বই শুধু শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নয়, বাংলার সমস্ত ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য ক'রে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হয়, কারণ এর বহুল প্রচারে সমস্ত দেশের লাভ।

আর-একটি বিষয়ে বই দুটি অভিনব। সে হ'লো ছবি। ছবিগুলি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর নির্বাচিত, আর 'তাঁর নিজের ও কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবি ছাড়া অন্য ছবিগুলি সবই শিশুবিভাগীয় শিক্ষার্থীদের তৈরি লাইনো-

কাটের প্রতিলিপি'। ছেলেমানুষের বইতে ছেলেমানুষি ছবি মানিয়েছে চমৎকার।

জীবনশিল্পী, অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি, এম, লাইব্রেরি, এক টাকা। অন্নদাশঙ্কর আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকদের অন্যতম। 'জীবনশিল্পী' তাঁর নতুন প্রবন্ধের বই। সাতটি প্রবন্ধ আছে, তার মধ্যে দুটি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে—'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' ও 'রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন।' এ দুটি-ই বইয়ের মধ্যে সব চেয়ে ভালো ব'লে আমার মনে হলো—শুধু তা-ই নয়, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ বাংলায় লেখা হয়েছে, তার মধ্যে উচ্চ সম্মানের আসন এদের প্রাপ্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ-দুটি প্রবন্ধের কাছে ঋণী, এবং রবীন্দ্র-চর্চায় যাঁদের উৎসাহ আছে এ দুটি প্রবন্ধ তাঁরা বার-বার পড়বেন এমন আশা করা অন্যায় হয় না।

এ ছাড়া টলস্টয় গ্যোয়েট ও বীরবল সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে, সেগুলিও উপভোগ্য। 'চোখের দেখা' প্রবন্ধটি দুর্বল; আত্মজীবনী ঘেঁষা 'বিনু' ঈষৎ সেন্টিমেন্টাল হলেও সাহিত্যিকরা প'ড়ে সুখী হবেন। আর সবার উপরে কথা এই যে অন্নদাশঙ্করের গদ্য অতি চমৎকার, বাঁধুনি কোথাও ঢিল নয়, কোথাও ছন্দপতন নেই, আগাগোড়া যেমন সরল তেমনি উজ্জ্বল।

বইটি যত ভালো সে-আন্দাজে সমালোচনা ছোটো হ'লো তার কারণ সমালোচকের সময়াভাব। বইটিও ছোটো, কিন্তু অত্যন্ত লোভনীয়, অন্নদাশঙ্করের অনেক প্রবন্ধ লেখা উচিত।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, নীহাররঞ্জন রায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

মতে মিললো না অনেক জায়গায়, কিন্তু সেটা ছোটো কথা। বইটিতে অসম্পূর্ণতা কিছু আছে, যেমন কিনা নীহারবাবুর আলোচনা পদ্যে 'পূরবী'ও গদ্যে 'শেষের কবিতা'তেই শেষ, তাছাড়া প্রবন্ধ, সমালোচনা ও কৌতুকরচনার উল্লেখমাত্র নেই। আশা করা যায় পরবর্তী সংস্করণে এ-অসম্পূর্ণতাগুলি তিনি থাকতে দেবেন না, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ সমালোচনা তাঁর মতো শক্তিশালী সমালোচকের কাছ থেকে আমরা শুধু আশা নয়, দাবি করতে পারি।

কবিতা

কার্তিক, ১৩৪৮

প্রথমেই আমার ভালো লাগলো যে কবি রবীন্দ্রনাথকে নীহারবাবু সব চেয়ে বড়ো ক'রে দেখেছেন। ঋষি কাকে বলে জানি না, বঙ্গভূমিতে বঙ্কিমকেও বলা হয়, তা দেখছি। ঐ আখ্যাটা রবীন্দ্রনাথের নামের আগে ব'সে উজ্জ্বল হয়েছে, তাঁকে তা উজ্জ্বল করেনি। এবং রবীন্দ্রনাথ ঋষি এ-কথা খুব বেশি ক'রে বললে এ-কথা ভোলবার আশঙ্কা থাকে যে তিনি কবি, পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো কবিদের একজন। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তাঁর কর্মকাণ্ড নানাবিধ হ'লেও মুখ্যত তিনি কবি, এবং প্রাচীন আর্য ঋষিদের মতো প্রিমিটিভ কবিও নন; দৃষ্টি তাঁর যেমন গভীর, রচনার কলাকৌশলের সাধনায় তিনি তেমনি সিদ্ধপুরুষ। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে, তাই, তাঁকে 'লেখক' হিসেবে না-ভাবলে চলবে না, এবং তাঁকে ঠিকমতো বুঝতে নীহারবাবুর এই বইখানা প্রচুর সহায়তা করবে।

অবশ্য কলাকৌশলের ব্যাখ্যাও নীহারবাবু করেননি, কবিতার আলোচনায় ছন্দের ক্রমবিকাশ কিংবা গদ্যে রীতিবিকাশের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। এ-অভাবের জন্যও আক্ষেপ করবো না, কারণ একটি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা হয়তো সম্ভবই নয়, তাছাড়া নীহারবাবু যেটা দিয়েছেন সেটা অত্যন্ত মূল্যবান।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সামাজিক-ঐতিহাসিক পটভূমিকার যে-বর্ণনা তিনি করেছেন তাতে অন্যান্য সমালোচক ও সাধারণ পাঠক একাধারে উপকৃত হবেন; বাংলার ইতিহাসের নানা ঘটনাস্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে রবীন্দ্র-মানস কেমন ক'রে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো এ-কাহিনীর জন্যই 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' সর্বত্র আদৃত হবে। বঙ্কিমের তাজ্জব গল্পের নেশায় দেশ যখন বুঁদ হয়ে আছে তখন তরুণ রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম সমসাময়িক বাস্তব জীবনের ক্ষেত্র থেকে তাঁর গল্পের উপাদান আহরণ করলেন, অর্থাৎ তিনিই যে আমাদের প্রথম 'রিয়্যালিস্টিক' গল্পলেখক এ-কথাটি ব'লে নীহারবাবু খুব ভালো করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের গল্পও যে 'lyrical' এই ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে কবি নিজেই প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন, এবং লেখক আর সমালোচক যদিও সর্বত্র একমত হ'তেই পারেন না, তবু এ-প্রসঙ্গে কবি যা বলেছেন তা ভেবে দেখবার মতো।

কার্তিক, ১৩৪৮

নীহারবাবুর সঙ্গে আমার প্রধান ঝগড়া 'গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্য নিয়ে। এ-কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি যে ও-গ্রন্থগুলি পাশ্চাত্ত্য দেশকে অবাক ক'রে দিয়েছে পশ্চিম ভূখণ্ড জড়বাদী ব'লেই, আমরা জাত-আধ্যাত্মিক, আমাদের মনে ওর মহিমা বিশেষ লাগে না। আমি ভারতীয় অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের প্রসাদবঞ্চিত ব'লেই হোক বা অন্য যে-কারণেই হোক, ঐ গ্রন্থগুলির আন্তরিক ভক্ত ব'লে ও-কথা শুনে বরাবরই বিস্মিত হয়েছি। নীহারবাবুরও মতও দেখছি তা-ই। তিনি বলছেন:

> আমরা যাহারা ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা ও উপলব্ধির পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছি, অতীন্দ্রিয় জগৎ ও অধ্যাত্ম-চেতনার রাজ্য যাহাদের কাছে অপরিচিত নয়, তাহাদের কাছে গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য-গীতালির অধ্যাত্ম-সাধনা ও উপলব্ধির মর্মবাণী এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নহে।

সবই বুঝলুম, কিন্তু কবিত্ব? আলোচ্য বই তিনটি উপনিষদের মতো প্রিমিটিভ কবিতা নয়, কিংবা ভারতের মধ্যযুগের 'মিস্টিক'দের মতো লোক-কাব্যও নয়—উভয়েরই প্রভাব তাদের উপর হয়তো আছে, কিন্তু রচনাগুলি উভয়কেই ছাড়িয়ে অন্য-কিছু, নিজস্ব দীপ্তিতে উজ্জ্বল। 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' কি 'দুঃখের বরষায়' কি 'মোর মরণে তোমার হবে জয়' (এ-রকম আরো অনেক আছে)—এ-সব রচনায় যে-নিছক কবিত্ব আছে, তার তুলনা কোথায় আছে জানি না। এই কবিত্বের দিক নীহারবাবুর আলোচনায় কিছুটা চাপা পড়েছে আমার এ একটা নালিশ রইলো।

উপন্যাসের আলোচনায় নীহারবাবু 'শেষের কবিতা'কে যে-স্থান দিয়েছেন আমি সে-স্থান দিতে চাই 'যোগাযোগ'কে—তাছাড়া 'চতুরঙ্গ' 'মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি নয়' এ-কথাও আমার পক্ষে মানা শক্ত। তবে এ-রকম ভালো-মন্দ লাগার ব্যক্তিগত তারতম্য অনেক থাকবেই, আর গোড়াতেই বলেছি যে মতের অমিলগুলো ছোটো কথা। মোটের উপর, এই বৃহৎ গ্রন্থে আছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য, গল্প-উপন্যাস ও নাটকের বিস্তৃত পরিচয়; সাহিত্যের ছাত্র, সাহিত্যিক ও সাধারণ পাঠক সকলের পক্ষেই বইটি সমান আদরণীয়।

কেরাণী রবীন্দ্রনাথ, অমল হোম।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে অমলবাবু গোটাকয়েক খুব সত্যি কথা বলেছেন। যাঁরা ব'লে বেড়ান যে রবীন্দ্রনাথ শুধু বড়োলোকের জীবনই এঁকেছেন

জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের সংযোগ ছিলো না, তাঁদের বুলি যে 'মার্ক্সবাদও নয়, সত্যবাদও নয়' এ-কথাটি এমনি স্পষ্টভাবে বলবার দরকার ছিলো। শুধু একটি বিষয়ে অমলবাবু ভুল করেছেন—'রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য' মানে রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্য, তা ছাড়া আর-কিছুই নয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে একজন লেখকের অন্য-কোনো লেখককে 'ছাড়িয়ে যাবার' কথাই ওঠে না, বিশেষত রবীন্দ্রনাথকে 'অতিক্রম' করবার কথা কেউ মনে আনবে এত বড়ো উন্মাদ বাঙালি সমালোচকের মধ্যেও এখনো দেখা যায়নি।

বুদ্ধদেব বসু

দৃষ্টিকোণ—জ্যোতির্ময় রায়। কবিতা-ভবন, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ কলকাতা। শ্রাবণ, ১৩৪৮ ১০+১৫২ পৃ। দাম দেড় টাকা।

জ্যোতির্ময়বাবুর "দৃষ্টিকোণ" ঘরোয়া বাক্-ভঙ্গির ছোট ছোট প্রবন্ধের সমষ্টি। বইটির দু'টি খণ্ড এবং সে খণ্ড বিভাগ করা হ'য়েছে 'বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বলার ধরণ অনুযায়ী'। 'প্রথম খণ্ডের পরিসরে আলোচ্যকে আসন' দেওয়া হ'য়েছে 'তার কৌলীন্য বিচার না করে—অভ্যর্থনার চাল্‌টাও হাল্‌কা'; দ্বিতীয় খণ্ডের রচনাগুলি একেবারে ভিন্ন জাতের, বিষয়গুলিই একটু গুরু পর্য্যায়ের; বলবার ভঙ্গিটা যদিও হাল্‌কা, তবু তা'তে ভেতরকার মননক্রিয়ার জটিলতাটুকু ঢাকা দেওয়া যায় না। কেন জানি মনে হয়, এই দুই জাতের জিনিস লেখক একই বইএ একত্র না করলেই ভাল করতেন। তা' করে লেখক বোধ হয় নিজের উপর একটু অবিচারও করেছেন।

এ ধরণের প্রবন্ধ রচনার কাজটা খুব কঠিন; বিশেষ করে প্রথম খণ্ডের রচনাগুলি সম্বন্ধেই কথাটা বল্‌ছি। সত্যিকার ছোটগল্পের আঙ্গিকের উপর দখল না থাক্‌লে বোধ হয় এই ধরণের রচনা জোতির্ময়বাবুর হাত দিয়ে বেরুতো না। তা' ছাড়া জ্যোতির্ময়বাবু দেখতে জানেন, তুচ্ছ ক্ষুদ্র জিনিসও তাঁর মনকে নাড়া দেয়, ভাবানুভূতিকে উদ্রিক্ত করে। প্রথম খণ্ডে 'কড়া' 'কুকুর বিদ্বেষীর কথা' এবং 'ইন্‌সম্‌নিয়া' সত্যিই খুব উপভোগ্য জিনিস হ'য়েছে। একটু চাপা 'হিউমার' এবং সজাগ সচল ও সরস মন রচনাগুলিকে প্রাণবান্‌ও করেছে। ঠিক্ এই জাতীয় হাল্‌কা প্রবন্ধ বাঙলা সাহিত্যে বড় একটা কেউ রচনা

করেছেন বলে জানিনে। আমাদের তুচ্ছ দৈনন্দিন জীবনের এই টুকরোগুলোকে লেখক যদি এখানে ওখানে কোনো চিত্রীর সাহায্যে সাদায়-কালোয় রেখার গড়নে রূপ দিতে পারতেন, তাহ'লে রচনাগুলি আরও উপভোগ্য হ'তো ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু লেখক যা' করেননি,' তা' নিয়ে আপত্তি না তোলাই ভাল; যা' করেছেন তা' ভাল লেগেছে, এবং আশা করি পাঠকেরও তা' ভাল লাগবে। এ-ধরণের প্রবন্ধ রচনায় তুচ্ছ ক্ষুদ্র জিনিস দেখবার যে-দৃষ্টি ও রসিয়ে উপভোগ করবার যে-মন সে-দৃষ্টি ও সে-মন জ্যোতির্ময়বাবুর আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে বিচার একটু স্বতন্ত্র। এ-প্রবন্ধগুলিতে দৃষ্টি ও বাক্-ভঙ্গির চেয়েও মননশক্তির প্রাবল্যই বেশী, এবং এই ধরণের প্রবন্ধের বিচার শেষ পর্যন্ত যুক্তির কষ্টিপাথরে। জ্যোতির্ময়বাবু তাঁর যুক্তি যে-ভাবে সাজিয়েছেন তা' সরস এবং তার সাহিত্যমূল্যও অনস্বীকার্য, কিন্তু তাঁর যুক্তি-শৃঙ্খলা সকলে স্বীকার নাও করতে পারেন, সেখানে মতামতের বিভিন্নতা থাকবেই। তবু একথা অস্বীকার করা চলে না যে তিনি ভাব্‌তে জানেন, এবং সে-ভাবনা অন্যের মনে সঞ্চার করতেও জানেন। রবীন্দ্রনাথের ছবির উপর প্রবন্ধটি সব চেয়ে আমার ভাল লেগেছে; তিনি নির্ভয়ে একটা সহজ সরল কথা সশ্রদ্ধভাবে বলেছেন। এক্ষেত্রেও হয়ত অন্য মতের স্থান আছে, কিন্তু জ্যোতির্ময়বাবুর বক্তব্যও একেবারে পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই।

কিন্তু তুলনায় একথাটা বল্‌তেই হয় যে, প্রথম খণ্ডে যে-জাতের রচনা আছে সেই জাতের রচনাতেই জ্যোতির্ময়বাবুর সত্যকারের মুন্সীয়ানা। এ-জাতের রচনা দুর্লভ; এবং আমার বিশ্বাস তিনি যদি এদিকে একটু বিশেষ-ভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাহ'লে তাঁর পক্ষে বিশিষ্টতা অর্জন করা কঠিন হবে না।

নীহাররঞ্জন রায়

রবীন্দ্রনাথের গদ্য

আবু সয়ীদ আইয়ুব

ভাষা একদিক থেকে পূর্ণতা লাভ করে বাক্য যখন এত স্বচ্ছ যে আমরা তাকে দেখতেই পাই না, সোজা গিয়ে পৌঁছই বক্তব্যের মাঝখানে। আর একদিক থেকে তার চরমোৎকর্ষের পরিচয় পাই বাক্য যেখানে নিজেকে গোপন করে না, কারুচুপিতে কিংখাবে সেজে আমাদের চোখের সামনে নিঃসংকোচে দাঁড়ায়, ধ্বনির বিন্যাসে, উপমার সৌষ্ঠবে, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়, নিগূঢ় লক্ষণায় বক্তব্যের চারপাশে অব্যক্তের এমন একটি ছায়ালোক সৃষ্টি করে যা তাকে গভীর, ব্যাপক ও স্থায়ীভাবে আমাদের মনের আসংজ্ঞাত স্তবকে রেখে দিয়ে যায়। এই ভাষা রবীন্দ্রনাথের, কী পদ্যে কী গদ্যে। কবুল করতে দোষ নেই যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য বিশুদ্ধ গদ্য নয়, সেটা কবির গদ্য। কবি কথাটা ব্যবহার করতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে কবিতার সেই সংজ্ঞাটি—Poetry is essentially a feeling of words. শব্দের প্রতি, তার উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত সঙ্গীতের প্রতি, তার ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইঙ্গিতের প্রতি তাঁর নিবিড় সংবেদনা, কবি রবীন্দ্রনাথের গদ্যকেও বিশিষ্টতা দান করেছে। "মেঘদূত" কিম্বা "কাব্যের উপেক্ষিতা"-র উদাহরণ সহজেই মনে আসে। ঐ প্রবন্ধগুলি পড়ার শেষে কানে যে-অনুরণ থেকে যায়, বহুক্ষণ পরেও আমরা যখন অন্য চিন্তায় বা কাজে ব্যাপৃত, তার মৃদু ঝঙ্কারটুকু মনের একটি নিভৃত কোণে অলক্ষিতে যেন বেজে বেজে ওঠে, জাগিয়ে তোলে কত ছোটোখাটো দ্রুতগামী ভাবানুষঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তার হাস্যরস। বলা বাহুল্য আমি যে-হাস্যরসের কথা বলছি তা বিষয়বস্তুর নয়, অর্থাৎ নাটকীয় কোনো পরিস্থিতি বা বিবৃত কোনো ঘটনার উপর তার ভিত্তি নেই। সে একান্ত ভাষা-নির্ভর, কোনো অপ্রত্যাশিত শব্দের নির্বাচনে, বাক্যের কোনো অভিনব সংগঠনে, অথবা ভাষা-শিল্পীর হাতেরই অন্য কোনো চতুর কারিগরির মধ্যে তার সমস্ত উপাদান রয়েছে। এ-জাতীয় হাস্যরস নবীন

প্রবীণ সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ—এক বীরবল ছাড়া আর কারও নাম মনে আসছে না। হাল্‌কা চটুল প্রবন্ধ রচনায় বুদ্ধদেব বসু এবং অন্নদাশঙ্কর রায় খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু হাস্যরসের ওস্তাদ কারিগর তাঁকেই বলব যিনি পর্বতের বিরাট কঠিন গাম্ভীর্যও ভেঙে দিতে পারেন ঝর্নার চকিত কলহাস্যে, যাঁর কাছে দুর্লঙ্ঘ্য নয় লঘু ও গুরুর মাঝখানকার চৌহদ্দিটা। এই হাস্যরস অকৃপণ প্রাচুর্যে ছড়ানো রয়েছে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ-বৎসরব্যাপী বিচিত্র বিপুল গদ্য-সাহিত্যের যেখানে সেখানে। হঠাৎ কখন যে তা ঝল্‌কে উঠে আমাদের চম্‌কে দিয়ে যাবে তার ঠিকানা নেই; হয়তো বা কোনো গুরুভার বিপুলকায় চিন্তার চাপে কুঞ্চিত আমাদের কপাল, কোন্‌ দিক দিয়ে চকিতে এসে স্মিতহাস্যশীতল একটুখানি চন্দনের প্রলেপ বুলিয়ে দেয় তার উপর, আর আমরা ভাবি আমাদের বোঝবার ভাববার সমস্ত পরিশ্রম এইখানে সার্থক। "জীবন-স্মৃতি"-তে জ্যোতিদাদাদের স্বাদেশিক সভার যে বিবরণ আছে শুধু সেইটুকুর জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম শ্রেণীর গদ্যলেখক বলতে ইচ্ছে করে। তাঁর হাসি কিন্তু তাঁর অনুভূতির গভীর উৎস থেকে বেরিয়ে এসেছে, বুদ্ধির চকমকি পাথর থেকে ঠিক্‌রে পড়ে নি। তাই এতে বিশালতা আছে, গভীরতা আছে, কিন্তু স্ফুলিঙ্গের দাহিকা শক্তি নেই। তিনি যাকে উপহাস করেছেন তাকে ক্ষমা করেছেন, যাকে বিদ্রূপ করেছেন তাকে স্নেহ করেছেন। তাঁর হাস্যরস তাঁর হিউম্যানিজ্‌ম্‌-এর অবিশ্লেষ্য অঙ্গ, সেই হিউম্যানিজ্‌ম্‌-এর মতই কঠিন নয়, কোমল।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে গদ্য-পদ্যের আঙ্গিক ও বিষয়ের দিক থেকে সর্ববিধ বিকাশের পরিধি এতই বিপুল যে, কোনো একজন লেখকের পক্ষে তা অসম্ভব ঠেকে, মনে হয় এ যেন আস্ত একটি যুগের, সমগ্র একটি সাহিত্যধারার ক্রমবিবর্তন। তবে আমার বিশ্বাস যে গদ্যের বেলা তাঁর রচনাশৈলীর বিকাশটা একটানা নয়, সমতল নয় তার গতি। লক্ষ্য করলে সেখানে ওৎরাই-চড়াই পাওয়া যায়। মোটামুটি ভাবে এবং সময়ের হিসাবে কিছু ভুলভ্রান্তির অবকাশ মেনে নিয়ে, বলা যেতে পারে যে ১২৯৮ সালের কাছাকাছি যখন তাঁর গল্প লেখার সূত্রপাত এবং যখন "প্রাচীন সাহিত্যে"র বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি প্রথম বেরোয়, তখন থেকে "রাজটিকা" "মণিহারা" প্রভৃতি

ভাষার দিক থেকে চমকপ্রদ কয়েকটি গল্প-প্রকাশের তারিখ ১৩০৫-৬ পর্যন্ত; তার পরে "জীবন-স্মৃতি"-র রচনাকাল ১৩১৮ থেকে "পাত্রপাত্রী" "পয়লা নম্বর" লেখার সময় ১৩২৪ পর্য্যন্ত; এবং সর্বশেষে, "শেষের কবিতা", "রাশিয়ার চিঠি", "সাহিত্যের পথে"-র শেষদিককার প্রবন্ধগুলি (বিশেষত "আধুনিক কাব্য"), এ-সমস্তের রচনাকাল অর্থাৎ ১৩২৪ থেকে ১৩৩৯ পর্য্যন্ত—এই তিনটি যুগ যেন তাঁর গদ্য রচনার তিনটি শিখরে অধিষ্ঠিত। এই তিনটি যুগের গদ্যে যতখানি শক্তি, যতখানি দীপ্তি, যতখানি সজীব ও বেগবান চিত্তের প্রকাশ আমরা পাই, অন্য সময় এতটা পাই না। তার মানে এ নয় যে এই সময় ছাড়া তাঁর ভাল লেখা, এবং খুব ভাল লেখা, নেই। নিশ্চয়ই আছে, তবে আনুপাতিক সংখ্যায় কম, এবং আপেক্ষিক জ্যোতিতে কিছুটা নিষ্প্রভ। এ-সম্পর্কে একটি লক্ষ্য করবার কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ যে-হেতু প্রথমত ও প্রধানত কবি, তাই তাঁর গদ্যে কাব্যের যে-ইন্দ্রজাল তিনি বুনে গেছেন তার মনোহারিকা শক্তিতে বিবিধ সময়ের লেখায় তারতম্য অপেক্ষাকৃত অল্প, তাঁর অন্য গুণটিতে, হিউমর বা হাস্যরসে, উৎকর্ষের স্তরভেদ অধিকতর সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের লেখা "ছেলেবেলা"-র আশ্চর্য সরলতা, এবং "তিন সঙ্গী"-তে অলঙ্কারের চোখ-ঝল্‌সানো জৌলস ও বাক্যের শানানো ভঙ্গি সমঝদার পাঠকদের কাছ থেকেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদায় করেছে। রীতির দিক দিয়ে "তিন সঙ্গী" "শেষের কবিতা"রই অতিরঞ্জিত সংস্করণ, এবং "ছেলেবেলা"র সঙ্গে "জীবন-স্মৃতি"র গোড়ার দিককার অধ্যায়গুলির তুলনা অনিবার্য। "ছেলেবেলা" বেশি লিরিক, কিন্তু ভাষা ততটা জোরালো নয়, কিছু একঘেয়েও বটে। আর বইখানা একেবারে ছবিসর্বস্ব—সম্ভবত ছেলেদের জন্য লেখা ব'লেই। চিত্রণের সঙ্গে মননের যে-সঙ্গৎ আগের বইটাতে আসর জমিয়ে রেখেছিল এখানে তার অভাব লক্ষ্য করি। হাস্যরসের জোগানেও কার্পণ্য ঘটেছে; যদি বা হাস্যরস পাই তাতে পূর্বের দীপ্তি আর পাই না। "তিন সঙ্গী" এবং "ছেলেবেলা"র শৈলীগত অভিনবত্ব স্বীকার করেও আমার মনে হয় না যে এগুলি রবীন্দ্রনাথের সহজ স্বাভাবিক লেখা, প্রাণের বেগে, রসের টানে কলমের ডগায় এসে পড়েছে। দু'টো বই-ই অতিশয়-ধর্মী, বিশেষ কোনো পাঠকমণ্ডলীর দিকে তাদের লক্ষ্য। হয় তিনি অতি যত্নসহকারে

কলমটাকে খুব হাল্‌কা ক'রে ধরেছেন, নয় তো বেশ একটু চেষ্টা করেই কলমের উপর চাপ দিয়েছেন, আঁচড় কেটেছেন শক্ত ক'রে, কড়া রঙের কালি দিয়ে অক্ষরগুলিকে চক্‌চকিয়ে তুলেছেন। এক কথায় যাকে বলে tour de force। তাই এতে আমাদের তাক লাগে, গুণপনার তারিফ করি, কিন্তু সে গভীর ও স্থায়ী তৃপ্তি এ-বইগুলোতে পাই না যার আস্বাদ আমরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যে বারে বারে পেয়েছি।

* * *

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রীতির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমার পূর্বোক্ত বিশ্বাসটিকে প্রতিপন্ন না হোক, প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেও সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, তার অভাবে প্রবন্ধটি খণ্ডিত ও মূল্যহীন। এ-অবস্থায় ছাপতে দেওয়াতে স্বভাবতই আমার প্রবল অনিচ্ছা,—সম্পাদকের প্রবলতর আদেশ তার উপর জয়ী হয়েছে। দায়িত্ব তাঁরই।

বের্গসঁ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দার্শনিক মেজাজ দু'ভাগে ভাগ করা চলে: যুক্তিনির্ভর ও আবেগ-নির্ভর। কাণ্ট পড়তে বসলে শিরদাঁড়া সোজা রাখতে হয়, কোনো একটি শব্দের আনাগোনাতেও শিথিল হওয়া চলে না। এবং পাঠক এখানে যে আনন্দ পান তা কল্পনার প্রসারে নয়, বুদ্ধির দীপ্তিতে। অথচ, প্লটিনস্‌ পাঠের প্রধান আনন্দ আবেগের আলোড়নে। বুদ্ধি এখানে ঝিমিয়ে থাকলে ক্ষতি কম, রসবোধ ভোঁতা হলে সবটাই ব্যর্থ। বের্গসঁ নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় দলেই পড়েন। যাঁর মনের গঠন আঁটসাঁট বিজ্ঞানের কাঠামোয় বাঁধা, বের্গসঁ না-

ফরাসী দার্শনিক। ১৮৫৯—১৯৪১। তাঁর প্রধান গ্রন্থ—"মহাকাল ও পুরুষকার" (১৮৮৮), "জড় ও স্মৃতি" (১৮৯৬), "সৃজনী ক্রমবিকাশ" (১৯০৭), "হাস্য" (১৯১১), "নীতি ও ধর্মের দুই উৎস"। ১৯২৭-এ সাহিত্য শাখায় তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

প'ড়েও তিনি নিজেকে হয়ত বঞ্চিত মনে করবেন না; কিন্তু তর্কের মানদণ্ডই যাঁর কাছে চরম নয়, অর্থাৎ রসবোধের স্বতন্ত্র মূল্য যিনি দিতে প্রস্তুত, বের্গসঁর বই তাঁর কাছে দুর্মূল্য।

তাই ব'লে বলতে চাই নে যে বের্গসঁ-দর্শন শিথিল কল্পনাসর্বস্ব। এ কল্পনার বলিষ্ঠ কাঠামো ত' বর্তমানই, এমন কি এখানে বৈজ্ঞানিক তথ্যের যে ভিত্তি আছে তার বৈজ্ঞানিক মূল্যও শ্রদ্ধেয়। কারণ, মনস্তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব ও গণিতে তাঁর দক্ষতা বিশাল ও গভীর। তাই তাঁর লেখাকে উচ্ছৃঙ্খল আবেগ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। তবু দরবার বুদ্ধির কাছে নয়, রসিক-চিত্তের কাছেই।

তাঁর বলিষ্ঠ কল্পনার সঙ্গে সাহিত্যিক প্রতিভার অপূর্ব মিলন ঘটেছে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে অনেক দার্শনিকের লেখাই সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ। উদাহরণ-স্বরূপ ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে বার্কলি বা হিউমের আলোচনা দেখানো চলে, গ্রীক সাহিত্যের কোনো সার্থক সঙ্কলনই প্লেটোকে বাদ দিতে পারে না, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রত্যেক বোদ্ধাই শঙ্করভাষ্যের অপূর্ব ভাষায় মুগ্ধ। আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে জেমস্, রাসেল, ব্র্যাডলি, অয়কেন ইত্যাদিকে শুধু সুলেখক বললে কমিয়ে বলা হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু প্লেটো ও বার্গসঁর বৈশিষ্ট্য আছে: প্লেটোর সাহিত্যিক প্রেরণা প্রায় সমগ্র ইওরোপিয়ান সাহিত্যে প্রত্যক্ষ, এবং তিনি রিপাবলিকের শেষ খণ্ডে কবিতার মূল্য খণ্ডন করতে ব'সেও তা শেষ করলেন নিবিড় কাব্যের মধ্যে। আর বের্গসঁ,—তাঁর ভাষা এত ধারালো, রূপকের আনাগোনা এত স্বচ্ছন্দ ও অভিনব যে যে-কোনো কাব্যসঙ্কলনে তাঁর রচনা থেকে গদ্যকবিতার উদাহরণ নেওয়া দুঃসাহস নয় হয়ত। তাঁর দার্শনিক মতবাদ অনেক সময়ই গ্রহণ করা চলে না, তবু তাঁর গ্রন্থ অগ্রাহ্য নয়, অন্তত প্রিয় কবির কাব্যগুচ্ছের পাশে তাঁর স্থান। তাঁর দর্শন যাচাই করতে গিয়ে সমালোচক তাই ব'লে বসলেন—"শেক্সপীয়র বলেন জীবন যেন চলন্ত ছায়া, শেলী বলেন এ একটা রঙিন কাঁচের ঘর, আর বের্গসঁ বলেন জীবন যেন হাউই—আকাশে হাজার তারা ছিটিয়ে চলেছে: শেষেরটাই যদি আপনার পছন্দ হয় ত' মন্দ কি!" (রাসেল)। তাঁর দর্শন নিয়ে আলোচনার বিপদও এখানেই; কারণ এ আলোচনায়, অন্তত এর বর্ণনায়,

সুর ও সৌরভ বজায় রাখতে হ'লে কাব্যপ্রতিভা অনিবার্য। পাঠকবর্গের কাছে তাই সঙ্কোচ জানিয়েই অগ্রসর হচ্ছি। তা ছাড়া সাহিত্যের পত্রিকায় তত্ত্ববিচার অবান্তর, আমার উদ্দেশ্য বের্গস-দর্শনের সহজ বিবৃতি মাত্র।

*　　　*　　　*

বের্গস'র মতে বস্তু হ'লো এক অবিচ্ছেদ্য জীবনধারা, তার স্বরূপ গতি—এ গতি নদীর মত কোনো কিছুর গতি নয়, শুধু গতি। বাইরের কোনো তাগিদ এখানে নেই,—যেন একটা হাউই, আপন মনে আকাশে তারা ছিটিয়ে চলেছে।

স্থিতি ও গতির সম্বন্ধ দর্শনের ইতিহাসে একটা মূল সমস্যা। গ্রীক যুগের Zeno ও হেরাক্লাইটাস্, ভারতবর্ষে শঙ্কর ও বুদ্ধ, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপে স্পিনোসা ও লাইব্‌নিৎস্—এ সমস্ত দ্বন্দ্বের মূলেই স্থিতি ও গতির সম্বন্ধ। হালের ইওরোপে পক্ষপাত মোটের উপর গতির দিকেই—প্রাগ্‌মাটিস্‌ম্, রাসেল, আলেকজেণ্ডার, ক্রোচে, এঁরা সকলে নানান ভাবে গতির দিকেই ঝুঁকেছেন। এ পক্ষপাত গ্রীসের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে আধুনিক মনের সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। প্লেটনিক স্বপ্নমিনারে স্থিতির ধ্যান নয় আর। আজকের মানুষ ত্রস্ত ও ব্যস্ত। "চটপট নাও, সময় যে হয়ে এল"—আধুনিক মনে এই কথা, আর এই কথারই প্রতিধ্বনি। এ-প্রতিধ্বনি দর্শনের অন্তঃপুরেও প্রবেশ করেছে যেন।

ব্যাপারটা বের্গস'র বেলায় চরমে পৌঁচেছে। তাঁর ভাষার জাদু আর রূপকের কারিগরি উজোড় করেছেন গতিকে অলঙ্কৃত করতে। স্থিতিকে দেউলে ক'রেও শান্তি নেই, স্থিতিমূলক শব্দরাশি তাঁর কাছে অভিনব আধ্যাত্মিক কটূক্তি মাত্র—প্লেটনিক, গাণিতিক, নৈয়ায়িক এবং আরও অনেক।

প্রাক্‌বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান জীবন বা গতির স্বাধীন স্বরূপের সন্ধান পায়নি। তাই ক্রমবিকাশের দোহাই দিয়ে খুঁজেছিল যন্ত্রে বিশ্বরূপ। স্পেনসর, চলতি কথায় প্রাণীতত্ত্বের পণ্ডিত ব'লেই যদিও তাঁকে জানি, যে-দর্শনের সূত্রপাত করলেন তাতে জীবন প্রায় জড়কে গ্রাস করতে চাইল। সে দর্শন মানবমনের প্রত্যেক ভাব ও আবেগের, এমন কি মোনালীসায় সূক্ষ্ম আঁচড় গুলোর পর্যন্ত, খবর আনল এক আদিম পৌরাণিক ধূমপুঞ্জের ভিতর থেকে। ক্রমবিকাশের অতি স্থূল ব্যাখ্যা এটা। ক্রমবিকাশ আসলে সৃজনী,—যেন

খেয়ালী শিল্পীর ছবি আঁকা। উদ্দেশী-ক্রমবিকাশের কথাতেও মস্ত ফাঁকি আছে, কারণ এ শুধু যান্ত্রিক ক্রমবিকাশকে ঘুরিয়ে দেখা। যান্ত্রিক ক্রমবিকাশ প্রকৃতির পথ বাঁধতে চায় অতীতের দিক থেকে, আর উদ্দেশী-ক্রমবিকাশ সে-পথ বাঁধে অতীতের দিক থেকে। তাই কোথাও ক্রমবিকাশের মুক্ত স্বরূপ ধরা পড়ে না। ক্রমবিকাশে শুধু স্বাধীন প্রাণের স্বপ্রেরণা, সে সৃষ্টি করে নিছক নিজের নেশায়। এই প্রাণই পরমতত্ত্ব, বের্গস এর নাম দিয়েছেন এলাঁ ভিতাল।

বস্তুর প্রাণময় রূপ আমাদের চোখে পড়ে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধি ও বোধির প্রভেদে। মানুষ চলে বুদ্ধির তাগিদে, আর বুদ্ধির মজাই হ'লো বস্তুর স্বরূপ সে জানতে পারে না। এ সন্ধান আনে বোধি। বুদ্ধি বস্তুর চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে তথ্যের ঝুলি বোঝাই করে, বোধির প্রবেশ তত্ত্বের অন্দরমহলে।

ধরুন একটা উপন্যাস পড়ছি। লেখক নায়কের নানান বর্ণনা দিচ্ছেন, তার মুখে দিয়েছেন অজস্র কথা, তাকে দেখাচ্ছেন বহু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। তবু কতটুকু খবর পাই সে নায়কের? কিন্তু, কোনোমতে যদি একবার নিজেকে মেলাতে পারি তার সঙ্গে—সরল একটি ঘটনামাত্র—তা হলে তাকে জানতে পারব সমগ্রভাবে। কিম্বা গ্রীক না জেনে একটা গ্রীক কবিতা পড়বার চেষ্টা করছি—মূল কবিতার রস কি কোনোদিন জুটবে হাজার তর্জমার সাহায্যে? কিম্বা ধরুন, প্যারিসের লক্ষ ছবি দেখছি, কিন্তু তার মধ্যে প্যারিস ঘুরে আসবার অনুভূতি কোথায়? বুদ্ধি নানান দৃষ্টিকোণ থেকে, অজস্র প্রতীকের সাহায্যে বস্তুকে তর্জমা করে, বাইরের থেকে নানান ভাবে উঁকি-ঝুঁকি মেরে বস্তুর খবর আনতে চায়, কিন্তু বোধি নিয়ে যায় একেবারে অন্দরমহলে, নিরাভরণ বস্তুর মুখোমুখি।

বুদ্ধির দৃষ্টি খণ্ডদৃষ্টি, প্রাণের অবিরাম স্পন্দনে সে তাই স্বপরিচ্ছিন্নতা বিক্ষেপ করে। বোধির জ্ঞানে আছে সমগ্রতা। বের্গস ছায়াচিত্রের উদাহরণ দেন: হাজার হাজার ছবি সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলে তবে গতির রূপ স্পষ্ট হয়। আর প্রত্যেক ছবিকে পৃথকভাবে দেখলে মনে হয় ছবি, শুধু ছবি।

বুদ্ধির খণ্ডদৃষ্টির পিছনে ব্যবহারী মনের তাগিদ রয়েছে। চিরচঞ্চল প্রবাহকে ব্যবহারে নিয়োগ অসম্ভব, কারণ সে প্রবাহে পুনরাবৃত্তি নেই। মানুষের

কারবার স্থবির নিয়ে। কাজের মানুষ তাই 'এলাঁ ভিতাল'কে ভেঙে দেখতে চায়। এই ভাবে, সংগ্রামশীল জীবের উৎবর্তন প্রয়াসেই জড়ের জন্ম। কিন্তু ব্যবহারের দাবী ত আর বস্তুর দাবী নয়, বস্তুর দিক থেকে তাই জড়ের অনুভব নেহাৎই অনুভবাভাস। এ জগৎ বুদ্ধিনির্মাণ।

জাড্যানুভবের সঙ্গে "দেশে"র চিন্তা অঙ্গাঙ্গী, তাই বের্গসঁর মতে দেশও বুদ্ধিরই সৃষ্টি। দর্শনের ইতিহাসে দেশ ও কালকে এতদিন এক কোঠায় ফেলে আসা হয়েছে, কিন্তু বের্গসঁ দেখলেন এ দুয়ের তফাৎ আকাশ-পাতাল। কালের দুটো রূপ আছে, গাণিতিক কাল ও ডিউরেশন্। ডিউরেশন্ কথার প্রতিশব্দ দুষ্প্রাপ্য ; চলতি ইংরেজি অর্থেও বের্গসঁ এর ব্যবহার করেন নি। কারণ, এর মধ্যে শুধু টিঁকে যাওয়ার ভাব নেই, বেঁধে রাখার ভাবও আছে। সমগ্র অতীত বাঁধা পড়ে বর্তমানের প্রতি মুহূর্তে, ডিউরেশনের মূলে এই কল্পনা। এবং কালের প্রকৃত রূপ এইটেই। গাণিতিক কাল বুদ্ধিরই জড়সৃষ্টি, কালের প্রকৃত রূপ ডিউরেশন্। এ শুধু ঘটনার পর ঘটনার সমাবেশ নয়, ভবিষ্যতের দিকে অতীতের সমগ্র অগ্রসর, বর্তমানে অতীতের পরিপূর্ণ অনুবর্তন, যদিও ভুললে চলবে না এ অগ্রগতির প্রত্যেক স্তরে অভিনবের আকস্মিক আবির্ভাব।

ডিউরেশনের প্রধান পরিচয় স্মৃতির মধ্যে। স্মৃতির সাহায্যেই সমগ্র অতীত সজীব হ'য়ে ওঠে বর্তমানে। স্মৃতি সম্বন্ধে চলতি মত বের্গসঁ মানেন না। যন্ত্রের মত একটা কবিতা মুখস্থ বলাই ত' স্মৃতি নয়, স্মৃতির মধ্যে প্রত্যেক অতীত আবেগ পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে। স্মৃতির জন্যেই প্রতি মুহূর্তে আমরা সমগ্র অতীতের বোঝা পিঠে নিয়ে চলি, বর্তমান নুয়ে পড়ে অতীতের ভারে।

বুদ্ধি ও বোধির তফাৎ দেখাতে বের্গসঁ সমষ্টি ও সমগ্রতার হেগেলিয়ান্ প্রভেদের পুনরুল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন অংশের যোগফলে সমষ্টি পাই, সমগ্রতা পাই নে। বিভিন্ন স্বরের সমষ্টি ছাড়াও সুরের সমগ্র সত্তা বর্তমান। বর্ণমালার সমষ্টিতে কাব্যরসের সন্ধান মূঢ়তা। ক্যানভাস্, রেখা আর রংএর যোগফলেই চিত্র হয় না। বুদ্ধি সমষ্টির সন্ধান আনতে পারে, বোধির জ্ঞানে সমগ্রতা।

পুরুষকারের প্রমাণও এখানেই। মানুষের জীবন ভেঙে ভেঙে দেখলে তার পুরুষকারের কথাই ওঠে না। পৃথকদৃষ্টিতে তার প্রত্যেক কাজই

নিয়ন্ত্রিত। শৃঙ্খলাবাদের মূল ভিত্তি খণ্ডদৃষ্টি। তবে মানুষ ত আর খণ্ডসত্তার সমষ্টিমাত্র নয়, বোধির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তার সমগ্র রূপ। সে রূপে অবাধ মুক্তি, শৃঙ্খলের লেশমাত্র নেই।

ধর্ম পুরুষকারনির্ভর। বের্গসঁর এই প্রমাণ তাই বিংশ শতাব্দীতেও ধর্মের নতুন প্রতিষ্ঠা খুঁজল। তবে চলতি খৃষ্টধর্মের সঙ্গে তফাৎ অনেক। তাঁর মতে ইওরোপ এতদিন গ্রীক সভ্যতার মোহে খৃষ্টের নামে প্লেটোর অতীন্দ্রিয়-বাদকেই সর্বত্র পুজো করছে। কিন্তু খৃষ্টের প্রকৃত বাণী জীবনের বাণী, স্থিতির বাণী নয়। তাঁর পুনরুজ্জীবনের গভীরতায় প্রকাশ যে জীবনপ্রবাহ অখণ্ড, অবিচ্ছেদ্য। এ বাণী গ্রীক ধর্মে ছিল না, হিন্দু ধর্মে ছিল না। গ্রীক ও হিন্দু স্থিতির মোহে জীবনকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। এমন কি, প্লটিনাসের মত বুদ্ধিবিতৃষ্ণও গতিমন্দিরের সিংহদ্বার পর্যন্ত এসে ফিরে গেছেন স্থিতির টানে।

*　　　　*　　　　*

"আমার ত' বিশ্বাস," বের্গসঁ নিজেই বলেছেন "কোনো দর্শনকে খণ্ডন করতে বসে যে সময়টা খরচ করি তা সবটাই পণ্ডশ্রম"। অন্তত বের্গসঁর মূল কল্পনা নিয়ে তর্ক নিষ্ফল। কারণ, রাসেল যা বলেছেন, এ হল কল্পনার মহাকাব্য; এর বিচার তাই নন্দনতত্ত্বে, দর্শনের প্রাঙ্গণে নয়। কারণ দর্শনের প্রাঙ্গণ যুক্তির রুক্ষ কাঁটায় আকীর্ণ। দার্শনিক বিচারে বুদ্ধির দায় থেকে নিস্তার নেই। অথচ বের্গসঁ সে বিচার অনায়াসে অগ্রাহ্য করবেন।

তবু বুদ্ধির দাস আমরা। তবে বুদ্ধির মেকি চশমাটা কোনোমতে চূর্ণ ক'রে শুদ্ধ বোধির আশ্রয় নিতে পারলে এলাঁ ভিতালের সন্ধান পাব কি? হয়ত ঝিলিমিলি ঝিলামের পাশে সান্ধ্যবলাকার পক্ষধ্বনি কবির বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়েছিল, তিনি হয়ত পেয়েছিলেন শুদ্ধ বোধির হঠাৎ ঝলকানি। আর তখন তাই—

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।

কবিতা

কার্তিক, ১৩৪৮

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

ভারজিনিয়া উলফ

শ্রীচন্দ্র সেন

"এত বিচ্ছিন্ন রকম ধর্ম্ম, প্রার্থনা ও বর্ষাতি কেন? ক্লারিসা ভাবছেন, 'এইটিই সবচেয়ে অদ্ভুত, এইটিই সবচেয়ে রহস্যময়'। ঐ বৃদ্ধার কথাই তাঁর মনে হচ্ছিল যাকে টানা আলমারীর কাছ থেকে ড্রেসিং টেবিলের দিকে যেতে দেখছিলেন। এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছিলেন। সব চেয়ে বড় রহস্য— যা কিলম্যান বলছেন তিনি সমাধান করেছেন, আর পিটার বলছেন তিনি, অথচ যার সম্বন্ধে এদের কারুরই বিন্দুমাত্র ধারণা আছে ব'লে ক্লারিসা মনে মনে করেন না—তা এই : এখানে একটি ঘর, ওখানে আর একটি। ধর্ম্ম কি এই সমস্যা বোঝাতে পেরেছেই না ভালবাসার" ('Mrs. Dalloway')

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ই. এম. ফর্স্টার মনে করেন উপরের কথাগুলির মধ্যে আমরা ভারজিনিয়া উলফের একটি প্রধান বক্তব্যের পরিচয় পাই। "এখানে

* ১৮৮২—১৯৪১। প্রধান গ্রন্থ : উপন্যাস—Jacob's Room, To the Lighthouse, Mrs Dalloway, Orlando, The Waves, জীবনী—Flush ; প্রবন্ধ—The Common Reader, A Room of One's Own, Three Guineas. ইনি ভিক্টোরীয়যুগের বিখ্যাত সমালোচক লেজলি ষ্টিভন্‌স্‌-এর কন্যা ; বিবাহ করেন লিওনার্ড উলফকে। এ-যুগের ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক, ইনি একজন তীব্র 'ফেমিনিস্ট'ও ছিলেন। মারা গিয়েছেন নদীতে ডুবে আত্মহত্যা ক'রে।

একটি ঘর, ওখানে আর একটি'। অধিকাংশ লেখকের ন্যায় মিসেস উলফকেও অন্তর ও বাহিরের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইয়াছে তিনি বাহিরকে লইয়াই যতদূর সম্ভব ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"The Mark on the Wall" ("দেওয়ালে চিহ্ন") নামক একটি প্রবন্ধে দৃষ্টান্তের সাহায্যে তিনি তাঁহার টেকনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মিসেস এ্যামব্রসকে আমরা অশ্রুরুদ্ধ অবস্থায় ওয়াটারলু ব্রিজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি। সমস্ত পৃথিবীকে তিনি তাঁহার চোখের কম্পিত অশ্রুর ভিতর দিয়া দেখিতেছেন। এই অশ্রুর ইতিহাসের ভিতর দিয়া পরে আমরা তাঁহার বিষয় জানি।

চরিত্র অঙ্কনে তিনি অতি ক্ষুদ্র জিনিষের সাহায্যে মানুষের অন্তরের গোপন কথা প্রকাশ করিয়াছেন। মিসেস উলফের দৃষ্টিক্ষমতা অদ্ভুত। কেবলমাত্র ইহার সাহায্যে উপন্যাসিক হওয়া চলে না, কিন্তু মিসেস উলফ এই শক্তির কি চমৎকার ব্যবহার করিয়াছেন তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার লেখার সর্ব্বত্রই পাইয়া থাকি, তবে এই ক্ষমতাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন বলিলে তাঁহার মননশক্তিকে তুচ্ছ করা হইবে। মিসেস উলফ মনের গতিবিধি, বিশেষত তরুণবয়স্কদের মনের গতিবিধি সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছেন। "Jacob's Room" নামক উপন্যাসে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যার প্রতি মিসেস উলফের শ্রদ্ধা আছে। এই কারণে তাঁহার লেখায় আভিজাত্য আছে।

মানুষ কি চিন্তা করে সে কথা বর্ণনা করা শক্ত নয়। মিসেস হামফ্রে ওয়ার্ড তাহা সুচারুরূপে করিয়াছেন। ফর্স্টার বলেন যে চিন্তার ভঙ্গী বুঝাইবার ক্ষমতা তিনি একমাত্র মিসেস উলফের রচনায় দেখিয়াছেন।

মিসেস উলফ তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে উপন্যাসের চিরন্তন বিষয়-বস্তু মানুষ। মানুষকে কি ভাবে অঙ্কন করা যাইতে পারে তাহার পদ্ধতি বদলায় ও বদলান উচিত। ঔপন্যাসিকেরা বিভিন্ন সময় মানুষের অন্তরতম জীবনকে কি ভাবে ব্যক্ত করিবেন, এই সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভিকটোরিয়ান ঔপন্যাসিকেরা একভাবে এই প্রচেষ্টা করিয়াছেন এডওয়ার্ডিয়ানরা আত্মীয় স্বজন বাড়ী ঘর বর্ণনা করিয়া এই সমস্যার সমাধান

করিয়াছেন। ভর্জিয়ান লেখকেরা তাঁহাদের পথ যদি খুঁজিয়া লইতে পারেন তবেই উপন্যাসের একটি নূতন যুগের অভ্যুদয় হইবে।

ভারজিনিয়া উলফ তাঁহার নিজস্ব টেকনিকের সাহায্যে যে চরিত্রগুলি দেখাইয়াছেন তাহারা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছে।

মিসেস উলফের তিনটি উপন্যাস "Jacob's Room", "Mrs Dalloway" ও "To the Lighthouse" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা ও টেকনিক এই উপন্যাস তিনখানিতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। গল্পাংশ এই তিনটি উপন্যাসে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। একজন সমালোচকের ধারণা যে মিসেস উলফের উপন্যাস শেষের দিক হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলে, কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না। এই মন্তব্যের মধ্যে বোধ হয় কিছুটা সত্য আছে।

এই তিনটি বইয়ের মধ্যে কোন ঘটনাই ঘটে না। কেবলমাত্র "To The Lighthouse"-এ লাইটহাউসে বেড়াইতে যাইবার কথা আছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই মিসেস উলফ মানুষকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বুঝিয়াছেন। তাঁহার ভাষার মধ্যে একটা অলস কবিত্ব আছে। একজন সমালোচক বলেন "মিসেস ড্যালওয়ে" বইটি তাঁর একটি ক্যাথিড্রালের মতন মনে হয় এবং "জেকবস রুম" একটি স্পাইরাল সিঁড়ির ভঙ্গী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এইভাবে বলিতে গেলে "টু দি লাইটহাইস" স্বপ্নজড়িত গানের সুরের মত আমাদের কাণে বাজে।

"মিসেস ড্যালওয়ে" বইটিতে প্রধানত আমরা পিটার ও মিসেস ড্যালওয়ে এই দুইটি চরিত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হই। হারলে ষ্ট্রীটের বিখ্যাত ডাক্তার সার উইলিয়াম ব্রাডশকে অতি অল্প কথার ভিতর দিয়া লেখিকা দেখাইয়াছেন। এই বর্ণনার মধ্যে সে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে তাহাতে আমরা ব্রাডশ চরিত্রের হীনতা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। "মিসেস ড্যালওয়ে" বইখানি লণ্ডন সহরের বহুমুখী জীবনে উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জীবনের সহস্র ধারার কলরব বারবার উপন্যাসটিকে ঝঙ্কারমুখর করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্যই "মিসেস ড্যালওয়েকে" ক্যাথিড্রালের সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত হইয়াছে। মাত্র একটি দিনের কথা এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। এই দিক হইতে দেখিতে গেলে

মিসেস ড্যালওয়ে ও জেমস জয়েসের ইউলিসিসে মিল আছে। জয়েসের লিখিবার টেকনিক, ইংরেজীতে যা থাকে stream of consciousness বা অবচেতন মনের স্রোত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মিসেস উলফের রচনাভঙ্গীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

"জেকবস রুমে" জেকব ও মিসেস স্যানড্রা ওয়েণ্টওয়ার্থ উইলিয়ামস্ এই দুইটি চরিত্রই ভাল করিয়া দেখান হইয়াছে। মিসেস উলফ তাঁহার নূতন টেকনিক অনুসারে এই উপন্যাসখানি সর্ব্বপ্রথম রচনা করেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার "Night and Day" উপন্যাসখানিতে সোজাসুজিভাবে তিনি গল্প রচনা করিয়াছেন। এই বইটির ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গীর মধ্যে টেকনিকের দিক দিয়া বিশেষ কোন নূতনত্ব নাই। ক্যাথেরিন ও রালফ ডেনহামের মাঝখানে সামাজিক ও চরিত্রগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও কি ভাবে তাঁহারা প্রেমের বন্ধনে ধরা দেন, এই উপন্যাসে লেখিকা তাহা দেখাইয়াছেন। "Night Aud Day" লিখিবার পূর্ব্বে "Kew Garden" ও "The Voyage Out" নামক আরও দুইখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।

মিসেস উলফ অনেকগুলি পুস্তকে প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। "The Common Reader" (1st and 2nd series), "Mr. Bennett and Mrs Brown", "A Room of Ones Own" এবং "A Letter to a Young Poet", এই বইগুলিতে ইংরেজি সাহিত্যের সমালোচনা, তাঁহার নিজের টেকনিকের কথা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে আমরা মিসেস উলফের অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাই। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে মিসেস উলফ সন্দিহান হইলেও তাঁহার বিশ্বাস শীঘ্রই ইংরেজি সাহিত্যে একটি বড় যুগের উদয় হইবে। আজকালকার কোন লেখক সম্বন্ধেই মিসেস উলফের বিশেষ উচ্চ ধারণা দেখা যায় না। এ বিষয়ে Irving Babbitt এর নিম্ন-উদ্ধৃত মতের সঙ্গে বোধ হয় মিসেস উলফের সমালোচনার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে : "It has been a constant experience of man in all ages that mere rationalisn leaves him unsatisfied. Man craves in some sense or other of the word an enthusiasm that will lift him out of his merely rational self."

কার্ত্তিক, ১৩৪৮

মিসেস উলফের টেকনিক সর্ব্বত্র ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া যায় না। "The Waves" নামক উপন্যাসে এ টেকনিক অনেকটা একঘেয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে ভাষার সহজ গতি কৃত্রিমতায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি লাইন "The Waves" হইতে উদ্ধৃত করা হইল :—

"But if one day you do not come after breakfast, if one day I see you in some looking-glass perhaps looking after another, if the telephone buzzes and buzzes in your empty room, I shall then after unspeakable anguish, I shall then —for there is no end to the folly of the human heart— seek another, find another, you. Meanwhile, let us abolish the ticking of time's clock with one blow. Come closer."

'গোরা'

একজন ইংরেজ সমালোচক বলেছেন যে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের মধ্যে উপন্যাসের সমালোচনা করাই সব চেয়ে শক্ত, কারণ উপন্যাসের সম্পূর্ণ মূর্তিটি আমাদের মনে কখনো ধরা পড়ে না। এ-কথা সত্য। গদ্যে রচিত একটি কাল্পনিক দীর্ঘ কাহিনী—উপন্যাস বস্তুটি হ'লো এই, স্রোতের মতো নিরবচ্ছিন্ন ব'য়ে চলেছে, ভাষা তার বাহন মাত্র, ভাষার নিজস্ব মূল্য এখানে সব চেয়ে কম, যদিও অনেক লেখক—এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রগণ্য—উপন্যাস-রচনাতেও ভাষাবিন্যাসের অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। খানিকটা জল তুলে নিলে যেমন নদীকে পাওয়া যায় না অথচ নদীটা জল ছাড়া কিছু নয়, তেমনি সমস্ত উপন্যাসটিকে একসঙ্গে মনের মধ্যে গ্রহণ করা সম্ভবই নয়, বিচ্ছিন্ন

* রবীন্দ্র-রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী।

অংশমাত্র আমরা পেতে পারি, এবং অনেক সময় সেই ভগ্নাংশগুলোকেই ভুল ক'রে পূর্ণসংখ্যার মূল্যও দিই। আমাদের হাতে জলের যে-অঞ্জলিটুকু ধরে তা যে নদী নয় সে-খেয়ালও আমাদের থাকে না। সম্পূর্ণ কবিতা স্মরণে গ্রথিত রাখা সম্ভব, কাজেই সমস্ত কবিতাটিকে একসঙ্গে স্পষ্টই দেখতে পাই, মহাকাব্যের গঠন শিথিল, তাকে ছোটো-ছোটো অংশে ভাগ ক'রে নিয়ে চোখের সামনে রাখতে পারি, নাটক ঘনবিন্যস্ত হ'লেও আকারে ছোটো, আর ছোটো গল্প তো এতই ছোটো যে তার সঙ্গে প্রায় কবিতার মতো ব্যবহার চলে। কিন্তু উপন্যাস আমরা পড়তে-পড়তে ভুলি, ভুলতে-ভুলতে পড়ি, এবং এক উপন্যাস একাধিকার পড়া সমালোচনার তাগিদ ছাড়া একে তো হ'য়েই ওঠে না, আর যদি বা হয়, দ্বিতীয় কি পঞ্চম পাঠেও সেই একই বিস্মৃতি তার বেশির ভাগ আবৃত ক'রে দেয়, কুয়াশার ভিতর দিয়ে গিরি-চূড়ার মতো ফুটে ওঠে এখানে-ওখানে একটু আলাপ, একটু ঘটনা, একটু বর্ণনা। উপন্যাসে আমাদের এইটুকু মাত্র লভ্য, তার বেশি নয়। হাজার পাতার উপন্যাস প'ড়ে উঠে নিজের মনের মধ্যে যখন তাকাই, কী দেখতে পাই? দুটি একটি দৃশ্য, কোনো চরিত্রের বিশেষ একটি ভঙ্গি, কোনো নিবিড় মুহূর্তে উচ্চারিত কোনো কথা। এইটুকু মাত্র। আর, কোনো একটি উপন্যাসের নামে, এইটুকুই আমরা সারাজীবন বহন করি। এককালে আমি প্রচুর পরিমাণে উপন্যাস পড়েছি, তার কতটুকু আমার মনে আমার মনে রক্ষিত হয়েছে? বলতে গেলে কিছুই না। মধ্যরাত্রে শ্যাম্পেনের বোতলে বোঝাই গাড়ি চ'ড়ে দ্‌মিত্রি কারামাজফের নষ্ট মেয়েটার (তার নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি) বাড়ির দিকে দৌড়, বিয়ের দিন সকালে ধোবাবাড়ি থেকে কাপড় এসে না-পৌঁছনোয় লেভিনের ছটফটানি, সূর্যাস্ত আর চন্দ্রোদয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জুডের গ্রীক কবিতা আবৃত্তি, জুডের মৃত্যু, টুর্গেনিভে প্রথম প্রেমের একটা অস্পষ্ট ব্যাকুল মধুরিমা, সমুদ্রতীরের ছোটো ঘরে শুয়ে বালক ডেভিড কপারফীল্ডের হাওয়ার শব্দ শোনা, এমনি নানা ছোটো-ছোটো টুকরো অর্জন করেছি হাজার-হাজার পাতা পার হ'য়ে। এদিক থেকে দেখলে উপন্যাস পড়াই মনে হয় পণ্ডশ্রম।

এ-রকম হবার কারণ আছে। উপন্যাস বড়োই অস্থির, বড়োই আঁকাবাঁকা

তার চলন। তার মধ্যে উড়ে এসে জায়গা জুড়ে না-বসতে পারে এমন জিনিস নেই। বিতর্ক, বক্তৃতা, লেখকের স্বগতোক্তি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সমসাময়িক ইতিহাস—সব-কিছুরই জায়গা আছে এখানে। এত বোঝা নিতে গিয়ে মাঝে-মাঝে নৌকাডুবি ঘটে, কিন্তু ঘটেও না, সেটাই আশ্চর্য। তাছাড়া উপন্যাসে এমন অনেক অংশ থাকবেই যা জোড়া দেবার কলকব্জা মাত্র। পরিসর এত বড়ো ব'লেই এতে খানিকটা বিশৃঙ্খলা খুব ভালো লেখকও প্রায়ই এড়াতে পারেন না। উপন্যাস স্বভাবতই অপব্যয়ী। এত রকম জিনিস মিলিয়ে মিশিয়ে, অনেক বাজে খরচ ক'রে যে বস্তুটি তৈরি হয় তার মূল্য তার সমগ্রতায়, বিশেষ-কোনো অংশে নয়, অথচ সমগ্রভাবে তা আমাদের মন থেকে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মুছে যায়, কোনো-কোনো অংশমাত্র গেঁথে থাকে। এদিক থেকে দেখলে উপন্যাস রচনাই ব্যর্থ।

আসলে অবশ্য উপন্যাস রচনাও ব্যর্থ নয়, তা পড়াও পণ্ডশ্রম নয়। বস্তুত, উপন্যাস-না প'ড়লে আমাদের শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। সমাজ-জীবনে, মানুষে মানুষে বিচিত্র সম্বন্ধের জটিলতায় উপন্যাসই আমাদের শিক্ষিত করে। এ-কাজ কাব্যের নয়, অন্তত মুখ্যত নয়, কাব্য বলতে অবশ্য প্রাচীন মহাকাব্য বুঝছি না। আমরা প্রায়ই ব'লে থাকি যে উপন্যাসই এ-যুগের মহাকাব্য, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে আধুনিক উপন্যাস প্রাচীন মহাকাব্যের একটা অংশমাত্র। পুরাকালে এক মহাকাব্যেই ছিলো আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের তৃপ্তিসাধন, তা ছিলো একাধারে কবিতা ও কাহিনী ইতিহাস ও ভূগোল, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতি—সব। আধুনিক যুগের দিকে মানুষ যতই এগিয়েছে জীবনের বিভিন্ন বিভাগে ততই বিশেষীকরণ হয়েছে, ক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আলাদা হ'য়ে গেলো, গল্প পদ্যকে ছেড়ে গদ্যের আশ্রয় নিলে, কবিতা ব্যবহারিক জীবন ত্যাগ ক'রে আবেগের বিদ্যুৎময় আকাশে ভ্রমণ করতে লাগলো। এই অবস্থায় গল্পের চিরকালের ধারাটি এসে নামলো উপন্যাসে। আজকের দিনে উপন্যাসই আমাদের গল্প শোনবার নেশাকে তৃপ্ত করে—কিন্তু শুধু তা-ই নয়, জীবন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাও বাড়ায়, চোখের সামনে জীবনের বিচিত্র দৃশ্যমালা উদ্‌ঘাটন ক'রে আমাদের অন্তর-মন ধনী ক'রে তোলে। কবিতা শিক্ষিত করে আমাদের অনুভূতি, আমাদের হৃদয়াবেগ, উপন্যাস সমগ্র জীবনের

উপরেই নতুন আলো ফেলে, কত অদ্ভুত কোণ মোড় বাঁক থেকে চিরপরিচিত জীবনকে নতুন ভাবে দেখে অবাক হ'য়ে যাই। এ-হিসেবে, অনেকে হয়তো বলবেন, উপন্যাসই বড়ো শিল্প। আমার এক দার্শনিক বন্ধু বলেন ঔপন্যাসিকের মন কবির মনের চেয়ে বৃহত্তর—কথাটি এ-দিক থেকে ঠিক যে কবির মননশীল না হ'লেও চলে, কিন্তু ঔপন্যাসিকের চলে না, কেননা জীবনের সমালোচনাই তাঁর কাজ। এখানে শুধু এটুকু বলবার থাকে যে তিনি যে-জীবনের সমালোচক তা সমসাময়িক জীবন, তাই উপন্যাস অবশ্যতই সমসাময়িক, কবিতা চিরকালের। কিছু কাল পরে খুব ভালো উপন্যাসের রসও ফিকে হ'য়ে আসে, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই উপন্যাসের মূল্য হ্রাস হয়। এ-যুগে যে-সমস্যা জলন্ত, পরবর্তী যুগে তার চিহ্নও নেই, গত যুগের রীতি-নীতি চিন্তা-ভাবনা এ-যুগে ঐতিহাসিক কৌতূহলমাত্র উদ্রেক করতে পারে, আন্তরিক আগ্রহ জাগাতে পারে না। অতএব উপন্যাসের যেটুকু মূল্য বাকি থাকে তা ঐতিহাসিক মূল্য, অর্থাৎ বিগত কোনো যুগের সমাজজীবনের ছবি সেখানে পাওয়া যাবে ব'লে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হয়তো তার দ্বারস্থ হবেন, সাধারণ পাঠক বড়ো একটা ঘেঁষবে না। এদিকে পাঁচশো কি হাজার বছর আগেকার লেখা কবিতা আজও একেবারে টাটকা, কারণ কবি যে-জগতে থাকেন তা সমসাময়িক হ'য়েও সমসাময়িকতার ঊর্ধ্বে। উপন্যাস যাঁরা পড়েন তাঁরা সমসাময়িক উপন্যাসই সব চেয়ে বেশি পড়েন, কারণ সমসাময়িক লেখকের সমাজদৃষ্টির সঙ্গেই চোখোচোখি হওয়া সহজ, অথচ সমসাময়িক কবি প্রায়ই অনাদৃত। গদ্য নগদ দাম আদায় করে, কারণ তার স্থায়িত্ব কম। পদ্য যে গদ্যের চাইতে অনেক বেশি স্থায়ী তাতে সন্দেহ নেই, আমাদের হাতের কাছে তার অসংখ্য প্রমাণ ছড়ানো। শেক্সপিয়রের নাটকগুলি গদ্যে লেখা হ'লে আজ কি কেউ তাদের পাতা ওল্টাতো ?

কিশোর বয়সে 'গোরা' উপন্যাসটি প্রথম যখন পড়ি মনে হয়েছিলো আমার সমস্ত জীবনের উপর দিয়ে প্রচণ্ড এক ঝড় ব'য়ে গেলো। মনে আছে, রাত্রে যখন শুতে যেতুম সারাদিনের পড়া ঘটনা ও কথাবার্তাগুলি অন্ধকারে মনের মধ্যে আলোড়িত হ'তে থাকতো—যেন শুনতে পেতুম ললিতার কথা, সুচরিতার কমনীয় কণ্ঠস্বর, যেন দেখতে পেতুম বৃষ্টি-ঝরা মধ্যরাত্রে সুচরিতা

বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে একলা দাঁড়িয়ে। সমস্ত বইটির মধ্যে যে ঐ দুটি তরুণীই আমার কিশোর চিত্তকে সব চেয়ে বেশি অধিকার করেছিলো সে-কথা বলাই বাহুল্য। সেই সময় থেকে 'গোরা'র কয়েকটি বিক্ষিপ্ত চিত্র মনের মধ্যে বহন ক'রে আসছি। তারপর, প্রায় কুড়ি বছর পরে, মাসতিনেক আগে আবার 'গোরা' পড়লুম এই সমালোচনা লিখবো ব'লে। এখন লিখতে ব'সে দেখছি, এ-তিনমাসে বইটির অধিকাংশই তুলেছি, ঠিক সেটুকু মনে দাগ কেটে আছে, প্রথমবার পড়বার পর যেটুকু স্মৃতিতে ছিলো। গোরার দীর্ঘ শুভ্র মূর্তি, তার বজ্র-দৃপ্ত কণ্ঠস্বর, মধ্যাহ্নরৌদ্রে নির্জন চরে দীর্ঘতর ছায়া ফেলে-ফেলে তার চ'লে যাওয়া, নদীবক্ষে অন্ধকার রাত্রে বিনয়-ললিতার প্রেমের উন্মীলন, আনন্দময়ীর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মূর্তি, সুচরিতার ছোটো ভাইটি, দুধ আর জলের তফাৎ নিয়ে হরিমোহিনীর বিখ্যাত মন্তব্য—তারপর, সমস্ত ঝড়-ঝাপটার পরে, শেষ পাতাটির স্বল্পবাক মধুর উজ্জ্বলতা—শুধু এই ক'টি রেখায় 'গোরা' বইটি আমার মনে আঁকা হ'য়ে আছে।

আমার মনে হয় বাংলা ভাষায় দুটি মহৎ উপন্যাস এখন পর্যন্ত লেখা হয়েছে: একটি 'গোরা', অন্যটি 'যোগাযোগ'। 'যোগাযোগ' শেষ হ'লে অতুলনীয় হ'তো, অসমাপ্ত অবস্থাতেও 'গোরা'র পাশেই তার স্থান। বরং, শিল্পরূপের সুষমায় ও ভাষার অনিন্দ্য সৌন্দর্যে 'যোগযোগ' 'গোরা'কে ছাড়িয়ে গেছে। 'গোরা' একটু এলোমেলো, গঠন একটু শিথিল, কিন্তু তার জিৎ তার অসাধারণ ব্যাপ্তিতে, ক্ষেত্রের প্রসারে, দ্বন্দ্ব ও চিন্তার বহুলতায়। বাংলা ভাষায় উপন্যাস ব'লে যা চলে তার বেশির ভাগই বড়ো ছোটো গল্প মাত্র, উপন্যাসের কাঠামোই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। অল্প চরিত্র নিয়ে ছোট একটি ঘটনা ফোটানো—বাঙালি লেখকরা বেশির ভাগই তা-ই করেন, তারও মূল্য আছে, তাতেও নৈপুণ্যের ক্ষেত্র অপরিমিত, কিন্তু এ-ধরনের রচনাকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না। উপন্যাস বলবো তাকে, যা চরিত্র ও ঘটনার বিরাট বিচিত্র মিছিল নিয়ে চলেছে জীবনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, যেখানে পাবো জীবনের সমগ্রতা। জীবনের এই দাবি মেটাতে গিয়েই পাশ্চাত্ত্য মহৎ উপন্যাসগুলি আকারেও বিরাট হয়, সে-দীর্ঘতা আমাদের চোখে প্রায়ই ভীতিকর ঠেকলেও শিল্পের তাগিদেই তা অনিবার্য। ছোটো

আকারে যথার্থ উপন্যাস লিখতে পেরেছেন পাশ্চাত্ত্য লেখকদের মধ্যে টুর্গেনিভ ছাড়া এমন কারো কথা মনে পড়ে না, এদিকে আমাদের প্রায় সব রচনাই ক্ষুদ্রকায়, কারণ জীবনের ভগ্নাংশ নিয়েই আমাদের কারবার, পরিপূর্ণ উন্মুক্ত জীবনের স্বাদ থেকেই তো আমরা বঞ্চিত। আমাদের জীবনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ ব'লেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, বাংলাদেশে উপন্যাস ঠিক যেন এখনো ফুটছে না। 'গোরা'তেই আমরা প্রথম দেখলুম উপন্যাসের প্রকৃত স্বরূপ, আর এর জুড়ি বই এখনো হয়নি। বিশেষ-একটি দেশের বিশেষ-একটি যুগের সম্পূর্ণ কাহিনী এ-বইটিতে রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়েছেন। উনিশ-শতক-শেষের বাংলাদেশকে জানতে হ'লে বার-বার 'গোরা'র পাতাই ওল্টাতে হবে। 'গল্পগুচ্ছে' তিনি দেখিয়েছেন বাংলার পল্লীজীবনের পটভূমিকায় মানুষের চিরন্তন আবেগগুলির লীলা—তার প্রেম, তার বাৎসল্য, তার লোভ, তার বিদ্বেষ, দেবত্ব আর পশুত্ব পাশাপাশি চলেছে দেশকালের বেড়া ডিঙিয়ে। 'গোরা' অন্য জাতের। 'গোরা' বিশেষভাবে সমসাময়িক। সাময়িক সমস্যা, বিচার-বিতর্কের মননশীলতা এখানে প্রধান। তাই এ-গল্প রবীন্দ্রনাথ ঘটিয়েছেন নগরবাসী উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, যাদের হৃদয়াবেগ অবাধে উচ্ছ্বসিত নয়, যারা বুদ্ধি দ্বারাই চালিত হ'তে চায় এবং তার ফলে অশেষ দুঃখ ভোগ করে। এটা লক্ষ্য করবার যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে 'গোরা'ই বোধ হয় একমাত্র, যার ঘটনাস্থল প্রায় আগাগোড়াই কলকাতা—কলকাতায় না-হ'লেই যার চলতো না। নানাবিধ রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আন্দোলনের রাজধানীই হ'লো কেন্দ্র, সেখানে মানুষ চিন্তা করে, নানা মতে, মতান্তরে, দ্বিধায় ও আত্ম-বিরোধে পীড়িত হয়, সেখানে মানুষ বুদ্ধিজীবী, তাই 'গোরা'র মতো উপন্যাস সেখানে ছাড়া ঘটতে পারতো না।

এর মানে এ-কথা বলা নয় যে 'গোরা' সমস্যাপ্রধান উপন্যাস। এখানে বিশেষ-কোনো 'সমস্যা'র উত্থাপন বা তার সমাধানের চেষ্টা নেই। চরিত্রগুলি সমস্যা-পূরণের শতরঞ্চ খেলার ঘুঁটি নয়, তারা রক্ত-মাংসের মানুষ। বক্তৃতা আছে অনেক, কিন্তু তার মধ্যে কোনটা যে লেখকের নিজের বক্তৃতা তা চট ক'রে ঠাহর হয় না, তাঁর নিজের বক্তব্যটা যে কী তা স্পষ্ট কথায় যত না

বলেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি বলেছেন আভাসে ইঙ্গিতে। আসলে রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' লিখতে ব'সে প্রচারকার্যে নামেননি, একটি শিল্পকর্ম সম্পাদন করতেই চেয়েছিলেন, এবং সেই শিল্পকর্মের মধ্যে বাংলাদেশের সে-সময়কার ইতিহাস বুনে দিয়েছেন অপূর্ব কৌশলে। এমন নয় যে বইয়ের গল্পাংশ লেখকের চিন্তাধারা বহন করবার উপলক্ষ্য মাত্র। তা যদি হ'তো তাহ'লে আজকের দিনে ও-বইয়ে কোনো রস পাওয়া সম্ভব হ'তো না। কারণ হিন্দু-ব্রাহ্ম-বিতর্ক আজকের দিনে প্রায় অর্থহীন, হারানবাবুর সঙ্গে গোরা কিংবা তার সুযোগ্য প্রতিনিধি বিনয়বাবুর যে-বিতর্ক এমন আশ্চর্য উজ্জ্বল তাও যেন আজ ফ্যাকাশে হ'য়ে এসেছে, জায়গায়-জায়গায় মনে হয় এতটা দরকার ছিলো না, অকারণে গল্পস্রোতে বাধা পড়ছে। এখন 'গোরা' প'ড়ে এটাই বুঝলাম যে সমসাময়িক সমস্যার আলোচনা, তা যতই না মনোহররূপে উপস্থিত করা হোক, একদিন তার ধার ক্ষ'য়েই আসে, যেটা টিঁকে থাকে সেটা গল্পাংশই। 'গোরা'য় পাশাপাশি যে-দুটি প্রণয়স্রোত নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়ে ব'য়ে চলেছে, আমি বলবোই যে বইয়ের ওখানেই প্রাণ। হিন্দু-ব্রাহ্ম, ইংরেজ-ভারতীয় সংক্রান্ত যা-কিছু বিতর্ক তিনি এনেছেন, কিছুই আলগা হ'য়ে ভেসে নেই, সমস্ত বইয়ের মধ্যে মিশে আছে, ঐ দুটি প্রণয়কাহিনীর ক্রমবিকাশে তাদের প্রভাব পদে-পদেই ধরা পড়ে। এ-ক্রমবিকাশ নায়ক-নায়িকার আন্তরিক দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব দ্বারাও সাধিত হ'তে পারতো, কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে 'গোরা' স্বদেশি যুগের ভরা-মৌশুমের সময়ে লেখা, এমনকি গোরা চরিত্রের ভিত্তি সম্ভবত সে-যুগের একজন বিখ্যাত দেশনায়ক। এ-দিক থেকে 'গোরা'তে লক্ষ্য করবার এইটুকু যে স্বাদেশিকতার কি ধর্মের উন্মাদনাও রবীন্দ্রনাথের সত্য-দৃষ্টিকে আবিল করেনি। সনাতনী হিন্দুয়ানি, এবং একই রকম সংকীর্ণ গোঁড়া ব্রাহ্ময়ানা—এ দুই মিথ্যাকে তিনি মূর্ত করলেন গোরা ও হারানবাবুর চরিত্রে। অথচ গল্পের আরম্ভেই গোরার জন্ম-ইতিহাস তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা বুঝেছি যে গোরার জীবন আগাগোড়াই একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা, এবং তার ফলে যদিও গোরার পরবর্তী কার্যকলাপ আমাদের কাছে অবাস্তব ঠেকে না, তার গুরুগাম্ভীর্যও কোনোখানে লাঘব হয় না, তবু ফাঁকে-ফাঁকে যখনই মনে পড়ে যে গোরা শ্বেতাঙ্গপুত্র, তখনই

যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে, তার অসহ্য গোঁড়ামি তেমন অসহ্য আর ঠেকে না। গোরাকে ক্ষমা করবার যে-সুযোগ লেখক আমাদের দিয়েছেন, হারানবাবুর ক্ষেত্রে সে-রকম কিছুই দেননি, ঐ আত্মম্ভরী অতি গম্ভীর উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিটির প্রতি পাঠকের ভুলক্রমেও কখনো সহানুভূতি জাগে না। বস্তুত, এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে গোরার প্রতি তিনি আগাগোড়াই অনুকম্পায়ী, হারানবাবুকে তাঁর নিজেরই অপছন্দ, তাঁকে আগাগোড়া তীব্র বিদ্রূপই ক'রে গেছেন। গোরা যা বলছে তা সত্যের আংশিক কিংবা বিকৃত রূপ, হারানবাবুর কথাও তা-ই, কিন্তু লেখকের আন্তরিক অনুকম্পার এমনই প্রভাব যে কেবল সুচরিতা নয়, স্বয়ং পাঠকও যেন গোরার কথা বিশ্বাস করবার দিকেই ঝোঁকে। কিন্তু গোরার কথা শুধু নয়, তার সমস্ত জীবনই যে কত বড়ো ভ্রান্তি শেষ পর্যন্ত সে তো নিজেও তা উপলব্ধি করলো।

দুই পক্ষের এই প্রতিতুলনা আরো আছে। আছে অবিনাশ, হিন্দু নায়কের নির্বোধ অনুচর; অন্যপক্ষে সুধীর, যুবতীবহুল অগ্রসর বাড়ির অনিবার্য নিরুপদ্রব উপসর্গ। আছেন একদিকে বরদাসুন্দরী, 'আলোকপ্রাপ্ত' গৃহের মেয়ের-মা সে-যুগে ঠিক যেমনটি হতেন (এ-যুগেও ইনি একেবারেই বিরল কি?) অন্যদিকে মহিম, মোটাসোটা ঢিলেঢোলা খাঁটি বাঙালি হিন্দু গৃহস্থ, পান-চিবোনোয় কামাই নেই, দেবদ্বিজে যেমন ভক্তি, তেমনি ভক্তি শ্বেতাঙ্গ-প্রভুতে, ঐহিক ও পারলৌকিক দেবতাদের সর্বপ্রকারে তুষ্ট ক'রে নির্বিঘ্নে জীবনটা কাটিয়ে দেয়া ছাড়া বেঁচে থাকার আর-কোনো উদ্দেশ্য যাঁর নেই। আর সবার শেষে—কিংবা সবার উপরে—আছেন পরেশবাবু আর আনন্দময়ী। একজন সে-যুগের ইংরেজিশিক্ষিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম—ধীর, স্থির, যুক্তিনির্ভর সত্যানুসন্ধানী, ঈশ্বর-ভক্ত, আর-একজন—কিন্তু আনন্দময়ীর কি কোনো বর্ণনা আছে? তিনি হিন্দু ব্রাহ্ম মুসলমান খৃষ্টান কিছুই নন—তিনি আনন্দময়ী। তাঁকে ভালো বললে কিছু বলা হয় না, সৎ বললে ঠাট্টা শোনায়, সমস্ত ভালো-মন্দের উপরে কোন এক সত্যকে তিনি যেন লাভ করেছেন, এখন আর তাঁর কোনো ভাবনা নেই। গোরা যেদিন তাঁর কোলে এলো সেদিনই ঈশ্বর নিজের হাতে তাঁর জাত নষ্ট করলেন, সমস্ত সংস্কার দিলেন ভেঙে; যা-কিছু নিয়ে

সামাজিক মানুষ জীবন কাটায় সে-সমস্ত খুইয়ে তিনি একেবারেই ফতুর হলেন—কী আশ্চর্য সেই মুক্তি। অথচ তাই ব'লে তিনি একটা প্রতীক মাত্র নন, তিনি জীবন্ত, তিনি বাস্তব, তাঁর কথা আমাদের কানে বাজে, তাঁর মুখ চোখে ভাসে। এত ধৈর্য, এত ক্ষমা, এত স্নেহ, তবু তো কখনো মনে হয় না যে তিনি 'বানানো', তাঁর কোনো কথায়, কোনো ভঙ্গিতে তিলমাত্র অবিশ্বাস হয় না। তিনি 'শিক্ষিতা' নন, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমতী, কিন্তু বুদ্ধির চেয়েও তাঁর মধ্যে বোধি বড়ো, তিনি চিন্তা করেন কম, অনুভব করেন বেশি, যুক্তিতর্কের জটিল জাল ফেলে সত্যকে ধরবার চেষ্টা তাঁর নয়, আপন অন্তরেই সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেন। তাঁর মধ্যে এই যে মাধুর্য, তা রবীন্দ্র-সত্তারই নির্যাস, অন্য সকলের কথাই—এমনকি পরেশবাবুর কথাও—তর্কদ্বারা বিচার্য, কিন্তু আনন্দময়ীর কথা ঠিক রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা, তাঁর কণ্ঠে যেন রবীন্দ্রনাথেরই কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাই। তর্কের রুক্ষ মরুভূমিতে তাঁর এক-একটি কথা যেন অমৃতের মতো ঝ'রে পড়ে, মাথা নিচু ক'রে মেনে নিয়ে ধন্য হই।

গোর্কীর ছোটো গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে অল্ডস হক্সলি বলেছেন যে রসসাহিত্যে 'ভালো' চরিত্র আঁকা খুবই কঠিন কাজ। হক্সলি নিজে একটিও সজ্জন এঁকে উঠতে পারেন নি, তাঁর এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই এ-কথা বলার কারণ নয়—বিশ্বসাহিত্যে ঘেঁটে তিনি দেখিয়েছেন যে এ-কাজ কেউই প্রায় পারেননি। শেক্সপিয়রে 'Measure for Measure'-এর ডিউক ছাড়া একটিও সক্রিয়রূপে ভালো লোক নেই; অন্যান্য লেখকদের রচনায় যত ভালো লোকের দেখা পাই তারা হয় ডস্টয়এভস্কির প্রিন্স মিশকিনের মতো মৃগীরোগী, নয় পিকউইক কি টোবি খুড়োর মতো 'কমিক' চরিত্র। কোনো-না-কোনো খুঁত সকলের মধ্যেই আছে। হয় তারা ব্যাধিগ্রস্ত, নয় মূঢ়, নয় 'ছেলেমানুষ'। একাধারে সাবালোক ও ভালো, একাধারে বুদ্ধিমান ও ভালো কেউই নয়, ভালো হ'তে গিয়ে তারা প্রায়ই কোনো-না-কোনো দিক থেকে হাস্যকর। হক্সলি গোর্কীকে খুব তারিফ করেছেন এই ব'লে যে গোর্কী তাঁর নানা গল্পে এমন চরিত্র আঁকতে পেরেছেন যে ভালো অথচ হাস্যকর নয়, সে শ্রদ্ধেয় ও সেই সঙ্গে সরস।

কবিতা

কার্তিক, ১৩৪৮

হক্সলির কথাটা বাড়াবাড়ি শোনালেও ভেবে দেখতে গেলে মিথ্যে নয়। বিশ্বসাহিত্যের প্রসিদ্ধ চরিত্রগুলি লোক কেউই ভালো নয়—হ্যামলেট, ক্লিওপ্যাট্রা, ফাউস্ট, আনা কারেনিনা সকলেই গুরুতর নৈতিক স্খলনে অপরাধী। এর কারণ বোঝাও শক্ত নয়, দোষে দুর্বলতাতেই চরিত্র জীবন্ত হয়, অতি ধার্মিক, অত্যন্ত ভালো লোকের সাহিত্যে নীরস হবার আশঙ্কা খুবই বেশি, যেমন দেখি অর্জুন যুধিষ্ঠিরের চেয়ে শতগুণে উজ্জ্বল। যার কোনো খুঁত নেই তাকে যেন অমানুষ মনে হয়। কিন্তু আমাদের দেশেই রামচন্দ্রের মহান চরিত্র সৃষ্টি হ'য়ে গেছে, যিনি সর্বাঙ্গসুন্দর অথচ যুগ-যুগ ধ'রে জীবন্ত। আধুনিক সাহিত্যে মনে পড়ে ব্রাদার্স কারামাজফে ফাদার জসিমার কথা, মনে পড়ে আলিয়শাকে, যে যথার্থই সাধুপুরুষ ও সেই সঙ্গে টুশটুশে সরস তরুণ। কিন্তু ডস্টয়এভস্কিতে কি গোর্কীতে আমরা ভালো চরিত্রের যে-সব উদাহরণ পেতে পারি, তার চেয়েও কত বেশি ভালো আনন্দময়ী, কত বেশি উজ্জ্বল, তিনি যেন একটি শরীরিণী আভা, যেখানে পা ফেলেন সেখানেই আলো হ'য়ে ওঠে। পরেশবাবু যেন অত বেশি ভালো হ'তে গিয়েই একটু অস্পষ্ট হয়েছেন, তাঁর মধ্যে মানুষের সাধারণ বৃত্তিগুলি প্রবলতর হ'লে তাঁর চরিত্র আরো উজ্জ্বল হ'তো ব'লে মনে হয়। কিন্তু আনন্দময়ীর ভালোত্ব যেমন অসীম, তেমনি অবিস্মরণীয় তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ। বিশ্বসাহিত্যে এ-রকম চরিত্র সত্যই বিরল, এবং বিশ্বসাহিত্যসভায় আনন্দময়ী আমাদের অমূল্য উপহার।

'গোরা' পড়তে-পড়তে অনেকদূর পর্যন্ত মনে হ'তে পারে যে হিন্দু-ব্রাহ্মর এই বিরোধে রবীন্দ্রনাথ পদে-পদে হিন্দুদেরই জিতিয়ে দিচ্ছেন। পরেশবাবুর উদাহরণ সত্ত্বেও হিন্দুদের দিকের পাল্লা ভারি—আনন্দময়ী একাই একশো। কিন্তু একটু সবুর করুন, হরিমোহিনীকে আসতে দিন। এই খাস হিন্দু বিধবাটির চরিত্র বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। প্রথম যখন তিনি পরেশ-বাবুর বাড়ি এলেন, আমাদের সকলের মনই তাঁর দিকে ঝুঁকলো, এবং বরদাসুন্দরীর তাঁর প্রতি অবহেলায় বেশ উষ্মা বোধ করলুম। ক্রমে যখন তাঁর স্বমূর্তি প্রকাশ পেতে লাগলো, এমনকি তিনি যখন সুচরিতাকে রামদীন বেহারার হাতে জল খেতে বারণ করলেন, কেননা দুধ আর জল এক নয়,

আর সেই সঙ্গে এও বললেন যে 'সতীশের কথা আলাদা' * তখনও তাঁকে অজ্ঞান গ্রাম্যরমণী ভেবে আমরা ক্ষমা করলুম। কিন্তু পরেশবাবু যখন তাঁকে সুচরিতার সঙ্গে আলাদা বাড়িতে রাখলেন, তখন তাঁর মধ্যে যে-হীনতা যে-ধূর্ততা প্রকাশ পেলো তাতে হিন্দুসমাজেরই একটা গলিত কুৎসিত মূর্তি আমরা দেখলুম। ঐ বাড়িটি আর কোম্পানির কাগজ ক'টি সমেত সুচরিতাকে তাঁর নিজের 'শ্বাশুরিক দুর্গে' আবদ্ধ করার চক্রান্তে তাঁর চাতুর্যের অভাব দেখা গেলো না, এমনকি শেষ পর্যন্ত গোরাকে দিয়ে লিখিয়ে পর্যন্ত নিলেন যে 'বিবাহই নারীজীবনে সাধনার পথ···এই বিবাহ ইচ্ছাপূরণের জন্য নহে, কল্যাণ সাধনের জন্য।' গল্পের এই পর্বটুকু—যা মূল কাহিনীর একটি ক্ষীণ উপশাখা মাত্র—স্বল্প পরিসরের মধ্যে লেখক এমনভাবে ফুটিয়েছেন যাতে তাঁর নিখুঁত বাস্তবনিষ্ঠা ও সাধারণ সাংসারিক চরিত্র সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টিই ধরা পড়ে, এটুকু পড়লেই বোঝা যায় শরৎচন্দ্র কোন গুরুর কাছে পাঠ নিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের রচনায় যে-'জীবনসদৃশতা' আমাদের মুগ্ধ করেছে, তা রবীন্দ্রনাথের গল্পে উপন্যাসে এখানে-ওখানে কত ছড়িয়ে আছে তার অন্ত নেই, কিন্তু সেটি তাঁর রচনায় প্রধান হ'য়ে ওঠেনি, কারণ জীবনসদৃশ হবার চাইতে বড়ো বিদ্যা তাঁর জানা ছিলো, সে-বিদ্যা জীবনব্যঞ্জনার। হরিমোহিনীর দেবর কৈলাস যেদিন 'গায়ে তসরের চায়না কোট, কোমরে একটা

---

* এই অপূর্ব অংশটুকু উদ্ধৃত করবার লোভ সামলানো গেল না :

হরিমোহিনী কহিলেন, "একটা কথা বলি বাছা, যা কর তা কর, তোমাদের ঐ বেহারাটার হাতে জল খেয়ো না।"

সুচরিতা কহিল, "কেন মাসি, ঐ রামদীন বেহারাই তো তার নিজের গোরু দুইয়ে তোমাকে দুধ দিয়ে যায়।"

হরিমোহিনী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "অবাক করলি! দুধ আর জল এক হল!"

সুচরিতা হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা মাসি, রামদীনের ছোঁয়া জল আজ (আর?) আমি খাব না। কিন্তু সতীশকে যদি তুমি বারণ কর সে ঠিক তার উলটো কাজটি করবে।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "সতীশের কথা আলাদা।"

(র.-র. ৬, পৃঃ ৩৭৮)

চাদর জড়ানো, হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ'—'স্বয়ং কৈলাস' যেদিন আমাদের চোখের সামনে দেখা দিলো সেদিনই আমরা বুঝলুম ইনি বড়ো সোজা লোক নন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বৌঠানের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সে যখন বললে, 'না, না, সে হচ্ছে না। ছাত যে একেবারে জখম হ'য়ে যাবে। তা বলছি, বউঠাকরুন, এ-ঘরে তোমার জল-ঢালাঢালি চলবে না,' তখন আমরা একেবারে তাজ্জব ব'নে গেলুম নিজের ভবিষ্যৎ-সম্পত্তি সম্বন্ধে কৈলাসের অতিদূরদর্শী সতর্কতায়, এবং মনে-মনে লেখককে সহস্র সাধুবাদ দিলুম তাঁর পর্যবেক্ষণের বাস্তবনিষ্ঠায়। এত বড়ো বইয়ে কৈলাস ক'মিনিটের জন্যই বা দেখা দেয়, তার যেটুকু করবার বা অতি সামান্যই, কিন্তু এটুকুর মধ্যেই মনে একটি স্পষ্ট ছবি সে এঁকে রেখে যায়। যাঁরা বলেন রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলি 'অবাস্তব' অর্থাৎ ঠিক জীবনে আমরা যেমন দেখি তেমন নয় তাঁদের এই ক্ষুদ্র রেখাচিত্রগুলি লক্ষ্য করতে বলি, আর সেই সঙ্গে এ-ও বলি যে যাঁরা মনে করেন যে কৈলাস মহিম বরদাসুন্দরীই সত্য, গোরা সুচরিতা ললিতা অবশ্যই মিথ্যে তাঁদের সঙ্গে মতান্তর ছাড়া অন্য পথ নেই।

বস্তুত, 'গোরা'র কোনো চরিত্রকেই রবীন্দ্রনাথ অস্পষ্ট ভাবমণ্ডলে রাখেননি, তারা কোনো আদর্শের প্রতিভূমাত্র নয়, তারা মানুষ। হারানবাবু, মহিম, বরদাসুন্দরী, হরিমোহিনী, কৈলাস—এই অপ্রধান চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ-বিশেষ ভাবে ও ভঙ্গিতে তারা প্রত্যেকেই উজ্জ্বল। হারানবাবু, যাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে 'সত্যের জয় হইবেই, অর্থাৎ হারানবাবুর জয় হইবেই', তাঁকে কি আমরা ভুলতে পারি! আর কন্যাদায়গ্রস্ত বেচারা মহিম, কন্যাদের গুণরাশি প্রকাশ করতে অতিশয় ব্যস্ত বরদাসুন্দরী—এঁরা এঁদের সমস্ত দুর্বলতা, সমস্ত অসঙ্গতি নিয়ে ঠিক পুরোপুরি মানুষটি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে শুধু বিনয়—যে বইয়ের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে, বলতে গেলে যে অন্যতম 'নায়ক'—সেই যেন ভালো ক'রে চোখেই পড়ে না। সে নেহাৎই সাধারণ বাঙালি ভদ্রলোক, নিতান্তই ভালোমানুষ, তার উপর সে তার বন্ধু গৌরমোহনের ছায়া ও প্রতিধ্বনি, গল্পবিন্যাসের তাগিদেই তার প্রয়োজন, তাছাড়া কোনো স্বতন্ত্র সত্তা যেন তার নেই-ই। অতি ভালোমানুষ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে চরিত্র থেকে

বঞ্চিত করেছেন, রসসাহিত্যে ভালোর চেয়ে যে মন্দই ভালো হক্সলির এ-কথার এখানে একটা প্রমাণ মিললো। কিন্তু আমি বলতে চাই রবীন্দ্রনাথ বিনয়কে ঠিক এই রকমই ভেবেছিলেন, তিনি তাকে যা করতে চেয়েছিলেন সে তা-ই হয়েছে। বিনয়কে আঁকতে গিয়ে তিনি অকৃতী হননি, এত কিছু ক'রে ও ব'লেও সে যে সে-রকম কোনো ছাপ মনে রাখে না সেখানেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। ঘটনাপ্রবাহকে প্রায় শেষ পর্যন্ত চালিয়ে এনে ললিতার সঙ্গে বিবাহের পরে সে যথোচিতভাবেই স'রে পড়লো, বইয়ের শেষাংশে তার অনুপস্থিতি পাঠকের মনে কোনো অভাববোধও জাগায় না। রবীন্দ্রনাথ এ-ই চেয়েছিলেন, কিন্তু পরেশবাবুর ক্ষেত্রে তিনি ঠিক যা চেয়েছিলেন তা হয়েছে কিনা জোর ক'রে বলা যায় না। পরেশবাবু উদার ও সাধুপুরুষ, অথচ সাংসারিক সুবুদ্ধি থেকেও বঞ্চিত নন, বিনয়-ললিতার বিবাহ কী-মতে হবে, সে-অনুষ্ঠানে শালগ্রামশিলা থাকবে কি থাকবে না এ-সব সমস্যা নিয়েও তিনি বিব্রত—মোটের উপর তিনি যেন ঠিক ফুটে উঠতে পারেননি। বিশেষ ক'রে, আনন্দময়ীর চরিত্রে যে-মুক্তি, যে-আনন্দ আমরা পাই বোধ হয় তারই পাশে পরেশবাবুকে একটু ফ্যাকাশে ঠেকে।

স্বয়ং গৌরমোহন নব্য হিন্দুধর্মের একটি খুদে অবতারমাত্র নয়, তারও হৃদয় আছে, সেখানে আঘাত লাগে, নানা দ্বন্দ্বে সে-ও উদ্‌ভ্রান্ত। তাকে রবীন্দ্রনাথ শ্বেতাঙ্গতনয় করেছেন শুধু কি গল্প জমাবার নজে? না কি তাঁর মনে এ-কথাও ছিলো যে এই দৃঢ়তা, এই আত্মনির্ভর নির্ভয় শক্তি বাঙালি চরিত্রে সম্ভব নয়, খাস বাঙালি দেখতে চাও তো মহিমকে ছাখো। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন তাঁর এই বাংলাদেশকে, কিন্তু স্বার্থপর, কর্মবিমুখ, ঈর্ষাকাতর ও আত্মবিভক্ত বাঙালিচরিত্রের 'পরে বিদ্রূপ ও রোষবর্ষণেও অক্লান্ত ছিলেন তিনি। সে যা-ই হোক, মতে না-মিললেও গোরাকে শ্রদ্ধা না-ক'রে, ভালো না-বেসে উপায় নেই। শুধু একটু খটকা লাগে যখন সে গ্রামে গিয়ে নিচু জাতের ছোঁয়া জল খেলো না, তার ব্রাহ্মণ্য গর্বকে তখন চুরমার ক'রে দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এও দেখতে পাই যে এ-গর্ব তার নিজের ভিতর থেকেই ভেঙে আসছে, তবু জোর ক'রে সেটা সে টিঁকিয়ে রাখতে চাইছে ব'লেই তার মধ্যে এই অহেতুক ঔদ্ধত্য, নিষ্ঠার এই অস্তিক আতিশয্য। এটা

তার নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া, এটা তার জেদ—তা ছাড়া কিছু না। সত্য নয় এটা। গোরা অন্ধ নয়, মুচিপাড়ার ছেলেটা যেদিন চিকিৎসার অভাবে মারা গেলো সেদিন নিজের বিশ্বাসেই সে প্রবল ঘা খেয়েছিলো, দ্বন্দ্ব ছিলো তার মনে আগাগোড়া, কিন্তু সংশয়কে দুর্বলতা ব'লে টুঁটি চেপে মারতে চেয়েছিলো। তাই তার এই অপ্রীতিকর ব্রাহ্মণ্যদম্ভ। কিন্তু পারলে না, হার হ'লো তার। সত্য জয়ী হ'লো।

আর ঐ দুটি তরুণী, আমার কিশোরকালের লীলাসঙ্গিনী? দু'জনেই মধুর, কিন্তু দুজনকে পৃথক করে আঁকা হয়েছে সূক্ষ্ম রেখায়। ললিতা চঞ্চল, উচ্ছল, সে হঠাৎ ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে বেফাঁস কথা ব'লে ফেলে, সে এতদূর অবিবেচক যে অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে একা স্টীমারে চ'লে এলো, কলোচ্ছ্বাসিত ঝরনার মতো সে। আর সুচরিতা শান্ত, স্থির, মুখে কথা কম, দেহে ভঙ্গি কম, শুধু বড়ো-বড়ো কালো চোখের গভীর দৃষ্টিতে সে প্রকাশিত, সে কবি-কিশোরের মানসী মূর্তি। রবীন্দ্রনাথের অনেক নায়িকাই সুচরিতার ছাঁচে গড়া, কুমু লাবণ্য দু'জনেই তার নিকট আত্মীয়। তারই ছায়া আমরা দেখি শরৎচন্দ্রের নানা নায়িকায়। আর এই চারটি তরুণ-তরুণীর প্রণয়-লীলার অস্পষ্ট অব্যক্ত মাধুর্য পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ে চিরতরে চিহ্নিত হ'য়ে থাকবে, কারণ যদিও রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবন দুর্বল (তাঁর গল্পে যান-বাহনসংক্রান্ত দুর্ঘটনার পৌনঃপুনিকতা অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন) এবং প্রেমের চরম পরিণতির বর্ণনায় তিনি লাজুক, তবু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে প্রেমের প্রথম উন্মীলনের ছবি আঁকায় তার তুলনা নেই। তাঁর গল্পে উপন্যাসে—এবং 'চিত্রাঙ্গদা' কি 'পতিতা'র মতো কোনো-কোনো কবিতায়—এ আমি বারে-বারেই দেখেছি যে যৌবনের সরোবরে প্রেমের পদ্মটি প্রথম যখন ফুটে উঠতে চায়, তার বর্ণ তার সৌরভ তার উষ্ণ মদির নিঃশ্বাস আদিম গৌরব থেকে কিছুমাত্র ভ্রষ্ট না-ক'রে রবীন্দ্রনাথ এমন সম্পূর্ণরূপে ভাষায় ফোটাতে পারেন যে সে-বিদ্যা জাদুবিদ্যা মনে হয়। এ-প্রসঙ্গে বহু ছোটো গল্প, 'চোখের বালি' 'শেষের কবিতা' 'দুই বোনে'র অনেক অংশই স্মরণীয়। এখানে গোরা সুচরিতা বিনয় ললিতার মনে কত না আলোড়ন আন্দোলন, কত দুঃখ, আর দুঃখের সে কী মধুরতা। গোরা যেদিন প্রথম জানলো যে পৃথিবীটা শুধু পুরুষমানুষের নয়,

সে কী অন্ধান্তকারী চক্ষুরুন্মীলন। আর স্টীমারে বিনয় ললিতার সেই অবিস্মরণীয় রাত্রিটুকু, সুচরিতার নির্জন তপস্যা, গোরার আকস্মিক উন্মাদনা—যেদিন সে হঠাৎ বুঝলো যে সুচরিতাকে চোখে দেখতে না-পেলে তার 'বিস্বাদ, সমস্তই বিস্বাদ'—এই সমস্ত মিলিয়ে, জড়িয়ে, ফুটিয়ে যে-ব্যথাভরা আবেশ, যে-আনন্দিত বেদনা পাঠকে হৃৎপিণ্ডকে ক্ষণে-ক্ষণে দোলা দিতে থাকে, টুর্গেনিভের কোনো-কোনো অংশ ছাড়া এর কোনো তুলনা আমার অন্তত জানা নেই।

যদিও 'গোরা'র বিতর্কগুলির কোনো-কোনো অংশ আজকাল নীরস ঠেকে, তবু সব মিলিয়ে এ-গ্রন্থে যে-বাণী রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে দিয়েছেন তা আজও অম্লান, বরং আজকের দিনেই তার প্রয়োগ যেন অধিক সার্থক। গোরা যে-ভারতবর্ষের ধ্যান করে তা হিন্দু ভারতবর্ষ, তার এ-খণ্ডসাধনার ব্যর্থতা যে অনিবার্য, রবীন্দ্রনাথ তা জানেন। তাকে পূর্ণ হ'তে হবে, মুক্ত হ'তে হবে, তবে সে পাবে তার সাধনার ফল। কিন্তু তা হবে কেমন ক'রে? তার পূর্ণতা সুচরিতায়, তার মুক্তি তার যবনজন্মে। এটা দেখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমে কোনো মোহ ছিলো না, সেণ্টিমেণ্টালিটি ছিলো না। গোরাকে তিনি নিয়ে গেছেন গ্রামে, 'ভীত, অসহায়, আত্মহিতবিচারে অক্ষম' দেশবাসীর মধ্যে। মনোহর নয় সে-গ্রাম, লোকগুলি হীন, নির্বোধ, নানা কুসংস্কারে শৃঙ্খলিত। গোরার চমক লাগলো। সে ভেবে দেখলো যে এরই মধ্যে মুসলমানরা একটু স্বতন্ত্র, তাদের ঐক্য আছে, বিশ্বাস আছে, তারা সকলে মিলে এমন একটি জিনিস গ্রহণ করেছে যা '"না"-মাত্র নহে, যাহা "হাঁ", ঋণাত্মক নহে, ধনাত্মক।' * গোরার নিজের মধ্যে নানা বিরোধ দেখা

---

* 'গোরা'তে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে (এ-প্রশ্ন তখনও ওঠেনি) একটি কথা আছে আজকের দিনে যার প্রয়োগ অতি গভীর। হিন্দুর অন্ধ রক্ষণশীলতার ফলে, ধর্মের চাইতে আচারকে বড়ো করার ফলে হিন্দুসমাজ ভেঙে যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তা দেখতে পেয়েছিলেন। পরেশবাবু বলছেন:

"এ-সমাজ সমস্ত মানুষের সমাজ নয়—দৈববশে যারা হিন্দু হয়ে জন্মাবে, এ-সমাজ কেবল-মাত্র তাদের।"

সুচরিতা কহিল, "সব সমাজই তো তাই।"

দিলো, তার সন্দেহ হতে লাগলো তার এতদিনের সমস্ত কার্যকলাপ সবই বুঝি বৃথা, বুঝি সে গোড়াতেই ভুল করেছে। এইরকম মনের অবস্থায় কোনো একটা-কিছু আঁকড়ে ধরবার অবোধ আবেগে সে জোর-করা উৎসাহে নিজের প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করছে, অথচ তাতে অন্তরের সায় কিছুতেই পাচ্ছে না, এমন সময় কৃষ্ণদয়াল হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন, বুঝি ম'রে যাবেন এই ভয়ে গোরাকে ডাকিয়ে এনে সব কথা তাকে বললেন। কৃষ্ণদয়াল মরলেন না, কিন্তু গোরার মুক্তি হ'লো। নিজের জন্ম-ইতিহাস শুনে গোরার পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যেতে পারতো, কিন্তু তা হ'লো না, বরং 'কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই ইহা স্মরণ করিয়া সে আরাম পাইল।' সেই ফোঁটাতিলক কাটা অবস্থাতেই সোজা সে চ'লে গেলো পরেশবাবুর বাড়ি, গিয়ে বললে, 'পরেশবাবু, আমার কোনো বন্ধন নেই।' এর পরে আর যে-সব সে কথা সে বললে তাতে বোঝা গেলো যে তার সমস্ত প্রাণমন এই মুক্তিই কামনা করছিলো, কিন্তু নিজের গড়া নানা বিধি-বিধানে বন্দী সে, মনে-মনে ছটফট করলেও বেরোবার পথ ছিলো না।* যে-মুক্তি নিজের হাতে অর্জন করতে কখনোই হয়তো সে পারতো না, সমস্ত জীবন বলি দিতো হিন্দুয়ানির যূপে, সে-মুক্তি তাকে দিয়ে গেলো কৃষ্ণদয়ালের মুখের একটি কথা, তার জন্ম, তার ভাগ্য। 'আমি হিন্দু নই, উদার অদ্ভুত আনন্দে সে কথাটি উচ্চারণ করলে। 'আমি আজ ভারতবর্ষীয়।' আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।' পরেশকে সে বললে, 'আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনা দিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর

---

* পরেশ কহিলেন, "না, কোনো বড়ো সমাজই তা নয়।......অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে জানত বেরোতে জানত না—হিন্দু ঠিক তার উল্‌টো। তার সমাজে প্রবেশ করবার পথ একেবারে বন্ধ, বেরবার পথ শতসহস্র।......সেইজন্য কিছুকাল থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে—এ-রকমভাবে চললে ক্রমে এ-দেশ মুসলমান প্রধান হ'য়ে উঠবে—তখন একে হিন্দুস্থান বলাই অন্যায় হবে। (র.-র. ৬, পৃঃ ৫১৮)।

দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।' 'গোরা'র শেষ পরিচ্ছেদে রোমাঞ্চিত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথকেই আমরা দেখলুম, দেখলুম যে তিনি হিন্দু কি মুসলমান, ব্রাহ্ম কি খৃস্টান নন, মানবধর্মই তাঁর একমাত্র ধর্ম, আর সেই মানবধর্মকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন ইতিহাসের বিচিত্র চিত্রপটে অঙ্কিত তাঁর মানসলোকে, তাঁর সাধনালব্ধ ভারতবর্ষে।

গোরা মুক্তি পেলো, পেলো সে পূর্ণতা সুচরিতার মধ্যে। তবু একটু বাকি ছিলো। সেটুকু ভ'রে উঠলো যখন সে আনন্দময়ীর পায়ে মাথা রেখে বললে, 'তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।' তারপর বললো, 'মা এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাকো। তাকে বলো আমাকে জল এনে দিতে।' আর আনন্দময়ী বললেন—কিন্তু এই শেষের লাইন ক'টি প'ড়ে ওঠা অনুভূতিশীল পাঠকের পক্ষে বড়োই শক্ত, কারণ এই সময়টায় বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়তে থাকে আর বার-বার চোখ ঝাপসা হ'য়ে আসে জলে। এই এই সুন্দর অশ্রুজলের মধ্যে মুখর সমালোচক আজ চুপ করুক।

বুদ্ধদেব বসু

* রবীন্দ্র রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ডের অন্যান্য গ্রন্থের ও ৭ম খণ্ডের সমালোচনা 'কবিতা'র পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।—সম্পাদক
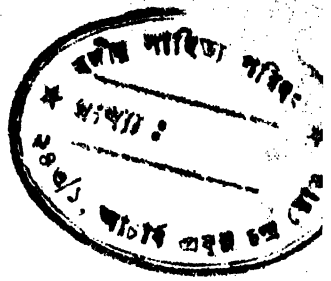
জয়েস্ প্রাসঙ্গিক

অমিয় চক্রবর্ত্তী

প্যারিস। কুয়াষাচ্ছন্ন অপরাহ্ন; রাস্তায় আলো জ্বলচে। য়ুরোপ ছাড়বার সময় হয়ে এল। সীরিয়া হয়ে দেশে ফেরবার উদ্যোগ করচি, বেশির ভাগ দিনটা তাই কাটল বিভিন্ন টুরিস্ট আপিসে। হঠাৎ মনে হল যাই জয়েস্-এর কাছে; শেষ ফরাসী সন্ধ্যাটা ভ'রে তুলি। সেদিন দেখা হয়েছিল এক সম্মেলনে, আসতে বলেছিলেন।

জেম্স্ জয়েস্-এর লেখা কখনো ঠিকমতো পড়িনি, এখনো আমার অসাধ্য। শব্দসমুদ্রে এক ডুব দিয়ে চলে আসি, তাও নানারকম শ্যাওলা এবং অদ্ভুত জীব গায়ে লেগে থাকে। অস্বস্তি বোধ হয়। অভিজ্ঞতার গভীরতাও চোখে মনে ঝলকে দেয়, ভোলা যায় না। কত রং, কত গতি, জলের নীচে ভাঙাচোরা টলমল দৃশ্য। নোনা জলে চোখ জ্বালা না করলে আরো দেখা যেত—এই বাক্-সমুদ্রে বেশিক্ষণ থাকতে ডুবুরির বিশেষ কৌশল-সরঞ্জাম চাই। অথচ এও জানি যে আমাদের ভাষা, চিন্তাধারার ভঙ্গী কোন্ দূর সূত্রে ঐ উত্তাল ক্ষ্যাপা জিনীয়সের সঙ্গে বাঁধা পড়েচে। অর্থাৎ আজ আমরা যা, তার খানিক অংশ এই প্যারিসীয় আইরিশ লেখকের যদৃচ্ছ রচনার ফল। দশ হাজার মাইল পারের আগন্তুক বাঙালির মনে এই আত্মীয়তার রহস্য আশ্চর্য্য ঠেকছিল।

উঠলাম সিঁড়ি বেয়ে। জয়েস্-এর ঘন পর্দ্দা দেওয়া ফ্ল্যাটের দরজায় লেখক স্বয়ং দাঁড়িয়ে। খুব একটা পুরু কার্পেট; প্রশস্ত, সজ্জিত, অথচ পুরোনো ভাব ঘরটায়। বহু আলো জ্বালা। জয়েস্-এর চোখে অত্যন্ত মোটা চশমা, অস্বচ্ছ দৃষ্টির কাঁচে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে যায়। আবার মনে পড়ল সামুদ্রিক জগতের কথা। ইনি ঠিক শক্ত ডাঙার লোক নন।

* জেম্স জয়েস (১৮৮২-১৯৪১)। প্রধান গ্রন্থ: (ছোটো গল্প: Dubliners; উপন্যাস: A Portrait of the Artist as a Young Man, Ulysses, Work in Progress (ছোটো-ছোটো অংশে প্রকাশিত); কবিতা: Chamber Music.

উঠল ভারতীয় প্রসঙ্গ; সেখানে লেখকরা কী করচে? খুব সশ্রদ্ধভাবে রবীন্দ্রনাথের নাম করলেন। বল্‌লেন তর্জ্জমা পড়তে নেই, তর্জ্জমা সাহিত্য নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, এই বাঙালি প্রতিভাকে তবু চেনা যায়। তাঁকে দেখেওচেন প্যারিসে। বাংলাভাষায় কি বহুদেশের শব্দ মিশেচে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়? ভাষা সম্বন্ধেই সব চেয়ে কৌতূহল দেখলাম।

নিজের কথা বিশেষ বলতে চান না। কিন্তু Work in Progress সম্বন্ধে কিছু ইসারা পাওয়া গেল। একদিন জয়েস্ এক বন্ধুকে (মনে পড়চে না Ogden না Richards) নূতন লেখার অংশ পড়ে শোনাচ্চেন। ডিনার খাওয়া হয়ে গেছে; টেবিলটার ধারে দুজনে তখনো ব'সে। হঠাৎ কী একটা কথা মিলিয়ে দেখবার জন্যে জয়েস্-কে অন্য কামরায় যেতে হবে, দরজা খুলে অন্ধকারে একেবারে দাসীর গায়ে গিয়ে পড়লেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দরজায় কান দিয়ে সে শুনছিল। ফরাসী দাসী, তা ছাড়া অশিক্ষিতা বল্‌লেই চলে— রচনার এক বর্ণও তার বোঝা অসাধ্য। (ইংরেজ এবং শিক্ষিতা হলেও বুঝত না।) বল্‌লেন, দেখ, যারা বোঝবার তারা বোঝে। কেন কে বোঝে তার উত্তর নেই। যারা শোনে বা পড়ে, শোনবার এবং পড়বার জন্যেই, তাদের বুঝতে বাধে না। কারণ, বোঝাটা উপলক্ষ্য। পণ্ডিতেরাও সাহিত্যে কখনো প্রবেশ করে না তা নয়। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কম্‌প্লিমেণ্ট পেয়েচি বুড় দাসীর কাছে।

শুনে গেলাম। মার্কিন-ঘেঁষা উচ্চারণ, খানিক ব'লে অনেকখন থেমে যান, আবার কথাটা শেষ করেন। ফুট্‌কি দেওয়া, আলগা কথার প্যারাগ্রাফ। কিন্তু চিত্তহারী। দুচার মিনিট চুপ করে বললেন, গ্রামোফোনের রেকর্ডে আমার কণ্ঠের গদ্য পাঠ আছে। অনেকে শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। এর নানারকম কারণ রয়েচে। রচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গেও আচ্ছন্নতার যোগ হয়তো আছে। কিন্তু গান শুনে এম্‌নি হয়। সেটা মানের জন্যে নয়।

তাঁর স্ত্রী এলেন। চা খেতে হবে। পুরোনো রূপোর চা-সামগ্রী নিয়ে যে ঢুকল, সাজিয়ে দিল, এই কি সেই শ্রেষ্ঠ সমঝদার প্রাচীনা গৃহসেবিকা? প্রশ্নটা মনেই রয়ে গেল। চায়ের সময় জয়েস্-এর মুখ গম্ভীর, কথা গম্ভীর। প্লেট, চামচ, আহার্য্য, কে খাচ্চে, কেন খাচ্চি এই সব নিয়ে যেন অত্যন্ত কী

একটা ভাবচেন। চায়ের জিনিষগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ। মধ্যে প্রশ্ন ক'রে নিলেন কবে যাব, ঠিক কোন্ সময়ে, ঠিক কোন্ ট্রেনে। মনে হচ্ছিল গভীর কোন্ রহস্যের সন্ধান দিচ্চি।

আরেকটা কথা মনে আছে। ছোটো ছাপানো পুঁথি দেবেন আমাকে, নতুন গ্রন্থের টুক্‌রো। বল্‌লেন, জাহাজে উঠে যেন পড়ি। এবং জাহাজ থেকেই সঠিক জানাই কীরকম লাগল। বইয়ের বক্তব্য এবং ভাষা সম্বন্ধে বললেন, শোনো। যে-কোনো য়ুরোপীয় বন্দরে মদের আড্ডায় দু-দশ দেশের নাবিক জোটে, তারা কেউ নেমেচে দুঘণ্টার, কেউ দুদিনের জন্য। এসেচে সন্ধ্যায় একটু মিল্‌তে-মিশ্‌তে। কী তাদের বক্তব্য, কী তাদের ভাষা? কেউ নরোয়েজিয়ান্, কেউ লেভান্‌টাইন জ্যু, ডচ্, স্প্যানিয়ার্ড কি মার্কিন বা ইংরেজ। ভাষার কোনো রাস্তা নেই অথচ বেশ কথাবার্ত্তা চলে। হাতে বোতল, চোখে হাসি, মুখে কথার ফোয়ারা, কেউ দীর্ঘ গল্প বল্‌চে অন্যে দরদ দিয়ে শুনচে, যা বুঝচে তাই যথেষ্ট। কেউই প্রমত্ত বা বিরক্ত, এমন অবস্থার কথা হচ্চে না। দেখ, কেমন জমে।

বল্‌লেন তাঁর বইয়ে অনেক বাক্যই নানা ভাষার টুক্‌রোয় বা আবহাওয়ায় রচিত। কখনো দুয়ে তিনে মিলে স্বতন্ত্র এক হয়েচে, কখনো বা কথার ভগ্নাংশ ধ্বনিতে বিধৃত। কখনো সমস্ত পদটাই পাঁচদশটা ভাষা বা জাতীয় ভঙ্গীর সৃষ্টি। ভাষা বা বক্তব্যের মূলে যারা যাবে তারা মনের কথা, শরীরের কথা সব মিলিয়ে মানুষের কথা শুন্‌বে। লেখাও সেইজন্যে।

শুনে মনে হচ্ছিল যাঁরা নিজেদের রচনায় আইডিয়া বা বিষয় কিছু আছে স্বীকার করতে নারাজ তাঁরাই বক্তব্য সম্বন্ধে আরো সচেতন। ভাষার নীহারিকা জয়েস্‌-এর সচেষ্ট মননজাত সৃষ্টি। ভাবও অনেকাংশে থিয়োরির অনুশাসনে গাঁথা। মগ্ন মনের ঢেউ মেশাবার কৌশলে আত্মবিস্মৃতির দীর্ঘ অভ্যাস দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য সব মিলে যে অদ্ভুত প্রবর্ত্তনা সেইটেকেই প্রধান ব'লে মান্‌ব।

টুক্‌রো পুঁথিটা জাহাজে পড়েছিলাম। স্বীকার করব ব্যাপার সহজ হয়নি। কেননা প্রায় কিছুই ধরতে পারিনি। বোঝবার চেষ্টা করলে মাথা ফাটবার অবস্থা, না করলে কালো অক্ষরের স্রোতে ভাস্‌তে হয়। কখনো গূঢ়

বর্ণোজ্জ্বলতার আভাস পাই। হাওয়ায় হারানো কোন্ চেনা কথা কানের পাশ দিয়ে হারিয়ে যায়। মনে খুব একটা স্পন্দন অনুভব করি। তার পর বিশ্রী একটা কথা এসে ধাক্কা দেয়। যেন অশুচিতার ভয় দেখানো। শেষ পর্য্যন্ত কথার স্তূপে, কথার অঙ্ক শাস্ত্রে, ভাবের ল্যাবরেটরির গন্ধে বিরক্ত হয়ে বই ফেলে দিয়েছিলাম। সরকারী পোষাক-আঁটা জাহাজী ইংরেজের কথাও তখন শুনতে ভালো লাগছিল। মেডিটেরেনিয়নের নীল অর্থহীন শব্দ ঢের বেশি বুঝি। অথচ বইটার সুদূর সান্নিধ্য মনে অনুভব করলাম; পড়াটার দরকার ছিল। Finnegans Wake-গ্রন্থে ঐ অংশ আবার পড়েচি। ঠিক একই অভিজ্ঞতা।

জয়েস্‌কে কিছু লিখতে পারলাম না। কেননা অমনতর গ্রথিত একনিষ্ঠ রচয়িতাকে বাহিরের কথা শোনানো বৃথা।

জয়েস্-এর চেহারা মনে পড়ে। শুষ্ক সকৌতুক ভাব ঠোঁটের কোণায়, মুখে নিগূঢ় ঔদাসীন্য—খানিকটা বোধ হয় চোখের জন্যে—অথচ হৃদ্যতার অভাব নেই। সৌজন্য অশেষ।

এইখানে মজার কথাটা বলি।

চলে আস্‌বার ঠিক আগে জয়েস্ বল্‌লেন, তোমাকে একটা পুরোনো বই দেব, তোমার নামের অর্থ একটু স্পষ্ট বুঝে নিই। পাশের ঘরে চলে গেলেন।

যে-বইখানি এনে দিলেন তাতে লেখা To Mr. Ambrose Wheelturner। বল্‌লেন, য়ুরোপে তোমার এই নাম ঠিক হবে। শুধু তর্জ্জমা নাম নয়, এটা সত্যি নাম।

(২)

জয়েস্-এর লেখায় হাসির দিকটা আমাকে মুগ্ধ করে। Ulysses-এ অত্যন্ত উপভোগ্য প্রহসন আছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টির সঙ্গে মিশেচে উদার চিত্তরস; রসিকতা বল্‌লে কম বলা হয়। ভাবার সন্ধানেও কৌতুকের দীপ্তি দেখতে পাই, শুধু বৈজ্ঞানিকতা নয়। তা না হলে এসব আশ্চর্য্য বাক্য কে লিখতে পারত?

১। Satisfiction (গল্পপড়ার তৃপ্তি, অলীক কিন্তু মন্দ কী।)

২। Bluey-silver; Rainbowl; silvamoonlake (দেখ্‌তে, অনুভব করতে।)

৩। Clapplause (চরম উৎসাহবাচকতায়)

৪। Shampain (পরের সকালের অবস্থা)

৫। Hierarchitectitoploftical (Skyscraper-এর অভ্রভেদী ঠাট্টা)

মাত্র এক মুঠো। এমন শব্দ বাক্যের ফুলঝুরি লেখায় সর্ব্বত্র জলচে, প্রতিভার অনায়াস অজস্রতায়। বুঝতে পারি ইনি না হলে "Orientourist" হতাম না, "portmanteau words" হাতের কাছে থাকত না। Eglinton-eyes looked up skybrightly" না পড়লে ভাষার ঘনিষ্ঠ দীপ্তি চোখে কমত। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হাসিটুকুও ধরা চাই। মগ্নমন হতে বর্ণপ্রলাপ বিস্তার করায় অসম্ভবের দরজা খুলে যায়। এই অহেতুক উৎসাহ ক্রতস্পর্শী।

"Bronze by gold heard the hoofirons, steelyringing…
Blew. Blue bloom is on the
Gold pinnacled hair…
Lost. Throstle fluted. All is lost now."

ক্ষ্যাপামি নিশ্চয়, কিন্তু ঝোড়ো মেঘে সোনার পাড় বসানো। মনে বিদ্যুতের চমক লাগে।

"She was just a young thin pale soft shy slim slip of a thing then, sauntering, by silvamoonlake, and he was a heavy trudging lurching lieabroad of a Curraghman, making his hay for whose sun to shine on."

অত্যুক্তির মজা এখানে নিগূঢ় শিল্পমাধুর্য্যে পরিস্থত। এ রকম ইন্দ্রজাল বুনোনির পথ বন্ধ করলে দিগন্ত শীর্ণ হয়ে যাবে। সাহিত্যে সম্ভবপরতা ঠেকিয়ে রাখবার সাধ্য কার?

Finnegans Wake-এর অনেক পৃষ্ঠা এম্‌নিতর বিভাষিত। Anna Livia Plura Bell-এর শেষ অংশ সায়ংসৌন্দর্য্যের গভীরতায় ডুবে গেছে—ভাষার মধ্যে কেমন ক'রে প্রবেশ করেচে দিনের ধূসর শেষতা।

কার্ত্তিক, ১৩৪৮

অরণ্যে লুকোনো হ্রদে চন্দ্রালোক দেখবার ভাগ্য সহজে ঘটে না। স্বীকার করেচি জয়েস্-এর লেখায় বাক্যের জঙ্গল, পথ হারানো ক্লান্তিকর আবর্ত্তন; হোঁচট খাওয়ার অভিজ্ঞতাও সুখকর নয়। অতটা ভেদ করে হাঁটতেই হবে এমন পণ করব না। কিন্তু দৈবে যদি অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের তটে পৌঁছই তা মানব না কেন? সার্থকস্মরণ কতদিনের ঘটনার জন্যে জয়েস্-এর কাছে আজ ধন্যতা জানাতে চাই।

ভাষার ভাণ্ডারে আবিষ্কার চলেচে—জয়েস্ যা দিয়েচেন তার বিচার এই পরিসরে চলবে না, আমার যোগ্যতাও নেই। তবু সেই দিকটাই খানিক বলতে চেয়েচি।

ভাষার সঙ্গে দেখি মনোধারা প্রকাশের এবং তার অতলে প্রবেশের টেক্‌নীক। সাধারণ একটি মানুষের জীবন, তার পনেরো ঘণ্টা ধরে দেখাতে যে মননশিল্পীকে হাজার পাতা লিখতে হয় তিনি গভীর সন্ধানী। তাঁর কাছে মনোরাজ্যের চেতন, অবচেতন, অর্দ্ধচেতন স্রোত, গতিবেগ এবং ঘূর্ণি কত পরমাশ্চর্য্য রহস্যময় তা বলা বাহুল্য। জয়েস্ কলম ধরেছিলেন ব'লে নিহিত-লোকের পরিচয় নূতন ভাষায় উত্তীর্ণ হল—পরিচয় সম্পূর্ণ নয়, আকস্মিক এবং অসম; ভাষা প্রহেলিকাগ্রস্ত এ জেনেও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেই হয়। সমগ্র পশ্চিমী সভ্যতা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েচে। চৈতন্য জলের ডুবুরি, ভাষার পসারী, অনুসন্ধানী, হাস্যরসিক অতিশয়োক্তিপ্রিয় এই অনন্য আইরিশ লেখককে।

এতখানি সাহসিক অনন্যসাধনা, একদেশদর্শিতার বলে অর্জ্জিত নবভাষ্য সাহিত্যে দুর্লভ। সাহিত্য অভিযানী, তাকে চলতে হয়। যাঁর রচনায় এগিয়ে চলার হাওয়া বয় তিনি আমাদের মুক্তির ব্রতী, তিনি নমস্য। জয়েস্-এর পূর্ব্বদিকের রচনা Dubliners এবং The Portrait of the Artist as a Young Man সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পেয়েচে। শেষদিকের রচনার খণ্ডাংশে অতুল্য সম্পদ আছে যার আলোচনা চলেচে। সেই হিসাবে স্রষ্টার উচ্চলোকে তিনি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেখানে তিনি পাথর ভেঙেচেন, গন্তব্যের সন্ধান দেন নি প্রবর্ত্তনা দিয়েচেন, সেখানেও তাঁর মর্য্যাদা সাহিত্যলোকেই। ঐতিহাসিক মূল্যেও রচনা মহার্ঘ হতে পারে; আন্তর মূল্যের সংযোগে এমন
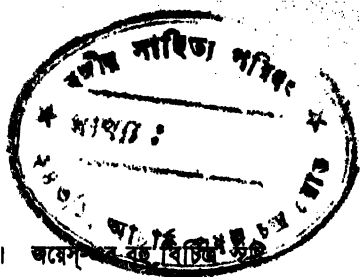
রচনা সাহিত্যে স্মৃতিফলকরূপে দীপ্যমান হয়েছে। জয়েস্‌-এর বহু বিচিত্র সৃষ্টি প্রসঙ্গে এই কথাই মনে হয়।

তিনি উজ্জ্বল বাচস্পতি। "গল্পসল্পে"র বাচস্পতি প্রতিভায় রূপপরিগ্রহ করলে এই মূর্তি দেখা যেত। যে-মূর্তি চোখে জেগে ওঠে কাল্পনিক লেখক সম্বন্ধে তাঁর এই বর্ণনায় :—

"The phrase and the day and the scene harmonized as in a chord. Words. Was it their colours ? He allowed them to glow and fade, here after here : sunrise gold, the russet and green of apple orchards, azure of waves, the grey fringed fleece of clouds. No, it was not their colours : it was the poise and balance of the period itself. Did he then love the rhythmic rise and fall of words better than their association of legend and colour ? Or was that being weak of sight as he was shy of mind, he drew less pleasure from the reflection of the glowing sensible world through the prism of a language many coloured and richly storied than from the contemplation of an inner world of individual emotions mirrored perfectly in a lucid supple periodic prose ?"

("Dubliners")

কম বয়সের এই লেখায় তাঁর ঘনিষ্ঠ সৃষ্টিমানসের আলো পড়েছে।

ছড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অলস মনের আকাশেতে প্রদোষ যখন নামে
কর্মরথের ঘড়ঘড়ানি যে-মুহূর্তে থামে
এলোমেলো ছিন্ন চেতন টুকরো কথার ঝাঁক
জানিনে কোন স্বপ্নরাজের শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে দিনের বেলার গর্ত,
কারো আছে ভাবের আভাস কারো বা নেই অর্থ,
ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের আসর তাহার জমে।
একটুখানি দীপের আলো শিখা যখন কাঁপায়
চারদিকে তার হঠাৎ এসে কথার ফড়িং ঝাঁপায়।
পষ্ট আলোর সৃষ্টি পানে যখন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয় হঠাৎ মাতন এ কি।
বাইরে থেকে দেখি একটা নিয়মঘেরা মানে,
ভিতরে তার রহস্য কী কেউ তা নাহি জানে।
খেয়াল-স্রোতের ধারায় কী সব ডুবছে এবং ভাসছে,
ওরা কী যে দেয় না জবাব কোথা থেকে আসছে।
আছে ওরা এই তো জানি বাকিটা সব আঁধার,
চলছে খেলা একের সঙ্গে আর একটাকে বাঁধার।
বাঁধনটাকেই অর্থ বলি বাঁধন ছিড়লে তা'রা
কেবল পাগল বস্তুর দল শূন্যেতে দিক্‌হারা।

---

* রবীন্দ্রনাথের সত্যোপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ছড়া' থেকে সংকলিত। বিশ্বভারতীর সৌজন্যে।

নতুন কবিতা

ছড়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতার সংখ্যা ১+১১। বিশ্বভারতী, এক টাকা

কবি, তোমার ছড়ার ছন্দ লাগলো আমার মগজে,
ঐ ছন্দেই ধরা পড়ে কাব্যকলার ক-খ যে।
ক-খ থেকে শুরু ক'রে য র ল ব হ ক্ষ,
আগাগোড়াই আনাগোনা, সমস্তটাই লক্ষ্য।
এলোমেলো আবোল-তাবোল ছেলেবেলার গান,
বিষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর ছন্দে এলো বান।

আমরা যারা এ-দুর্ভাগা যুগেও লিখি কবিতা
(কারো পক্ষে আত্মরতি, কারো পক্ষে hobby তা),
আমরা অতি সংস্কৃতিবান, আমরা উচ্চশিক্ষিত,
হাল আমলের ইওরোপের সমালোচন-দীক্ষিত,
সুয়েজখালের পশ্চিমে যা হচ্ছে কিংবা না-হচ্ছে
সে-সব নিত্য-নতুন তথ্য মনের মস্ত হাঁ ভরছে।
নানারকম ভঙ্গি ফোটাই অতি সূক্ষ্ম আঙ্গিকে,
প্রগতিশীল পদ্য হেনে যুদ্ধ বাধাই বামদিকে
বিষয়টা তার নবযুগের ধ্বজাবাহী কোন কবি,
সাক্ষী জোটে মন-সাজাবার দরজিটি এবং ধোবি—

আমরা আজ অবাক হয়ে পড়ছি তোমার ছড়া
বাংলাদেশের প্রাণের গন্ধে ভরা।
স্বপ্নে যেন মনের মধ্যে দেয় ওরা হাতভালি,
আজিভাঙা কাজিভাঙা মধ্যে ধনেখালি।
ধনেখালির খালের পাড়ে কাজিভাঙার হাটে
হঠাৎ দেখি হড়ম বিবি খড়ম পায়ে হাঁটে।

কবিতা

কার্তিক, ১৩৪৮

কানের কাছে কে যে বললে আজ তুর্গার বে,
পাড়ার যত ভুঁড়োশেয়াল নাচতে লেগেছে।
ড্যাম্‌রাচোখো কামড়ে দেবে কাছে যেয়ো না,
ফিটিং চ'ড়ে মীটিঙে যায় ফটিংটিঙের ছা।
ধরলো তারে পথের মধ্যে চোদ্দ হাজার সেপাই,
প্রাইম মিনিস্টর বলেন ও তো নবাবপুরের খ্যাপাই।
খ্যাপা বলে, চাঁদনি রাতে ঝরেছে কাল বোমা,
তার মধ্যে কোথাও নেই সেমিকোলোন কমা।
কাণ্ড দেখে ঠাণ্ডা চাঁদের কপাল ঘেমেছে,
কাজলতলার মেয়েগুলো নাইতে নেমেছে।
রেডিওতে খবর এলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজি হলেন খোঁচা খেতে ডাক্তারের চাকুর।
পরক্ষণেই গাঁ-গাঁ ক'রে গর্জে বি. বি. সি.,
পলাশগাছটি লাল-টুকটুক, শূন্য উদীচী।
আকাশ জুড়ে মেঘ করলো, এলো বৃষ্টি হেনে,
পায়ের কাছে কম্বলটা দিচ্ছি মাথায় টেনে—
এমন সময় চমকে উঠি, ভাঙে ঘুমের ঘড়া,
মাথার মধ্যে টাক-ডুমাডুম বাজে তোমার ছড়া।

তুমি সেদিন বলেছিলে আকাশ ভ'রে বাজে
আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
সত্যি এ তো বড়ো রঙ্গ, এ তো বড়োই রঙ্গ,
স্বপ্নের সুরঙ্গ দিয়ে চলি তোমার সঙ্গ।
কাব্যকলার কলকব্জা সবই প'ড়ে রইলো,
বল্গা-ছেঁড়া কল্পনার হালকা হাওয়া বইলো।
বিদ্যেবুদ্ধি তার সঙ্গে পাল্লা দেবে কি ?
লজ্জায় মুখ লুকোলো ইউনিভর্সিটি।
এ-যাত্রাকে আটকাবে না কোথাও পুলিশ সার্জন,
অর্থ খুঁজে পাবে না এর স্বয়ং প্রোফেসরগণ।

কার্তিক, ১৩৪৮

কোনখানে এর তত্ত্বকথা, কোথায় allegory,
কোনখানে বা কোন স্থনীতির ঘটলো গলা-দড়ি,
কতটুকু উপনিষৎ, বিদ্যাপতি ক'ফোঁটা,
একান্তই বর্জনীয় বুর্জোআনি কতটা—
বর্জইসে পাইকাতে মেশা এ-সব গবেষণা
পি. এইচ. ডি.-চিকীর্ষু'রাও করতে এসো না।
পণ্ডিতেরা বিচার ক'রে যতই বসান ট্যাকশো,
এর ভাগ্যে পুরো নম্বর, একেবারেই একশো।
দিনে যারা গোরু চরায়, রাত্রে খোঁজে গোরু
তাদের পক্ষে এ-পাড়া যে ধূ-ধূ ভীষণ মরু।
সমালোচক-গজভোগ্য নয় এ কপিত্থ,
আর-কিছু তো নেই, আছে শুধুই কবিত্ব।
আছে কেবল আকাশ ভ'রে টাক-ডুমাডুম ছন্দ,
বাতাস ভ'রে বাংলা দেশের গন্ধ।
হয়তো কিছু ঠাট্টা আছে, অনেকখানি মশকরা,
তার সাহায্যে সম্ভব নয় প্রোফেসরদের বশ করা,
কারণ লিরিক কবি কভু হাস্যরসিক হন না
এই বলেছেন ডক্টর শ্রীপদ্মলোচন শর্মা।
তত্ত্ব যদি থাকে তার তর্ক তোলা মিছে সে,
টেনেটুনেও ধরবে না সিকিখানা থীসিসে।
একেবারেই অসংলগ্ন, নিতান্ত অসঙ্গত,
ছন্দ যত নৃত্য তোলে চিত্র হানে রং তত।
মিলের চুনিপান্না জলে, অনুপ্রাসে চমক দেয়,
অথচ তার একটিও নেই অভিধানের নিমক খায়।
সবাই যেন আপনি এসে বসেছে ঠিক জায়গাতে,
অন্য-কিছু হ'তে পারতো সেটাই ভাবা যায় না যে।
কেউ বলবে পষ্ট দেখা দিয়েছে Unconscious,
মিষ্টি মাছের নীতিকথা, সেটাও তো নয় কম শাঁস।

কার্তিক, ১৩৪৮

কেউ বলবে সমাজ-চেতন দৃষ্টিভঙ্গি পাচ্ছি ঠিক,
কেউ বলবে এ তো নিছক surrealistic।
আমি দেখছি মেঘ করেছে সূর্যি ডোবে-ডোবে,
পূর্ণিমায় আগুন জ্বলে সর্বনাশের লোভে।
তবু বৃষ্টি আজো পড়ে ছন্দে নামে বান,
লাবণ্যের বন্যা আনে ছেলেবেলার গান।
চিন্তা নেই, চেষ্টা নেই, একটুও নেই স্থায়িত্ব,
এ-কথাটাও জানে না যে একেই বলে সাহিত্য।
ভরলো হৃদয় মধুরতায়, শ্যামল হ'লো রুক্ষতা,
এই তো জানি কাব্যকলার প্রথম এবং শেষ কথা।

বুদ্ধদেব বসু

অমাবস্যা—(দ্বিতীয় সংস্করণ)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক ; ডি এম্ লাইব্রেরি। দাম পাঁচ সিকা।

আকাশগঙ্গা—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : ভারতী ভবন। দাম দেড় টাকা।

বাঙলা কবিতার দ্বিতীয় সংস্করণ বার হওয়া আজকের দিনে স্মরণীয় ব্যাপার। বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা' এবং অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা' এ অভাবনীয় সৌভাগ্য লাভ করেছে। এতে মনে হয় বাঙলা দেশে প্রকৃত কাব্যের সমাদর এখনো হয়, এবং ঠিক জনপ্রিয় না হ'লেও বাঙলা কবিতা কাব্যরসিকের প্রিয় হয়ে উঠেছে।

'অমাবস্যা' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো তখন পাঠক-মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তার কারণ এ-জাতীয় কবিতার স্বাদ পূর্ব্বে সুলভ ছিল না। প্রেমের কবিতা অবশ্য অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু জোলো ও ফিকে রকমের রোমান্টিক কবিতার অকাল-মৃত্যু অনিবার্য্য। সাময়িক একটু হৃদয়ের আলোড়ন বা কানের তৃপ্তি, এতে স্থায়িত্ব লাভ করা শক্ত। কিন্তু অচিন্ত্য

কার্তিক, ১৩৪৮

কুমারের 'অমাবস্যা' সম্পূর্ণ নতুন ধরণেরই প্রেমের কবিতা। তার যে শুধু ছন্দের বৈশিষ্ট্য কিংবা পদের নতুন লালিত্য আছে, তা নয়। তার চেয়ে বড় কথা—প্রাণবস্তু আছে, একটা বিশিষ্ট সচেতনতা ও দৃষ্টিভঙ্গী আছে। বত্রিশটি কবিতা মোটামুটি একই ছন্দ ও সুরে বাঁধা; কিন্তু প্রেমিকের বিভিন্ন মনোভাবের সুতীব্র প্রকাশে প্রত্যেকটি কবিতার পৃথক সত্তা আছে। কখনো অভিমানে, কখনো বৈরাগ্যে, কখনো বা তিক্ততায় উৎসারিত হয়ে কবিতাগুলি বৈচিত্র্যহীনতা থেকে বেঁচে গিয়েছে এবং আন্তরিক আবেগের ঐশ্বর্যে আজো যে বেঁচে রয়েছে, 'অমাবস্যার' দ্বিতীয় সংস্করণ তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

'অমাবস্যা' ত্রুটি-বিরল নয়। তাতে অনুপ্রাস-বাহুল্য আছে যেটা অনেক সময়ে শ্রুতিসুখকর নয়; স্থানে-স্থানে ধ্বনির স্বার্থে অর্থের প্রাধান্য গেছে ঘুচে। কিন্তু প্রেমের কবিতা-হিসাবে বাঙলা কাব্যে এ বইখানির স্বতন্ত্র ও সম্মানিত স্থান থাক্‌বে। অনেক দিন পরেও আবেগ-সন্ধানী বাঙালী পাঠক "আমি এসেছিনু পথ ভুল করি তোমাদের খেলা-গেহে", "আমার প্রিয়ার ঘরের অতিথি, শুধাই তোমারে ভাই" "যদি কোনো দিন বেদনার মতো বাদল ঘনায়ে আসে" প্রভৃতি কবিতাগুলি উপভোগ করবে, রসগ্রহণ করবে। সাময়িক অ-ভদ্র ব্যঙ্গ সমালোচনা ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে না; কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ ও সংস্কৃতানুগ মধুর পদবিন্যাস রুচিবিবর্ত্তন অতিক্রম ক'রেও কবিতাগুলিকে রমণায় কমনীয়তায় আর ব্যর্থ প্রণয়ের শিল্পায়িত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত ক'রে রাখবে।

'আকাশগঙ্গা' কবিগুরুর ছায়াশ্রয়ী রচনা। এতে প্রথম কবিতাটির সুর ও গাম্ভীর্য্য কবির কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। 'কবি-প্রণাম' ও 'গুরু-প্রণাম' কবিতা দুটিতে আন্তরিকতা বর্ত্তমান, যা আজকের দিনে করুণ হ'য়ে ফুটে উঠেছে। এ কাব্যের সার্থকতা সম্বন্ধে কবির মুদ্রিত আশীর্ব্বাণী আমাদের সচেতন করবে। শেষের দিকে যে কয়টি অনুবাদ-কবিতা আছে তার মধ্যে Herbert Trench-এর "She comes not to me when noon is on the roses"-এর তর্জ্জমাটি পড়ে ভালো লাগলো, কারণ এতে মূল কবিতার সৌন্দর্য্য, তার ছন্দ ও প্রাণ দুই-ই বজায় আছে।

বিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিশেষ দ্রষ্টব্য

'কবিতা'র এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের যে-গদ্য কবিতাটি প্রকাশিত হ'লো সেটি তাঁর খুবই সাম্প্রতিক রচনা, এবং এটি যেন 'কবিতা'য় প্রকাশের জন্য পাঠানো হয় এ-নির্দেশ মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি নিজেই দিয়েছিলেন। 'কবিতা'র গত 'আশ্বিন সংখ্যায় 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা ও সাহিত্যের উৎস' নামে তাঁর যে-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, সেটিই সাহিত্য বিষয়ে তাঁর শেষ প্রবন্ধ।

'কবিতা'র এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী স্থানাভাবের জন্য দেয়া সম্ভব হ'লো না, সেটি 'কবিতা'র আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক ও প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
কার্যালয় : কবিতা-ভবন ; ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা।
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা থেকে ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

কবিতা

সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা | পৌষ, ১৩৪৮ | ক্রমিক সংখ্যা ৩০

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

পূর্ব্বযুগে অশোকশাখে নারীর চরণ লেগে
ফুল উঠিত জেগে,—
কলিযুগে লেখনীতে সম্পাদকের তাড়া
নিত্যই দেয় নাড়া—
ধাক্কা খেয়ে যে কবিতাটা
ফোটে খাতার পাতে
তুলনা কি হয় কভু তার
অশোক ফুলের সাথে?

১৪ মাঘ
১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ

বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত

পৌষ, ১৩৪৮

নানা কথা

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কে)

সমর সেন

১

পশ্চিমে সূর্যাস্তের আবীর,
দেশে দেশে পড়ন্ত প্রাচীর।

দু যুগ গত,
রক্ত আশ্বিনে রুষ বিপ্লবের পর
মধ্য ইউরোপে
জারজ সন্তানকে সঙ্গোপনে রসদ জোগায়
মাতা তার, দাঁত-চাপা বৃদ্ধা গণিকা,
পশ্চিমী গণতন্ত্র নাম।

একদা বর্ধিষ্ণু গ্রাম শবজীবীর আশ্রয়,
শস্যহীন মাঠে পোড়া বারুদের স্বাদে
মুষ্টিমেয় মানুষ ফসলের উচ্ছিষ্ট খোঁজে,
শূন্যচর মৃত্যু ক্ষণে ক্ষণে কালোয়াতি দেখায়,
জয়গর্বে কামান গরজায়।
তিলে তিলে গড়া কারখানার ভগ্নাংশ মাত্র
সহরে জাগে,
বিগত দিনের কঙ্কাল।

বলি, দুর্ধর্ষ কসাকের গান কখনো স্তব্ধ হবে না;
ক্ষণে ক্ষণে নানা দিকে অট্টহাসি শুনি।
লেনিনগ্রাড ঘেরাও,
যেন তাদেরি বাজীমাৎ
স্বদেশী বন্ধুরা কোলাহল বাধায়;

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৮

চাকুরী খালির বিজ্ঞাপনে বেকারের সকাল সুরু,
শূন্যমনে সকালে উঠি ; মুরগী আর কুকুর ডাকে,
দুপুরে ঘুঘু-ডাকা বিষণ্ণতা,
গোধূলিতে বিবেকদংশন, অনাগত সর্বনাশ
যেন আসে দেয়ালের পাশে ;
দেশে দেশে পড়ন্ত প্রাচীর ।

২

হঠাৎ আজ হাওয়া দিল
সঞ্জীবনী বার্তাবহ।
বুড়ো দিন সোনার কলপ মাথায় লাগায়
পথে চলার পুরোনো সখ পাগল করে।
অভ্যাসবশে মন নোংরা গলিতে ঢোকে,
স্বেচ্ছায় আবর্জনা দেখে গ্লানিতে ভরে ,
বাইরে বিপুল বিশ্ব, সাঁজোয়া জীবনের শবযাত্রায়
আলোকিত সমস্ত নরলোক,
কিন্তু সুদিন আসন্ন, কিছু রক্তশুদ্ধি, হয় হোক্‌,
এ কথা ভাবে বাচাল মন।

৩

বহুদিন আশা ছিল,—আশার ছলনা :
মনোমত সঙ্গিনী, সঙ্গে কিছু টাকা ;
ছেলেপিলে বেশি নয়, মোট দু’তিনটি,
অন্তরঙ্গ দোস্ত একটি,
অন্দরে যাবে ? সেটা ভেবে দেখবার ।
জীবনবীমা, সান্ধ্য ভ্রমণ, দিনান্তে তামাক,
কিন্তু বয়স হলে বাত ধরে, ক্রমশ বর্গীরা চড়াও করে,
শ্লেষ্মায় মাঝরাতে ঘুম ভাঙে,

তারো কিছু পরে
স্ত্রীপুত্রকন্যাকে শোকসাগরে ছেড়ে
নিরুদ্দেশ যাত্রা
সেই অজ্ঞাতলোকে, যেখান থেকে কোনো যাত্রী কখনো ফেরেনি।

আশ্বিনের সকালে মনে হয়, দূরে সমুদ্রের ধারে
অসংখ্য অশ্বারোহী
বিচ্ছুরিত নীল অন্ধকারে
ক্ষণে ক্ষণে বালুতে নামে,
হলুদ বালি দিনরাত্রি জলে, দূরে ফণিমনসার ঝাড়।
ফেরার হাওয়ায় শুনি ক্রমশ নিঃশব্দ গান
আমার এ মরুভূমি বসন্তের বাগান।

৪

"হামেশা ঝামেলায় সময় কাটাই
দিন আনি দিন খাই।
আজ চলুন, সহরে বেরোই,
এখানকার সন্ধ্যা দেখুন,
কফির রং,
কোন্ খোঁয়ারি দেবতার পানীয়।"

"অনেক দিন পরে দেখা।
আপনি কিন্তু একটুও বদলান্‌নি,
গায়ে এখনো মাংস লাগেনি,
বোধ হয় কখনো লাগবে না।
....
এ লক্ষীছাড়া দেশ ছাড়ুন মশাই,
ব্যক্তিত্বের মৃত্যু এখানে।"

হয়ত তাই।
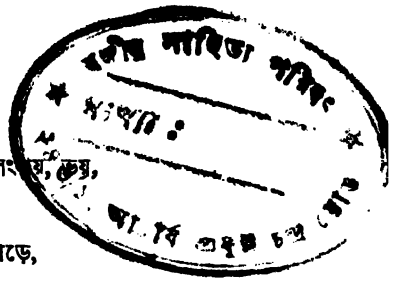
আবার অনেকদিন কাটে।
নিয়মিত পত্রিকা পড়ি, কতো সংশয়, ভয়,
মূঢ়, লোভী পাপ দিগ্বিজয়ী,
মহুয়ার বন মাঝে-মাঝে মনে পড়ে,
দিনগুলির বুকে জগদ্দল পাথর।
সাংসারিক চাপ বাড়ে, কারণে অকারণে আক্রোশ জমে,
অবশ্য পিঞ্জরিত সিংহ নই,
কলে বিকল মূষিকের সঙ্গে
সাদৃশ্য আরো বেশি।

৫

আবার সূর্যোদয়
এ আদিম সকালে শুনি
বিলাসখানি টোড়ীতে বিলাপ চলে,
সমুদ্রমেখলা ছিন্ন, অত্যাচারে অনাচারে শতধা পৃথিবী ;
বকধর্মে নির্লজ্জ মিথ্যায়
বিদেশী প্রভুরা তাঁর উপপতি সাজে।
অসৎ সময়ের ভার, মালবোঝাই জাহাজ ডোবে,
দেশে দেশে হারামী বণিক
নিজের নাক কেটে লোকের যাত্রাভঙ্গ সাধে,
রক্তাক্ত এ আশ্বিনের সকাল।

৬

শ্রাবণের কলকাতায়
অনেকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়,
আজ বাইশে শ্রাবণ।

মহৎ লোক্‌সান লোকে স্বচ্ছন্দে ভোলে।
কাংস্যভাষী কেরানির অবসর কই, দুপুরে রেস্তর্াঁয়

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৮

ছাত্রেরা কথায় চিঁড়ে ভেজায়,
দুনিয়ার সমস্যার সমাধান চলে,
অর্থহীন বোলে, লপেটা চালে, সৌখীন সঙ্গে দিন যায় ;
বেলা পড়ে আসে,
আকাশে চিম্নী কালো রক্ত ছোঁড়ে,
ঘর্মাক্ত দিনের পরে নিরানন্দ সন্ধ্যায়
নিরন্ন মুখে অনেক বারেক দেখে
পশ্চিম আকাশের সোনালী ফসল, ঘরে ফেরে
বিমর্ষ ব্যারাকের কুম্ভীপাকে।
ইতস্তত ভিড়, যমরাজ ছদ্মবেশী, নানাবেশে আবির্ভাব, ঘোরাফেরা,
ইতর ভাষায়, কদাকার কৌতূহলে, বিগলিত হৃদয়বৃত্তিতে
রোগের প্রচ্ছন্ন বীজ জমে।

জন্মমৃত্যুতে জীবন শেষ ?
জানি না, শুধু জানি, শূন্য এ দেশ,
রাত্রি চক্রব্যূহ রচে।
আমরা নোংরা মানুষ, দেশে দেশে বিকার ছড়ায়,
মহৎ মানুষেরা একে একে নিরুদ্দেশযাত্রী।
বর্বর নখরে ললিত প্রাণ ধীরে ধীরে ছিন্ন করে
শ্মশানের পাশে জেগে থাকে নরান্তক নির্বিকার কাল,
মিশরের মরুভূমিতে স্থবির মূর্তির মতো।

অনেক শান্ত গ্রীষ্মের পর
কালের কুটিল গতিতে অকস্মাৎ ঘনঘোর ঘটা,
দিগ্বিজয়ী বর্বর পৃথিবীকে অরণ্য বানায়।
একে একে আলো নিভে এলো
এখন শেষ আলো কালো পর্দায় ঢাকে,
সর্বলোভী পাপ সর্বনাশা
পৃথিবীর স্পন্দমান লাল হৃৎপিণ্ডে হাত রাখে।

জানি, এরা নয় বৈশ্য সভ্যতার জারজ সন্তান,
গলিত ধনতন্ত্রের চতুর বিভীষণ,
তাই সক্রিয় আশা মৃত্যুহীন জাগে অনেকের মনে ;
অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল
পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।

বাণী-মন্দির

অমল হোম

শ্রীমতী বাণী দেবী
করকমলে

যুগে যুগে দেশে দেশে, মানুষ গড়েছে মন্দির
করেছে তাতে তার আরাধ্যা দেবীর পূজা :
গড়েছে সভ্যতার আদি-জননী মিশরে,
কূলপ্লাবিনী নীলনদের তটবক্ষে,—
মেম্ফিসে, থিবিসে, আপোলিনোপলিসে,—
কত বিচিত্র দেবী-মূর্তি, দুরুচ্চার্য্য তাদের নাম।
শুধু মনে পড়ে ওসিরিস-অর্দ্ধাঙ্গিনী আইসিস্‌কে,—
নিবিড় রহস্যকুহেলি-আচ্ছন্ন নাইল-জননী,
রমণীকুলমণি, মানবজন্মধাত্রী,
বিচিত্র-চিত্র-বিচিত্রিত মন্ত্রমুখর মন্দিরে তার
কত না বিস্ময়!

(২)

গড়েছে প্রাচীন গ্রীসে মানুষ মন্দির,—
তুষার-ধবল মৌন প্রস্তরে ফুটিয়েছে মরম-গভীর ভাষা,
গড়েছে মানবীরূপে অপরূপ দেবীর মূর্ত্তি—
আফ্রোদিতি, আথেনা, আর্টিমিস্ ।
সমুদ্র-ফেনোত্থিত শুভ্র নগ্নকান্তি, অনিন্দিতা আফ্রোদিতি—
সকল কামনার ঊর্ধ্বে, বিশ্বের কামনার ধন !
অকলঙ্ক আথেনা চিরকুমারী—
কাব্য কলা শিল্প বাণিজ্য,—কর্ম্মের ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী
শুভদা বরদা বাগ্দেবী ;
প্রতিষ্ঠা যাঁর পার্থেননের মন্দিরে—
বিরাট অভ্রংলিহ চিরন্তনী—
শিল্পশোভার সার,
কালে কালে জাগিয়েছে যে-মন্দির মানুষের শ্রদ্ধাবিমুগ্ধ বিস্ময় ;
দেশ দেশান্তর থেকে এসেছে কত না শিল্পী, কত না জ্ঞানী, কত না গুণী,
জানাতে তাদের নতশির বন্দনা !

(৩)

আপলো-ভগিনী আর্টেমিস্
দৃপ্ত দীপ্ত, কোদণ্ডধারিণী, শাণিত-সায়কতূণী
মৃগয়ায় যাঁর আনন্দ, পশুহননে যাঁর তৃপ্তি,
মহামারী যাঁর অনুচর ।
আবার, যাঁর স্পর্শে হয় ব্যাধিমুক্তি,
দূরে পালায় রোগ-বিভীষিকা
সকল অমঙ্গল,—
কঠিনে কোমলে বিচিত্র লীলাময়ী
আর্টেমিস্ !

পৌষ, ১৩৪৮

(৪)
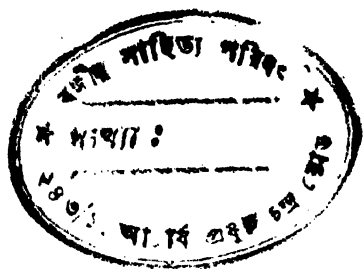
অতুল রোম,—
বিপুল তার সাম্রাজ্য,
বিশাল তার বক্ষে
বিরাট মন্দির।
ধূমায়মান মশাল-আলোকে চোখে পড়ে
দেবী-মূর্ত্তি এক ;
মনে হয় যেন চিনি এঁকে, দেখেছি কোথাও—
মনে পড়ে দেখেছি গ্রীসে,—এই দৃষ্টি, এই ভঙ্গী,
দেখেছি বুঝি এঁরই অনুজাকে—
সেই রূপে অরূপে অপরূপা আফোদিতি মূর্ত্তি
রূপান্তর ধরেছে ভিনাসে,—
বসন্তের পুষ্পবাসরবিলসিত প্রেমের অমরায় যাঁর লীলা,
মানবহৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারিণী
বাসনার তপ্ত নিঃশ্বাসে অমলিন।

(৫)

মিনার্ভা জ্ঞানদায়িনী বর্ম্মচর্ম্ম-প্রহরণধারিণী,—
মন্দিরে যাঁর অগণিত ভক্ত
বরলাভে ব্যাকুল ;
ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই, চলেছে যাদের আরাধনা,
কঠিন তপস্যা, কী দুরূহ ব্রত !

(৬)

আরও কত দেবী রোমে !
সারমেয়-সঙ্গিনী ডায়ানা, শোকসন্তাপনাশিনী অর্ব্বোনা,
ক্লান্তিবিনোদিনী ফেসোনিয়া,
যাত্রারম্ভে যাত্রাশেষে নমস্যা

আবেয়োনা আড়েয়োনা, যুগল-ভগিনী,
পেয়েছেন পূজা মন্দিরে মন্দিরে দীপে ধূপে বন্দনাগানে ॥

(৭)

ভারতবর্ষে ভক্ত গড়েছে অযুত মন্দির
জনপদে প্রান্তরে, গিরি গহ্বরে, সমুদ্রতটে নদীউপকূলে
তীর্থে তীর্থে চলেছে কত না দেবতা
কত না দেবীর পূজারতি ।
আর্য্যাবর্ত্তে দাক্ষিণাত্যে, উত্তরে দক্ষিণে দিকে দিকে
বিচিত্রগঠন কত মন্দির, কত দেবালয়
রয়েছে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার বছর ধরে !
বজ্র দিয়েছে ভেঙে কারুর সমুন্নত শীর্ষ
বহুবিস্তারী বটমূল বিদীর্ণ করেছে কারুর বক্ষ
বিধর্ম্মীর নির্ম্মম হস্ত নির্ম্মূল করেছে কত,—
তবু রয়েছে অটল, তুচ্ছ ক'রে
কালের ভ্রুকুটিকুটিল কটাক্ষ,—
ঝঞ্ঝাদৃঢ় মৌন সুগম্ভীর ।

(৮)

দেখেছি ভারতে,—তুষারমৌলি হিমাদ্রিবক্ষে
মার্ত্তণ্ড-মন্দির ;
দেখেছি বৃন্দাবনের কুঞ্জগলিতে, রাগরক্ত
গোবিন্দদেবের মন্দির ;
দেখেছি সমুদ্রপ্রান্তে হৃতসর্ব্বস্ব
সোমনাথ ;
পাষাণে পুষ্পখচিত খাজুরাহো ;

দেখেছি মুক্তারই মতো সুডৌল মুক্তেশ্বর ;
দেখেছি, দু'চোখ ভ'রে দেখেছি,—
মরুপ্রান্তরে প্রস্ফুটিত কেলিকদম্ব—
কোনারক।
দেখেছি দক্ষিণে অম্বরভেদী মাদুরার মন্দির গোপুরম
মহাবল্লীপুরে সপ্তরথমন্দিরগাত্রে
হরিণীর লীলাকৌতুক দৃষ্টি !

(৯)

দেখেছি মন্দিরে দেবাদিদেব মহাদেবের স্বাস্বরূপ
শিলালিঙ্গে,
দেখেছি আবার নটরাজ,—তাণ্ডবে যাঁর সৃষ্টি প্রলয়
দেখেছি কালী করালী নৃমুণ্ডমালিনী, মৃত্যু যাঁর
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ;
দেখেছি স্নিগ্ধকান্তি নবজলদশ্যাম কৃষ্ণমূর্তি,
বরাভয়দাতা প্রসন্ন-আনন বিষ্ণু
দিব্যতনু !
দেখেছি ভগবান তথাগত, জেতবনে
শিষ্যপরিবৃত, উপদেশদানরত।

(১০)

দেখেছি সকল দেবতা সকল দেবীর মন্দির
কিন্তু কোথাও দেখিনি ভারতে
বাণী-মন্দির।
বাক্‌রূপা বীণাপাণি,—সকল ভাবের, সকল জ্ঞানের
সকল রসের যিনি উৎস
তাঁর নেই কোনো মন্দির,

নেই কোনো আবাস-স্থল,
তিনি পূজা গ্রহণ করেন না অনধিকারীর।

(১১)

বাণীর মন্দির
ভক্তের বিকশিত হৃদয়-শতদলে;
'অতি-লঘুভার' সুকোমল পা দু'খানি তাঁর
তিনি রেখেছেন তারি মাঝখানে।
পূজা তাঁর রূপকারের তুলিকায়,
রস-স্রষ্টার সৃষ্টিতে,
ছন্দের বন্ধনে,
মুগ্ধনেত্রের দৃষ্টিতে
অপরূপের আরাধনায়।

(১২)

তবে আজ হোক সেই পূজা,
বাণীর সেই বন্দনা;
নতশিরে আজ বারম্বার
নমস্কার জানাই—
বাণীর মধ্যে সুন্দরের
পরম প্রকাশকে॥

ভয়াবহ

সুধীরকুমার চৌধুরী

জানি গো জানি আমার মাঝে আছে সে ভয়াবহ,
চলিতে সাথে জ্যোৎস্নারাতে যাহার কথা কহ।
উছল আঁখিজল
চকিতে চাহি' লুকালে তুমি, হাসিলে করি' ছল,
চরণ তব টলিয়া গেল, কণ্ঠ গেল কাঁপি',
বুকের কাছে শোণিত-স্রোত জুড়িল দাপাদাপি ;
দেখেছি সবই, পরাণ-পণে চেয়েছি বলি ডেকে ;
দেবতা হতে তুমি যে বড়, প্রিয় যে তাঁর থেকে,
আমারে তুমি ক'রো না ভয়।—হ'ল না কিছু বলা,
তোমার সাথে জ্যোৎস্নারাতে ফুরাল পথ-চলা।

আজিকে চাহি' নিজের মনে জানিনু চুপে চুপে
আছে যে সেথা ভয়াল কেহ দুর্ব্বিষহ রূপে।
গহন গুহাতলে
তাহারই শিরে মাণিক কিগো আলেয়া সম জলে ?
কাঁপে না আলো নিশাস-বায়, পড়ে না ঢাকা মেঘে।
অন্ধকারের গায়ে সে থাকে পাঁকের মত লেগে।
ভুলিতে বল, ভুলিতে চাহি, নিভাতে চাহি তারে,
প্রেতের চোখে চাহনি, পাতা ফেলিতে নাহি পারে।
তুহিন কার তন্দ্রা সেথা বুঝি গো দেবশাপে,
একটু যদি নড়ে সে কভু সঘনে ধরা কাঁপে।
চুনীর মত দুখানি চোখে জমানো কোন্ নেশা,
বুঝি গো তার অশ্রুজল শোণিত সাথে মেশা।
জানি গো জানি প্রিয়া,
দৃষ্টি তার ব্যাধের মত বেঁধে যে তব হিয়া।

কামনা তার ছড়ায়ে পড়ে বাতাসে হলাহলে,
তোমার প্রতি অঙ্গে সে যে জ্বালার মত জ্বলে।
নিশাস রুধি' মরিতে চাহে, জড়ায়ে পাকে পাকে
নিজেরে সে যে আড়াল রচি' লুপ্ত করি' রাখে ;
মরিয়া তার হয় না মরা,—পাতিয়া থাকে কান,
জ্যোৎস্নারাতে যখন তুমি বাঁশীতে তোল তান।

মরণ তার চেয়েছ শুধু, ভাবিয়া দেখনি ত,
তাহারও তরে দেহটি ভ'রে এনেছ অমৃত।
কেবল মুখে চাহি'
বুঝিতে সে ত পারে যে তার মরণ নাহি নাহি।
তোমারই মুখ চাহিয়া সে যে মরিতে নাহি পারে,
নিদয়া, তুমি সে কথা আজ ভুলো না একেবারে।
ওষ্ঠে তুলে বাঁশীটি তুমি দাও গো তারে ডাক,
দেবতা-শাপ কাটিয়া গিয়া চেতনা ফিরে পাক।
না হয় ধরা উঠিবে কেঁপে, যেও গো তাহা ভুলে,
হেরিয়া তার নাচন তব সমুখে দুলে দুলে।
হয়ত তব চরণ বেড়ি' উঠিবে ধীরে ধীরে,
মেখলা সম জড়ায়ে যাবে কটির তট ঘিরে।
তোমার দেহ ভরি'
শীতল তার পরশে নেবে সকল জ্বালা হরি।
মাথাটি যেথা রাখিতে চায় রাখিতে দিও তারে,
মরিবে যদি তোমারই মাঝে মরুক একেবারে।
বুকের 'পরে তাহার ভার হৃদয়-ভার সম
ক্ষণিক রহি' এলায়ে গেলে তখন নিরমম
আপন দেহে আগুন জেলে তাহারে তুমি দহ,
চলিতে সাথে জ্যোৎস্নারাতে আজি যে ভয়াবহ।

সোনার কপাট

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মাঠ মাকড়সা আর ইঁদুর
আলতামাখা-পা একমাথা সিঁদুর
এরা নিকট আত্মীয়।
আকাশ ঝরিয়ে দুচোখ ভরিয়ে আমায় দিয়ো
অনেক অনেক খুসির বুনুনি।
হে সূর্য, হে মৃৎপ্রদীপ
আর দুপুরের পুকুর, মাছ, ছিপ
আর নীপবন
আম্রকানন, মৃদুহাসিজ্বলা আনন,
হে দিন, হে রাত্রি,
হে কুরূপা পাত্রী,
তোমাদের সবাইকার
সম্বন্ধ নিকট। নমস্কার।

যেদিন জেনেছিলুম তোমাকে
যেন চকিত দেখা পেলুম ইন্দ্রধনুর বাঁকে
বিস্তীর্ণ রাজ্য।
ক্ষীরননীর দেহের ওপর পোষাক (চাকরের সাহায্য),
তার ওপরে মাথা
তারো ওপরে মুকুট, ছাতা,
শান্ত্রি, সেপাই :
হায়, শান্তি নেই, বিসর্জনী বেজেছে শানাই।

এই সব মরাকাঠের দেহে
চিড় ধরেছে, রঙ্ ফেটেছে, (কে হে !

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৮

বেস্থরো বক্‌ছো ?
তারার জ্যোৎস্নায় নিজেকে সেঁক্‌ছো ?)
ব্ল্যাক্-আউট দেখ্‌তে বেরিয়ো
মিসেস্ সেনকে সঙ্গে নিয়ো।
ভোঁতা সময় হয়তো স্বচ্ছন্দে কাট্‌বে
অনেক দিনের পুরানো মন অতীতকে চাট্‌বে !
তারপর ব্যাগি-ট্রাউজারে
পা ডুবিয়ে, বাহারে
সোফায় মেদের অস্বাস্থ্য
ঢেলো।   আর বোলো, "আমরাই আস্ত !"

আমার বসন্তে রঙ্ ধরেছে
আর কোনো মেয়ে এসিয়ার আকাশ জয় করেছে।
ভ্রমর তার চোখে,
জুতোর সোলে মৃত-প্রজাপতি।   নোখে
ক্যুটেক্স।
সাইকলজি আর সেক্স
আর সরু কোমর আর আধগজ সিল্কের
তিনটে ব্লাউজ দিয়ে আড্ডা বিকেলের।
    হে সূর্য, হে জলন্ত মাঠ,
আমায় পুড়িয়ে খোলো সোনার কপাট।

নির্মম যৌবন

বুদ্ধদেব বসু

যৌবন করে না ক্ষমা।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গীকারে করে মনোরমা
বিশ্বের নারীরে। অপরূপ উপহারে কখন সাজায়
বোঝাও না যায়।
তার সে-পসরা
কিছুতেই যায় না গোপন করা।
বারণ শোনে না,
বিচার করে না কিছু, দূর ক'রে দেয় সব ভেদ,
বিশ্বজয়ী এমন দুর্দান্ত সেনা
এমন নির্মম সাম্যবাদী
আর তো দেখিনে।
আসে পথ চিনে
প্রাসাদে কুটিরে মাঠে পল্লীর নিভৃতে
শহরের কুৎসিত বস্তিতে।
নিশ্চিত সে মৃত্যুর মতোই,
রক্ষা নেই তার হাতে, অমৃতে অথই
হবেই যে-কোনো নারী-দেহ
কোনো-একদিন। দয়া নেই, ক্ষমা নেই,
জীবনের কিছুকাল—নারী যে, সে রানিও হবেই।
এমনকি পথে-পথে বেড়ায় যে ভিখারিণী মেয়ে
আস্তাকুঁড়ে খাদ্যকণা খেয়ে,
অতি জীর্ণ জঘন্য মলিন যার বাস
তারেও ছাড়ে না
যৌবনের ক্ষমাহীন সেনা।
তারেও সুন্দর করে তারেও সাজায়,

পৌষ, ১৩৪৮

লজ্জা দেয়, ভঙ্গি দেয়, দেহ ভ'রে তোলে
লাবণ্য-হিল্লোলে।
বোঝে না যে এতই সে নিরুপায়
দেহ যত শুষ্ক হবে, যত মৃতপ্রায়
তত তার লাভ।
এই আবির্ভাবে
শুধু তার বিপদ বাড়াবে।
উচ্ছিষ্টের কণা
কুড়িয়ে পাওয়ায় যায় জীবনসাধনা
তারে কি মানায়
যৌবনের উন্মীলন কানায়-কানায়।
চায়নি সে, চায়নি সে, নিতান্তই ক্ষুন্নিবৃত্তি যার
সব চেয়ে বড়ো কাম্য, এ যে তার অসহ্য জঞ্জাল,
উপরন্তু বিড়ম্বনা।
দেহে যার আবরণ নেই, শয্যা যার পথের ঘৃণিত আবর্জনা
তার 'পরে এ কী অত্যাচার!
পশুতে পাখিতে গাছে ঘাসে
আনন্দিত পূর্ণতায় যৌবন বিকাশে,
হিরণ্ময় পাত্রে ঝরে সুবর্ণ মদিরা।
ওরাও যে সুন্দর আধার
তাই তো ওদের আছে জন্ম-অধিকার
যৌবনের জাদুকর-রূপান্তরে।
বিশ্ব ভ'রে চেয়ে দেখি সুন্দরের লীলা
এর মধ্যে ক্লেদাক্ত মাটির ভাঁড়
বিশ্বের কুৎসিত ক্ষত ঐ ভিখারিণী।
যার কিছু নেই, তার যৌবনেও নেই অধিকার
অতি সত্য এই কথা

তবু প্রতিদিন এর ঘটায় অন্যথা
নির্মম নিয়তি।
ভিখারিণী, সেও যে যুবতী
এ বেসুর, এ নিষ্ঠুর অসঙ্গতি
কেমনে সহিছে বিশ্বপ্রকৃতির বীণা
আমি তো বুঝি না।

ডেভিস্‌-এর দুটি কবিতা

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১

ঘরেতে আমার আপন যে আছে, তাকে
সব দিতে হয়—হয় তো বা কিছু বেশি।
কত সদিচ্ছা মেরে ফেলি নিজ হাতে,
দরোজার ধারে অতিথি দাঁড়ায়ে থাকে।
তবু উন্মুখ প্রতিটি হৃদয়বান্‌
প্রেত-মুহূর্ত্ত আজো নেমে আসে রাতে।

স্বার্থকঠিন কুমারীর বেঁচে থাকা
তার চেয়ে ভাল তপ্ত রুধির-স্নান
স্তনপানরত প্রণয়শিশুর বায়না।
জীবনকে মিছে ছলনার ভয়ে ঢাকা!
শতবার ভালো কৃতঘ্নতার দুঃখ
ভাঙা বিশ্বাসই উদার মনের আয়না।

২

প্রজ্ঞার মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর
নিঃসংশয় সত্য অপরিচিত।
নন্দনবন সহজেই গড়া যায়
সাপ-তাড়ানোর কষ্ট অপরিমিত।

একটি পুলক সৃষ্টি করা তো সোজা
তাকে ধরে' রাখা সব চেয়ে কাজ শক্ত।
পৃথিবী ছুটেছে শিকারী কুকুর যেন
প্রমাণ পেয়েছে যশের প্রেমের ভক্ত।
গোপনে রাখবো আমার হৃদয়ানন্দ
পরবো মুখোস শুধু দুশ্চিন্তার।
সুখের শশক তাড়নায় যারা ব্যস্ত
জানবে না মজা লুকিয়েছি তামাসার।

কালের ভুল

অমিয় চক্রবর্ত্তী

সোনার ধান মাঠে বলিষ্ঠ হাত হৈ হৈ বলদ ক্ষিধে চাষের ফল
চড়া রোদ্দুর ভরা রোদ্দুর মাটিতে জল

হঠাৎ ছায়া
ছায়া জমিদারের কায়া
তেতলায় বসে আছে কোথাও
ভয় পেয়ে ওঠে কাকেরাও

ভেবো না মিথ্যে ভেবো না ভরা জীবনের দিনে শকুনের কথা
সমস্ত আকাশের তুলনায় শকুন নেই ছিন্ন করো তার নখের তীব্রতা

যে-তীব্রতা বাঁচিয়ে রাখে দুর্বল জন্তু মৃত্যুভয়ের ছায়ায় যাকে করি শক্তিময়
তার মনস্ক ক্ষুধার চক্রান্তটা ছায়া তাকে পোড়াবার রোদ্দুর চাই মনের অভয়

মাঠী ভাই চাষী ভাই লাঠির চেয়ে হাতের এবং হাতের চেয়ে
নির্ভীক মন জোরালো
আর আস্‌বে সঙ্গে দুপুরের রোদে সংঘ-বাঁধা শক্তির আলো

দুপুরের রোদের কাছে তেতলার মাকড়শার ভূত নয় সত্য
একশ'মনের কাজ হৈ হৈ কাজ মেয়েরা মাঠে ঘরে শক্ত কাজ অব্যর্থ

বিকেলে গান উঠ্‌ল তার মধ্যে ভূতটার পালা নেই আছে রামায়ণ পাঠ
ভূতটা গল্পের স্বর্পনখা রাবণ তেম্‌নি লাল সেপাইঘেরা লুব্ধের ললাট

দেরি-কালের এই রাবণ তার হার হোক্ গল্পের
অন্তত সেই রামায়ণ রচবার ভার এল হৈ হৈ কাজ ভূত-তাড়ানো কল্পের ॥

কোরাস

জীবনানন্দ দাশ

গম্ভীর নিপট মূর্ত্তি সমুদ্রের পারে
এখনো দাঁড়ায়ে আছে।
সূর্য্যের আলোয় সব উদ্ভাসিত পাখি
আসে তার কাছে।
জান না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার ফলায় খেয়েছে ঘানিগাছে।

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৮

হে চিল, চিলের গান জ্যৈষ্ঠের দুপুরে,
হে মাছি, মাছির গান,
সমুদ্রের পারে এক শব্দহীন মূর্ত্তির বিরাম;
আর সব শাদা পাখি সূর্য্যের সন্তান।
জান না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

আলোর ভিতর দিয়ে হেঁটে চ'লে যাবার কৌশল
কেবলি আয়ত্ত ক'রে নিতে চায় পৃথিবীর উৎকন্ঠিত ভিড়
সৈকতে পাখিদের বরফের মত শাদা ডানা
সূর্য্যের পাকস্থলীর।
জান না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

কেবলি পায়ের নিচে বালির ভিতরে
উঠে আসে পারাপার-প্রত্যাখ্যাত হাড়;
কালো দস্তানায় যেন সমর্পিত, অব্যক্ত হাত—
তাদের দেখায় কিমাকার।

গম্ভীর নিপট মূর্ত্তি সমুদ্রের পারে
এখনো দাঁড়ায়ে আছে।
সূর্য্যের আলোয় সব উদ্ভাসিত পাখি
আসে তার কাছে।
জান না কি চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে বলদ তার জুড়িকে চেখেছে ঘানিগাছে।

অজ্ঞাতবাস

বিষ্ণু দে

(শান্তিনিকেতনপ্রবাসী কামাক্ষীপ্রসাদকে)

হৃদয়ে থামে না আর ভিড়,
হাজার ভয়ের পায়ে পায়ে
তোলপাড় অরণ্য নিবিড়
আঁধার সঙ্কুল, আসে যায়
সত্তার গভীরে লাগে চিড়।

বাংলোয় অজ্ঞাত প্রবাসে
ভিড় ক'রে তারা যায় আসে।
নিঃসঙ্গের নিরাশার ভয়
বিশ্বের ব্যক্তির লয়ে
স্বপ্নের ইসারায় ভাসে।

চাই তবু দূরাহত আশা,
ভয়হীন নির্মাণের ভাষা।
নিদ্রাহীন দুঃস্বপ্নের ভিড়ে
বাংলোয় দিন গুনে' গুনে'
দেখে যাই বালুনদী তীরে

প্রান্তরের অশ্বত্থের প্রাণ
ঊর্দ্ধমুখ, লীলায়িত ভাষা
বারে বারে পায় সে ফাল্গুনে,
শিকড়ে শিকড়ে তোলে গান।
মৃত্তিকার দুর্মর প্রাণ।

সমাজের সমে কাটে গান,
দেশে দেশে থেমে যায় মীড়।
সত্তার গভীরে লাগে চিড়।
মরুদেশে বিড়ম্বিত নীড়,
হে আমার তেপান্তর প্রাণ॥

গুপ্তচিত্র

মণীন্দ্র রায়

চক্রাকার পক্ষচ্ছায়া ফাটামাঠে ঘুরে, চৈত্রের
দুপুরের পানাভরা শীতল পুকুরে ডুবাল তৃষার্ত্ত ঠোঁট
তার। হ'ল হায় সীমাশূন্তে শূন্য জিজ্ঞাসার॥

জলের দর্পণে আঁকা গ্রাম্য ছবি যত, জীবন্ত
হ'য়েছে ক্রমে প্রাত্যহিক সংসারের মত। দেখেছে
অনেক দুঃখ রুক্ষদিনে বধূদের ক্ষুধিত বাসনে,
চাষীদের মাঠফেরা সান্ধ্যপ্রক্ষালনে, পরস্পর
কুশলসম্ভাষে। তারি বুকে ভাসে অজন্মার হাড়জ্বলা
ছাপ,—সে-বছর পাঁচছেলে মেয়ে বউ খাওয়াতে
না-পেরে, জীবনের চালে গিয়ে হেরে, মেধো হাড়ী
চুকাতে সন্তাপ তারি তলে খুঁজেছে আশ্রয়।
তারি তলে অবরুদ্ধ রয় ডোমেদের সুশীলার ভাতজোটা
মাতৃত্বের অসমাপ্ত ক্ষুধার কুসুম।—আশ্চর্য্য ঘটনা
সব এ পুকুরে র'য়েছে নিঝুম॥

উত্তর পেয়েছে জিজ্ঞাসার। পাখী হ'ল উড্ডীন
আবার। পেয়েছে উত্তর,—প্রশ্ন ফেরে মাটির ভিতর।
মাটির গহনে আছে অঙ্কুরিত সহস্র উত্তর। পাখী
হ'ল আকাশে উধাও,—ফি'রে এল মাটির ভিতর॥

তারপর বিদীর্ণ পাথর। কুঠার ফিরেছে বৃথা যার
ঘন নিষেধের দ্বারে, সে কেঁদেছে আজ হাহাকারে অঙ্কুরের
আঙুলছোঁওয়ায়। জীবনের সাড়া ওঠে পল্লবিত শ্যামল
ধারায়॥

পাখী তার ফিরে গেল নীড়। পুকুরের সকল
শরীর আকাশের নীলে নীলে প্রখর নিবিড়। ছবি
ওঠে নবপৃথিবীর। বর্ণনা হ'ল না তার,—কাজ শেষ
হয়নি' চিত্রীর॥

আধুনিক বাংলা কবিতা

কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের সংকলিত আধুনিক বাংলা কবিতা পাওয়া গেল। ভয় ছিল যা কিছু বিকলাঙ্গ বিকৃত যা কিছু প্রকৃতির আবর্জনা সেইগুলিকে ঝেঁটিয়ে একত্র করে তার উপরে বাঁকা দুর্বোধ্য রেখার ছাপ দিয়ে দুর্ভাগ্য সাধারণের সামনে উপস্থিত করবে, ভুলিয়ে নিয়ে যাবে তাকে মানবের চিরন্তন রুচি ও রীতির রাজপথ থেকে। আমার ক্ষীণ দৃষ্টি ও ভাঙা শরীরে এই জটিল দুর্গমে প্রবেশ করতে ভয় পাই। কিন্তু তোমাদের এই সংকলন দেখে আনন্দিত ও আশ্বস্ত হয়েছি। প্রায় সবগুলিই বিশেষভাবে উপভোগ্য। এই সর্বকালীন কবিতাগুলিকে কেন তোমরা আধুনিকের কোঠায় ফেলেছ তার একটা ব্যাখ্যার দরকার। সম্ভবত ভূমিকায় তার আলোচনা আছে। ভাঙা দৃষ্টি যেন ভাঙা লাঙল, লাইনগুলোকে জোরে ঠেলা দিয়ে দিয়ে চাষ চালাতে হয়। কোনো একটা অবকাশে ভূমিকা পড়ে দেখব। আমার শ্রুতিশক্তিও তার দরজার একটা পাল্লা বন্ধ করেছে, তাই আর কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নেওয়াও আমার পক্ষে সহজ নয়।

সংকলনকর্তার কাছে আমার একটা কৃতজ্ঞতা নিবেদন করবার আছে। দীর্ঘকাল হোলো শিশুতীর্থ বলে একটি গদ্য ছন্দের রচনা বানিয়েছিলেম। আজ পর্যন্ত সেটা কারো যে চোখে পড়েছে তার কোনো প্রমাণ পাইনি। তোমরা যে সেই কক্ষচ্যুত পথহারাকে অখ্যাতি থেকে উদ্ধার করেছ এতে খুশি হয়েছি।

একটা ঘটনার উল্লেখ করে চিঠিখানা শেষ করি। সার মরিস গোইয়ার ইতিমধ্যে যখন এখানে এসেছিলেন আমি কথাপ্রসঙ্গে

বলেছিলেম তাঁদের আধুনিক কবিতা অতি বিশেষ ভঙ্গিমার বেড়া দেওয়া সাহিত্য, সে কেবল বিশেষ দলের জন্য রিজার্ভ করা। তিনি হেসে বললেন সর্বজনীনতার দিন সাহিত্যে আবার ফিরবে।

এর কিছু কিছু লক্ষণ এখনি সেখানকার জনমতের মধ্যে দেখা দিচ্চে। তাহলে সেই হাওয়া বাংলা সাহিত্যে এসে প্রবেশ করবে এই আশা মনে পোষণ করি।

আধুনিক বাংলা কবিতা বইখানি সর্বসাধারণের সমাদরের যোগ্য এই আমার অভিমত। ইতি ২০।৮।৪০

রবীন্দ্রনাথ

---

* আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" নামক সংকলনগ্রন্থ সম্বন্ধে কবির এই পত্র বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত করা হোলো। পত্রখানি বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত।

স মা লো চ না

গল্প-সংগ্রহ, প্রমথ চৌধুরী। বিশ্বভারতী

শুনেছি নাকি পৃথিবীর কোন জিনিষেরই একটা নিবদ্ধ রূপ নেই, দৃষ্টির ভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গে সবই কলেবর ধারণ করে। তাই যদি হয় তবে আমরা প্রমথ বাবুর জগৎ সংসার দেখ্‌বার দেব-দুর্লভ চশ্‌মাখানা চাই। কারণ তিনি চোখে দেখাটাকে এক অপরূপ চারু-শিল্পে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর গল্প-সংগ্রহখানা পড়ে বারংবার মনে হয়েছে যে এ কথা সত্য নয় যে তাঁর কাহিনীর মন-গড়া রাজ্যে আমাদের এই প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার ধূলোমাখা পা জোড়াটাকে রাখবার স্থানাভাব হবে। বরং তাঁর অপরূপ কল্পনার বিস্ময়ই হচ্ছে যে আমাদের স্থূল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনেও সে নিরাকার হ'য়ে যায় না।

এটাই হ'ল সব থেকে আশ্চর্য্য যে এমন লেখনী, যা'র বিষয়ে ব'লে আর শেষ করা যায় না, সেই সবুজপত্রের যুগ থেকে আজ অবধি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এবং আরও দু'একটা ভূমিকা ও মুখপত্র জাতীয় পরিচিতি ছাড়া তার সম্বন্ধে পূর্ণাবয়ব প্রবন্ধ বিশেষ কিছু লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ আমাদের এই বহু-গর্ব্ব-করা নৈর্বক্তিক ইন্‌টেলেক্‌চুয়েলিজম্‌-এর এমন চূড়ামণি আর কোথায় পাওয়া যাবে? এই সত্তর বছরের গুণীর চেয়ে আধুনিক আর কেবা আছে। ছোটগল্প লেখা সহজ নয়, তার জন্য এমন দৃষ্টিনৈপুণ্য চাই যা' সহসা সূর্য্যকরাঘাতের মতন ছোট ছায়ামগ্ন পুষ্করিণীকে উদ্ভাসিত ক'রে দেয়। প্রমথবাবুর আছে সেই দৃষ্টি। বিলেত সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেকেই গল্প লিখেছেন। প্রমথবাবুও লিখেছেন। কিন্তু তাঁর গুলি পড়ে একবারও মনে হয় না যে বিলেত এবং বিলেতফেরত বাঙালীদের মধ্যে এমন একটা নিগূঢ় ষড়যন্ত্র আছে, যা আমাদের মতন বঞ্চিত ও হতভাগ্য পাঠকদের বোধের বাইরে। তাঁর গল্পগুলি নিতান্তই একজন বিলেত-প্রবাসী বাঙালী ছাত্রের বিষয়ে, যা'র অভিজ্ঞতাগুলি অভাবনীয় হলেও অসম্ভব নয়। আর যার অপূর্ব্ব অ্যাডভেঞ্চারগুলি রাত্রিশেষের স্বপ্নের মতন দুষ্প্রাপ্য এবং মধুময়। Blase না হ'য়েও যে আধুনিক হওয়া যায় তার আর অন্য কোনও নিদর্শনের প্রয়োজন নেই।

তবে প্রমথবাবুর এই সহজিয়াভাবের অন্তরালে আছে বহু সাধনা। ঐ যে অপরূপ চশমাখানা, যাকে আমরা সকলেই ঈর্ষ্যান্বিত নেত্রে দেখি, ওটি নিয়ে উনি জন্মেছিলেন কিনা সন্দেহ। বহু শিক্ষা, বহু চিন্তা, বহু অভিজ্ঞতার পর, এবং পৃথিবীর সমুদয় সাহিত্য সমুদ্র আমন্থন ক'রে তবে ওটি লাভ করেছেন

ব'লে সন্দেহ হয়। কারণ তাঁরাই কেবল আত্মকে হারিয়ে পৃথিবীর দর্শক হন, যাঁদের শুধু চোখ নেই, সেই চোখ দিয়ে দেখবার মন্ত্র জানা আছে; যারা তাঁদের আবেষ্টনী থেকে রূপ নেন না, কিন্তু যাঁদের মন থেকে আবেষ্টনীতে রং ধ'রে যায়। "চার-ইয়ারী-কথা" থেকে একটু উদ্ধৃত ক'রে দিই—"সে দেশ ইউরোপ, যে দেশ তুমি আমি চোখে দেখে এসেছি সে ইউরোপ নয়—কিন্তু সেই কবি-কল্পিত রাজ্য, যার পরিচয় আমি ইউরোপীয় সাহিত্যে লাভ করেছিলুম।...আমি উপরের দিকে চেয়ে দেখি আকাশ জুড়ে হাজার হাজার জ্যাস্‌মিন্ হথর্ন প্রভৃতি স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠছে, ঝরে পড়ছে, চারিদিকে সাদা ফুলের বৃষ্টি হচ্ছে···।" সর্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে এই শুভ্র আকাশ কুসুমের মৃদু সুগন্ধ, তাতে ঘরোয়া ব্যাপারও রোমাঞ্চকর হয়ে গেছে, সাধারণ ঘটনাতেও অভাবনীয়ের ইঙ্গিত লেগে রয়েছে।

প্রমথবাবুর গল্পগুলি পড়ে মনে হয় যে এ সকল ঘটনা আমাদের জীবনে হ'তে পারত; কিন্তু এত আশ্চর্য্য কাহিনী যে আমাদের জীবনে তা' কখনও হবে না। এমন কি উপস্থিতবুদ্ধি ঘোষালের ও মিথ্যাপরায়ণ নীল-লোহিতের জীবনেও এমন কোন ঘটনা ঘটে নি যা' আমাদেরও জীবনেও ঘটতে পারতো না, যদি আমরা তেমন সৌভাগ্য নিয়ে জন্মাতাম! এ সমস্ত কাহিনী প্রাণ থেকে নৈরাশ্যের মেঘকে কাটিয়ে দেয়, শুধু বেঁচে থাকাটাকে অপূর্ব্ব সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ক'রে দেয়। ছদ্মবেশী নীল-লোহিতের সয়ম্বর-সভায় উপস্থিতি, এবং মিস্ বিশ্বাসের পশ্চাতে সালঙ্করা সুন্দরীদ্বারা মাল্যদান, সুন্দরীর পিতার রোষ, নীল-লোহিতের আত্মপরিচয়, মিথ্যাবাক্য ও প্রত্যাখ্যান—এ সমস্তই এমন স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত যে আমাদেরই বা অমন না হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু এমন অপরূপ যে পথেঘাটে অমন ঘটনা মেলে না, তাই আমাদের জীবনে কখনও ঘটবে না। এই সম্ভব অসম্ভবের সমাবেশটি আমাদের মনোহরণ করে।

প্রমথবাবুর গল্পের কেবল এই অপরূপ দিকটা দেখতে গেলে তাঁর উপর অবিচার করা হবে। কারণ যদিও আমার মনে হয় এই মাটিতে প্রতিষ্ঠান করা আদর্শবাদটাই বিশেষ ক'রে তাঁর গল্পগুলিকে আর সকলের গল্প থেকে পৃথক করে দিয়েছে, তবু তাঁর গল্পসংগ্রহখানা পড়লে তাঁর কল্পনার বিস্তৃতি ও কাহিনীর বৈচিত্র্য দেখলে বাক্যহত হ'তে হয়। "নীললোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলার" রাষ্ট্রনীতি, "বড়বাবুর বড়দিনের" হতাশ-প্রেম, "ঝাঁপান-খেলার" অপূর্ব্ব চিত্র, "বীণা-বাই"-এর জীবন কাহিনী, "জুড়ী-দৃশ্যের" ট্র্যাজেডি এবং প্রত্যেকটি অলৌকিক কাহিনীর গোপন অশ্রুপাত, কোনটির সঙ্গে কোনটির বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই, কিন্তু প্রত্যেকটিই প্রমথবাবুর আশ্চর্য্য সুরুচির দৃষ্টান্ত। ঠিক কতখানি গ্রহণ করতে হ'বে আর কোনখান থেকে নির্দ্দয়ভাবে

পরিত্যাগ করতে হ'বে এমন আর কে জানে। "জুড়ি-দৃশ্যের" তিন জুড়ির উত্তর-কাহিনী জানবার জন্য আমরা আগ্রহে অধীর হই, কিন্তু প্রমথবাবু আমাদের সম্পূর্ণতার অন্তিম-ভাবটা থেকে উদ্ধার করে রাখেন।

কোনখানেও একটুখানি উচ্ছ্বাস নেই; রচনার মধ্যে হাস্যরস আছে, করুণ রস আছে, বীভৎস রসও আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সকল শিল্পের মূলমন্ত্র যে স্থির সংযম তা'ও আছে। হাস্যকর না হয়েও যে গল্প সম্ভ্রান্ত হ'তে পারে, স্বাভাবিক কাহিনী সরলভাষায় লেখা হ'লেও যে অক্ষরে অক্ষরে অভিজাত সভ্যতার ছাপ রাখতে পারে, এ বিষয়ে প্রমথবাবুর গল্প পড়লে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। কোথায় যেন পড়েছিলুম যে সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পের উদ্ভাবনা হ'বে স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু প্রকাশ হ'বে বহু চেষ্টা ও সাধনার ফলে; এগুলি সে কথারও নিদর্শন। এই সংক্রান্তে দুটি গল্প পড়তে সকলকে অনুরোধ করি, "ঝাঁপান-খেলা" ও "বীণাবাই"। এমন অপূর্ব্ব কাহিনী পৃথিবীর যে-কোন ভাষায় দুর্লভ। "ঝাঁপান-খেলা" ঘরোয়া গল্প, নায়ক বীরবল, কুকুর দেখবার ভৃত্য, পরম রূপবান, কালো পাথরে খোদাই করা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির মতন দেখতে, পরস্ত্রীহরণপটু, চতুর, মনোহর। রাত্রে সে গোপনে ঝাঁপান খেলতে গেল। যেদিন বেহুলা ইন্দ্রের সভায় নেচে লখিন্দরকে বাঁচিয়েছিল সেইদিন এই খেলা খেলতে হয়, কিন্তু এ খেলা বে-আইনী, তাই গোপনে খেলতে হয়। সাপের বিষদাঁত না ভেঙে এই খেলা খেলতে হয়, প্রায়ই এক আধজন মারা যায়। বীরবলের মনের মতন খেলা। কিন্তু ঐ সাপের কামড়েই বীরবল মরলো। নৈপুণ্যের অভাবে নয়, আরেকজনকে বাঁচাতে গিয়ে। সকালবেলা তা'র আদরের মুনিবপুত্র গিয়ে দেখল তা'র জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়েছে, তার দেহ নীলবর্ণ ধারণ করেছে, সে চোখ খুলে বালকের দিকে চেয়ে বল্লে—"হাম চল্‌তা, কুচ ডর নেই।" এই বলে সে মরে গেল, আর মুনিবপুত্র দেখলো "সেই দেহ, সেই রূপ, সবই রয়েছে, চলে গিয়েছে শুধু বীরবল।" এমন অপূর্ব্ব চলে যাওয়া কে কল্পনা করতে পারতো।

আর বীণাবাই-এর উপাখ্যানও সেই প্রাচীন গৃহত্যাগিনী কন্যার উপাখ্যান, কিন্তু এইরকম অপূর্ব্ব তেজস্বিনী গৃহত্যাগিনী তো আর কোথাও দেখি নি; আর অবশেষে বীণাবাইও অন্তর্হিতা হলেন, এবং নায়কও সেই অবধি জীবন নামক নৈয়া ঝাঁঝরিতে ভেসে বেড়াতে লাগলেন।

আমাদের চিরক্ষুধাতুর মনটা এই সসাগরা ধরণীটাকে নিয়েও তৃপ্ত হয় না, নিয়ত নব নব রাজ্য কামনা ক'রে থাকে, তাই অলৌকিকএর স্থান হয়েছে সাহিত্য। কিন্তু আজকাল আমরা ভূতের গল্প শুনে ভয়ে সম্বিৎ হারাতে চাই না, অলৌকিকের অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য প্রকাশ দেখে রোমাঞ্চিত

হ'তে চাই; যে বিষয়ে কেহই কিছু জানে না, তার স্বরূপের শিহরণ চাই। কবন্ধ পিশাচ দেখতে চাই না, তাই প্রমথবাবু দেখিয়েছেন গভীর নিশীথে, নির্জ্জন পান্থশালায় শঙ্খপরিহিতা কষ্টিপাথরে তৈরী সুন্দরী। আর দেখিয়েছেন রক্তবস্ত্রপরিহিত, চন্দনঅঙ্কিতভালে, ছোট শিশু নদীর বক্ষে তামার ঘড়ার উপর উপবিষ্ট। ইংরিজিতে একটা কথা আছে "charm", যার ভালো বাংলা হয় না; আর বাংলায় একটা কথা আছে "রস", যার ভালো ইংরিজি হয় না। প্রমথবাবুর গল্পের মধ্যে এই দুইটিই আছে, আর এরা সাধারণকে অসাধারণ করে দিয়েছে, স্বাভাবিক ঘটনার আশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে।

প্রমথবাবুর গল্পসংগ্রহের কাহিনীগুলির এত বৈচিত্র্য যে তার থেকে যদি কোন একটি moral বের করতে হয়, সে হচ্ছে যে বেঁচে থাকা একটি চারু-শিল্প। জগতে যে জিনিষকে আমরা মনে মনে যা মূল্য দিই, আমাদের কাছে তৎক্ষণাৎ সেইটাই তা'র প্রকৃত মূল্য হয়ে যায়। উপভোগ করবার মন্ত্র না জানা থাকলে, নির্জ্জন কক্ষের বর্ষাসন্ধ্যা, আর খররৌদ্রে জনহীন মাঠের মধ্যে দিয়ে পাল্কী যাত্রা, রেলগাড়ীর আশ্চর্য্য সহযাত্রীরা আর হঠাৎ-দেখা-পাওয়া সুরাট-সুন্দরীর সঙ্গ সমস্তই অর্থহীন হয়ে যায়। ঠিক এই সময়ে, এবং আমাদের বাংলাদেশে, এই শিক্ষাটির প্রয়োজনও ছিলো। আরও শেখবার প্রয়োজন ছিলো প্রমথবাবুর সব কথার পিছনে একটা মৃদু হাস্য গোপন রাখবার উপায়টি। তাঁর চলিত অথচ সুমার্জ্জিত বাংলার প্রশংসা অনেকেই করেছেন, কিন্তু তাঁর কোমল উপহাসটুকু অনেকের নজর এড়িয়ে গেছে। মানুষের দুর্ব্বলতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়েও, তাকে একটু লজ্জা দিয়ে, একটু হাসিয়ে এমন অপ্রস্তুত করতে ডিকেন্স ছাড়া আর কেউ পেরেছেন বলে মনে পড়ছে না।

আর ভালো লেগেছে আমাদের গল্পের মধ্যে অমন সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট, সহজ, সরস, সুচতুর কথোপকথনগুলি, যেন অনেকগুলি প্রমথবাবু অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে রসিকতা করছেন। কারণ বর্ত্তমান জীবনের বৃহত্তম ট্রাজেডি হচ্ছে, যদি বা রস-সৃষ্টি করবার লোক মিললো, রস নিবেদন করবার পাত্র মেলা দায়। আর প্রমথবাবু গল্পের পর গল্পে একটি নয়, একজোড়া নয়, চারটি পাঁচটি ক'রে এক সঙ্গে এ হেন রত্ন উপস্থিত করেছেন।

প্রমথবাবুর বর্ণনা করবার আশ্চর্য্য ক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপ "চার ইয়ারী কথার" সোমনাথের কথা থেকে একটুখানি উদ্ধৃত করি। প্রেমের কাহিনীর কেমন সরস সুন্দর অবতারণা হচ্ছে—"একবার লণ্ডনে আমি মাস খানেক ধরে অনিদ্রায় ভুগছিলুম। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন Ilfracombe যেতে। শুনলুম ইংলণ্ডের পশ্চিম সমুদ্রের হাওয়া লোকের চোখে মুখে হাত বুলিয়ে

দেয়, চুলের ভিতর বিলি কেটে দেয়; সে হাওয়ার স্পর্শে জেগে থাকাই কঠিন—ঘুমিয়ে পড়া সহজ। আমি সেই দিনই Ilfracombe যাত্রা করলুম। এই যাত্রাই আমাকে জীবনের একটি অজানা দেশে পৌঁছে দিলে।"

তারপর সুন্দরীর কথা বলতে বলছেন—"আমি নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে, সে চোখ দুটি লউসনিয়া দিয়ে গড়া। লউসনিয়া কি পদার্থ জান? একরকম রত্ন—ইংরেজীতে যাকে বলে Cats-eye, তার উপর আলোর সুত পড়ে, আর প্রতিমুহূর্ত্তে তার রং বদলে যায়। আমি একটু পরেই চোখ ফিরিয়ে নিলুম, ভয় হল সে আলো পাছে সত্যি-সত্যিই আমার চোখের ভিতর দিয়ে বুকের ভিতর প্রবেশ করে।"

এমন পরিপূর্ণ রসের ভাণ্ড আমাদের উত্তরাধিকার বলে যুগযুগ ধ'রে, যতদিন বাংলা ভাষা মানুষে পড়বে, ততদিন আমরা গর্ব্ব করব।

লীলা মজুমদার

উত্তরফাল্গুনী। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পরিচয় প্রেস।

দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি বোধ হয় মহৎ কবিতা রচনার অন্তরায়। এ মহত্ত্বের অনেকগুলি বিশেষত্বের মধ্যে একটির অভাব সহজেই আজকালকার লেখায় চোখে পড়ে। আগেকার কবিদের সঙ্গে অধিকাংশের একটি অদৃশ্য যোগসূত্র ছিল। সে যোগসূত্র নানা কারণে এখন ছিন্ন। সমাজে দুর্দিন আগত, এবং দুর্দিনে লেখকেরা গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয়প্রয়াসী হন। সেটা হয়ত স্বাভাবিক, এবং সে ক্ষেত্রে তাঁদের কাপুরুষ কিম্বা পাতিবুর্জোয়া বলে সম্বোধন করলেই শেষ কথা বলা হয় না। বিক্ষোভের যুগে narrow strictness এর চর্চা অনেকেই করছেন, এবং চর্চাটা কিছু পরিমাণে ফলপ্রসূ। তবে এ চর্চার জের টানতে থাকলে অবক্ষয়ের অনেক লক্ষণ নির্ঘাৎ প্রকাশ পায়। তখন লক্ষণগুলিকে স্থান, কাল, পাত্রের রূপ নির্দেশক হিসেবে নেওয়াই ভালো, সাহিত্যের মূল্য বিচারের শেষ সামাজিক মাপ-কাঠি হয়ত তারা, কিন্তু সে মাপকাঠি প্রয়োগ করার সময় নির্ণয় করা কঠিন, এবং প্রয়োগকর্ত্তাদের যোগ্যতাও বিচার্য। ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে decadent সাহিত্য অনেক সময় ভবিষ্যৎ রচনার পথ নির্দেশক হয়েছে। এ ঘটনার উল্লেখ করে আমরা বলতে পারি যে, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অবক্ষয়ের অনেক লক্ষণ বর্ত্তমান, কিন্তু তাঁর কবিপ্রতিভা অনস্বীকার্য।

সুধীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট জীবনদর্শন আছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইতিহাস কম্বুরেখায় চলে না, চক্রবৎ ঘোরে। সেজন্য প্রগতির কল্পনা তাঁর

কাছে অর্বাচীন ঠেকে। তাঁর মতে প্রগতি আর প্রলয়ের মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই। অতীতের ঐতিহ্যে তাঁর আসক্তি বেশী। এ বিশ্বাস ও মনোবৃত্তি সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাকে কাব্য হিসেবে সার্থক করেছে, কিন্তু তাঁর অধুনাতন রচনায় কয়েকটি বিপদজ্জনক লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর বিশ্বাসের দার্শনিক মূল্য হয়ত থাকতে পারে, সেটার বিচার বর্ত্তমান সমালোচকের আয়ত্তের বাইরে, কিন্তু এটা ঠিক যে বিশ্বাসকে কাব্যের পর্য্যায়ে আনতে গেলে দার্শনিকতা ছাড়া অন্য আরো কিছুর প্রয়োজন আছে। কাব্যে বিশ্বাসের নাটকীয় প্রকাশ আবশ্যক, ঘাত প্রতিঘাতের ভিত্তিতে নাটকীয় রূপ ধারণ করলে ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের কাব্যশক্তি প্রমাণিত হয়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের বিশ্বাস সম্প্রতি obsession এ পরিণত, এবং বিশ্বাস যখন আবেগে পরিণত হয় তখন তার কাব্যশক্তি কমে আসে, শেষ পর্যন্ত লেখক একটি বিষণ্ন গোলকধাঁধাঁয় প্রবেশ করেন, যেখানে মহৎ সত্যের সাক্ষাৎ মেলে না, যেখানে দেখি শুধু নিঃস্ব রোমন্থক কাল আপনাকে পরিপাক করতে ব্যস্ত। মুদ্রাদোষ পুনরাবৃত্তির বিষচক্রে লেখা তখন ভারাক্রান্ত হয়। অবশ্য এ কথা আগেই বলেছি সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা তাঁর দর্শনের ভিত্তিতে শক্তিমান, কিন্তু দর্শন সেখানে পরোক্ষভাবে আছে। "উত্তরফাল্গুনী"র প্রথম কবিতা উৎকৃষ্ট, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমে বিশ্বাস ছিল কাল বৈনাশিক বটে, কিন্তু স্বরূপে বিশ্বাসী, তাই কালের গুহাচিত্রে মৃৎপ্রদীপপরম্পরা নিবাত নিষ্কম্প দীপ্তি শেষ পর্যন্ত পারে। কিন্তু

> অনেক শতাব্দী কাটে। প্রকীর্ত্তিত সে-কন্দরে ক্রমে
> বাদুড় বানায় বাসা; কালপেঁচা আনাচে কানাচে
> ইঁদুরের ধ্যান করে; কোণে কোণে অর্দ্ধভুক্ত শব
> লুকায় হিসাবী শিবা; ভূমিসাৎ বিগ্রহের কাছে
> মহীলতা জোট বাঁধে; মধ্যে মধ্যে তুষ্ট জরদ্গব
> জুড়ায় অন্নের জ্বালা কণ্টকিত দ্বারদেশে ব'সে।
> তাদের পুরীষে, ক্লেদে অতীতের সার্থক প্রতীক
> চাপা পড়ে নিরন্তর; নোনা লেগে চূর্ণলেপ খসে
> হাসে অস্থিসার শিরা। সুখশ্রান্ত ধনী নাগরিক
> ক্বচিত সদলবলে আসে বনভোজনে সেখানে
> পণ্যস্ত্রীর হাত ধরে, আহারান্তে রংমশাল জ্বেলে
> ভিত্তিগাত্রে চেয়ে থাকে, কলঙ্কিত কবন্ধ যেখানে
> দলে বৈদেহীর উরু; ছেঁড়া পাতা, ভাঙা টিন্ ফেলে
> সায়াহ্নে শহরে ফেরে। প্রদোষের নির্বেদ বাড়ায়
> বিক্ষিপ্ত অঙ্গার, ভস্ম, অতিক্রান্ত উৎসবের গ্লানি।

এ বর্ণনায় একটি সভ্যতার জরা ও মৃত্যু আমাদের চোখের সামনে ভাসে। শেষ কবিতা 'প্রতিপদ'-এর তুলনা আমাদের সাহিত্যে বিরল।

পৌষ, ১৩৪৮

সুধীন্দ্রনাথের কল্পনায় একটি দুর্লভ প্রসার আছে। রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্ব্বে আরব বেদুইনের রোমান্টিক মরুভূমি দেখেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন

শতভ্রের মরুভূমি—সম্মার্জ্জিত সন্তপ্ত সিমুমে;
বন্ধ্যা ফনিমনসায় কণ্টকিত বিবাক্ত ধূসর

দুটি মরুভূমির মধ্যে একটি যুগের ব্যবধান আছে।

সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা, কয়েকটি ছাড়া, আমার বিশেষ ভালো লাগে না, সেটা বোধ হয় আমার অক্ষমতা। এ ধরণের রচনা—

এ-ভুজ মাঝে হাজার রূপবতী
আচম্বিতে প্রসাদ হারায়েছে';
অমরা হতে দেবীরা সুধা এনে,
গরল নিয়ে নরকে চলে গেছে॥

আমার অনুরাগ আকর্ষণ করে না। প্রেমের সঙ্গে দার্শনিকতার সংমিশ্রণ সহজে ঘটে না, সেটার অতি চেষ্টা একটু হাস্যকর হয়, শেলী থেকে লরেন্স তার নিদর্শন। সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য আধুনিক কবি, তিনি তাঁর দার্শনিক ব্যর্থতাবোধের সমর্থন খুঁজেছেন প্রেমিকের ব্যর্থতাবোধে, কিন্তু তাঁর এ ধরণের অনেক রচনায় আত্মকরুণার আভাষ আছে। অবশ্য তাঁর প্রেমের কবিতার মধ্যে অনেক আশ্চর্য লাইন আছে। তিনি এ ধরণের রোমান্টিক বিষণ্ণতা সহজে কবিতায় আন্‌তে পারেন।

হেমন্তের ঊর্দ্ধশ্বাস সাঁঝে
উদ্ভ্রান্ত কালের পায়ে ঝিল্লীর মঞ্জীর যবে বাজে
আচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তে, পরিব্যাপ্ত মৃত্যুর ছায়ায়
আগন্তুক তমস্বিনী আপনারে অচিরে হারায়,

আবার তিনি স্বচ্ছন্দে বৈজ্ঞানিক রূপকের সাহায্যে লেখেন;

তোমার সান্নিধ্যে তাই বসে থাকি আমি মৌনপ্রায়
সৌজন্যের ঘটাটোপে আপনাকে পাকে পাকে ঘিরে;
যে দিকে তাকাই দেখি নিরাশ্বাস বুদ্ধির তিমিরে
মোদের বিয়োগধর্ম্মী চৈতন্যের চক্রচর কণা
স্বতন্ত্র আলার কক্ষে নিরুপায় করে আনাগোনা।

সুধীন্দ্রনাথের রচনায় অপরিচিত শব্দের প্রাচুর্য্য দেখে অনেকে বিরক্ত হন, ভাবেন ও বলেন এটা অহেতুক পাণ্ডিত্য। এ সূত্রে মনে রাখা দরকার যে বাংলার কাব্যভাষা এতো একঘেয়ে হয়ে এসেছিল যে নতুন ভাবের ভারগ্রহণে অনেক শব্দ অক্ষম হতো। সেক্ষেত্রে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার সম্পূর্ণ কাব্যের ন্যায়সঙ্গত। আর যাঁরা এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করেন না, তাঁরাও ভাষা ব্যবহারের ভঙ্গী বদলাতে চেষ্টা করেন।

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৮

সুধীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ পরিণতির দিক কী, সেটা জানি না। কিন্তু তিনি ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, এবং অতীত ঐশ্বর্যের অংশ নিজের কাব্যভাণ্ডারে সঞ্চিত করতে পেরেছেন, সেজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এ ঐশ্বর্যের পরিচয় অবশ্য "উত্তরফাল্গুনী"র চেয়ে বেশী মেলে "ক্রন্দসী"তে, তার কারণ বোধ হয় আলোচ্য কবিতাগুলির রচনাকাল "ক্রন্দসী"র পূর্ব্বে।

সমর সেন

সব-পেয়েছির দেশে, বুদ্ধদেব বসু। কবিতা-ভবন, দেড় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের শেষ রোগ-ভোগের সময় যখন মাঝে মাঝে সামান্য সুস্থ থাকতেন তেমনি এক অবসরে লেখক শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য তাঁর মনে যে আনন্দ এনেছিল তার আবেগে লেখক বইখানি লিখেছেন, এবং সে-আনন্দ এ বই-এর সর্ব্বত্র ছড়ান। তার বিষয়-সন্নিবেশ, তার ভাষা, তার স্টাইল 'আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি জায়ন্তে'। বইখানি পড়লে সন্দেহ থাকে না যে এ আনন্দ মহাকবি ও মহালেখকের সন্দর্শনে নবীব কবি ও লেখকের আনন্দমাত্র নয়। এ আনন্দ তাঁরই নিকটে এসে মনে জমেছে যাঁর মনের মন্ত্রে লেখকের মন দিয়েছে খুব বড় সাড়া। লেখকের নিজের কথায় " 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' এই তাঁর প্রথম ও শেষ মহামন্ত্র।" বস্তুর বাস্তবতা তিনি কারও চেয়ে কম অনুভব করেন নি। এ বাস্তবতাকে তিনি যে কর্ম্মে স্বীকার করেছেন তার তুলনাও আমাদের দেশে খুব বেশী নেই। কিন্তু তাঁর মন ও সৃষ্টির আনন্দ পৃথিবীর ধূলিকে ধূলিমাত্র দেখে নি; বেদের ঋষির মত 'মধুমৎ' দেখেছে।

প্রবীণ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের দেশের নবীন লেখকেরা কি চোখে দেখতেন, তাঁদের শ্রদ্ধায় ভালবাসার পরিমাণ ছিল কত তার একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় এ পুঁথিতে রয়ে গেল ভাবী-কালের লোকদের জন্য। কেবলমাত্র জীবন-চরিত এ জিনিষ কিছুতেই দিতে পারবে না। আর আমাদের মত যারা কবি নয়, সত্যিকারের লেখকও নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখেছে, তাঁর মনের আলোর স্পর্শ পেয়েছে তারা নিবিড় আনন্দ ও গভীর বিষাদে এ বই পড়বে।

এ বইখানি লেখা শেষ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্ব্বে। না হলে অনেক কথা ও আলোচনা যা এ বই-এ আছে তা বাদ পড়তো। এর মধ্যে যে উচ্ছল আনন্দের প্রবাহ তা বাধা পেতো। এ বই হোতো অন্য বই।

পৌষ, ১৩৪৮

এ বই-এর ভাষা সকলের চোখে পড়বে। আধুনিক বাংলা গদ্য যোগ্য লেখকের হাতে কত স্বচ্ছন্দগতি ও উজ্জ্বল হয়েছে এ বই তার একটি দৃষ্টান্ত।

লেখকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছোট মেয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে নিজেদের কিছু ঘরোয়া কথা এ বই-এ আছে। সে সব কথা এ-বই-এ স্থান দেওয়ার কড়া এবং মৃদু বিরূপ সমালোচনা দেখেছি। সমালোচকেরা লেখকের সমবয়সী, বা সে বয়সের মনোভাবকে দূর থেকে দেখার বয়স তাঁদের হয় নি। আমার মতন যারা বৃদ্ধ, লেখকের বয়সকে স্নেহের চোখে দেখতে পারে, তারা এ ঘরোয়া কথা সস্নেহ কৌতুকের সঙ্গে পড়ে আনন্দ পাবে। ভাবী-কাল এই বৃদ্ধদের দিকেই। কালের ব্যবধান বয়সের প্রভেদের কাজ আপনি করবে।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

মডার্ন কবিতা, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। দেড় টাকা।

'অতি আধুনিক' সমাজ সম্বন্ধে কতগুলো প্রবাদ প্রচলিত আছে। তার মধ্যে তরুণ-তরুণী, ঢাকুরিয়া লেক, ইভনিং-ইন-প্যারিস, বেবি-অষ্টিন, চা-পার্টি, মেট্রো সিনেমা ইত্যাদি বাক্য ও বস্তুর ছড়াছড়ি, এবং এগুলোই আবার আজকালকার এক ধরণের সাহিত্যের উপজীব্য। লেকের কাছাকাছি ব'লেই হোক, কিংবা অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত পূর্ববঙ্গীয়দের বাসভূমি ব'লেই হোক, হতভাগ্য বালিগঞ্জই এই 'অতি আধুনিক' সমাজের লীলাভূমি বলে কল্পিত হয়, এবং অনেক লেখক অনেক সময় দক্ষিণ পাড়ার প্রতি এমন কটাক্ষপাত ক'রে থাকেন যাতে সুরুচি রক্ষা হয় না। কিন্তু আমরা যারা দক্ষিণ পাড়ার বাসিন্দা, আমরা পথে ঘাটে রোমান্স ছড়ানো দেখতে পাইনে, কিংবা আজকালকার ছেলেমেয়েরা নীতিধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে উদ্দামতার স্রোতে ভেসে চলেছে তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ-সব বেশির-ভাগই তরুণ যশোলিপ্সুদের রুদ্ধরতিপ্রসূত কল্পনামাত্র।

সাবিত্রীপ্রসন্ন প্রবীণ কবি হ'য়েও এই উজ্জ্বল জনপ্রবাদে মজেছেন। 'মডার্ন কবিতা'র কবিতাগুলোয় যাদের তিনি আক্রমণ করেছেন তাদের হয়তো অস্তিত্বই নেই, তাই তাঁর তীরগুলো হাওয়ার বুকেই বিঁধেছে। তিনি অবশ্য ভূমিকায় ব'লে নিয়েছেন যে কাউকে আঘাত করা কিংবা ইস্কুলমাস্টারি করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তাঁর উদ্দেশ্য 'আধুনিক আধুনিকা'দের মুখের সামনে একটি আয়না ধরা, যাতে তাঁরা 'নিজের আসলরূপ দেখে আত্মসম্বিৎ ফিরে পান'। কিন্তু যাদের তিনি বর্ণনা করেছেন সে-ধরনের জীব বাস্তবে যদি বা থাকে, তারা এতই তুচ্ছ যে সাবিত্রীবাবুর মতো

যশস্বী লেখকের তাদের জন্য দর্পণ রচনার কাজটি মানায় না; মুখোস খুলে দেখাবার মতো সুতীব্র অন্যায় ও কলঙ্ক সমাজের বুকে অনেক জমা হয়ে আছে।

কিন্তু এ-কথা সত্য যে সাবিত্রীবাবুর কবিতাগুলি বেশির ভাগ পাঠকেরই ভালো লাগবে। লঘু ছন্দে লঘু রস তিনি জমিয়েছেন, আগাগোড়া একটি সহজ, হালকা ভঙ্গি আছে যা, সাধারণত যারা কবিতা পড়ে না, তাদেরও আকর্ষণ করবে। কয়েক বছর আগে অপরাজিতা দেবীর কবিতা যে-কারণে জনপ্রিয় হয়েছিলো, সেই কারণেই 'মডার্ন কবিতা'ও জনপ্রিয় হবে আশা করা যায়। এতে এমন-কিছু নেই যা সাধারণ পাঠককে ভড়কে দেবে। বইটি সুদৃশ্যও বটে।

সাবিত্রীপ্রসন্ন অনেক কাল ধরে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে কাব্য রচনা ক'রে আসছেন। 'মডার্ন কবিতা'য় তাঁর কাব্যকলার মোড় ফিরেছে। হালকা কবিতার মূল্য যথেষ্ট। যোগ্যতর বিষয় নিয়ে, অধিক পাঠকের বদলে স্বল্প-সংখ্যক ভালো পাঠক লক্ষ্য ক'রে হালকা ব্যঙ্গ কবিতা যদি তিনি আরো লেখেন, তাহ'লে বাংলা কবিতার একটা ফাঁক তিনি হয়তো খানিকটা ভরে তুলতে পারবেন।

The Calcutta Municipal Gazette,
Tagore Memorial Special Supplement,
Editor, Amal Home, Re. 1/-

'পরিচয়' রবীন্দ্র-স্মৃতিসংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮।
সম্পাদক: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, হিরণকুমার সান্যাল। ॥০

'কবিতা'র গত সংখ্যায় আমরা ম্যুনিসিপ্যাল গেজেটের Tagore Birthday Special Supplement-এর সমালোচনা করেছিলাম। সেটি বেরিয়েছিলো কবির গত জন্মদিন উপলক্ষ্যে, এটি এলো সেপ্টেম্বর মাসে। এটি আয়তনে আরো বড়ো, চিত্রে প্রবন্ধে তথ্যে আরো সম্পদশালী। প্রবন্ধগুলো প্রায় সবই নূতন, প্রায় সব প্রবন্ধই মূল্যবান। কিন্তু এবারেও সব চেয়ে মূল্যবান সম্পাদক-সংকলিত Tagore Chronicle। এই ক্রনিকলটি অবশ্য শেষ দিন পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে, এবং শান্তিনিকেতনে কবির শ্রাদ্ধবাসরের সচিত্র বর্ণনাও আছে। রবীন্দ্রনাথের যাঁরা ভক্ত, রবীন্দ্র-ইতিবৃত্তে যাঁরা অনুসন্ধানী, এ-সংখ্যাটি তাঁদের অমূল্য সম্পদ, এমন কি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহলী মাত্র তাঁরাও এটি হাতে পেলে ছাড়তে চাইবেন না। ইংরেজিতে হ'লে এক কথায় বলতুম, সংখ্যাটি magnificent; অমল হোম মহাশয় যে প্রতিভাবান সাংবাদিক সে-কথা মানতেই হয়।

'পরিচয়ে'র রবীন্দ্র-সংখ্যা আশানুরূপ হয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রস্মৃতি-সংখ্যাটি খুব ভালো হয়েছে। এর তিনটি প্রবন্ধ বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য : লীলাময় রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ : বিদুর সাক্ষ্য', অমিত সেনের 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি' ও রাণী মহলানবিশের 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। এটা লক্ষ্য করবার যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভালো প্রবন্ধ তাঁর জীবদ্দশায় যা লেখা হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে তার চেয়ে বেশি লেখা হচ্ছে, 'পরিচয়ে'র এই সংখ্যাটি তার সাক্ষ্য দেবে।

বু. ব.

শেষ লেখা

তেইশ পৃষ্ঠা, পনেরোটি কবিতা, এই রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখা। মলাটের লেখাটি টুকটুকে লাল আর নয়, এ-বইয়ে কালো রং মানিয়েছে।

বইটি পড়ি, বার-বার পড়ি, পাতা ওল্টাই, হাতে নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকি—হঠাৎ মনে পড়ে যে এই শেষ; এর পরে রবীন্দ্রনাথের নতুন বই হয়তো বেরোবে, কিন্তু নতুন লেখা আর বেরোবে না। তখন বই রেখে দিয়ে চ'লে যাই অন্য কাজে।

অমিয়বাবু একে বলেছেন কবিতার চেয়ে বড়ো। কিন্তু কবিতা কি কবিতার চেয়ে বড়ো হয়? আর যদি বা হয়, তা কি আর তখন কবিতা থাকে? তবু, অমিয়বাবু যা ভেবে কথাটি বলেছেন তা যেন বুঝতে পারি। সাহিত্যের যে-সব তত্ত্বের সাহায্যে আমরা কাব্যবিচার করি তার কোনোটাই যেন এখানে খাটে না। কাব্যকলার সকল বিশ্লেষণ এ ছাড়িয়ে যায়। এ যেন অন্য-কিছু। এ এক অস্পষ্ট অদ্ভুত জগত, কয়েকটি কালো-কালো ছাপার অক্ষরে এর সৃষ্টি। এর আধো আলো, আধো আঁধার। আধো ঘুম, আধো জাগরণ। আধো জীবন, আধো মৃত্যু। যেন জীবন-মরণের সেতুর একটি ছায়াময় বাঁকা রেখা, আমাদের পরিচিত প্রাণীলোকের মাটিতে আরম্ভ হ'য়ে মিলিয়ে গেছে অজ্ঞেয় অসীমে।

তেরো নম্বর কবিতাটি ধরা যাক। খবরের কাগজের পাতায় এ নিয়ে লোফালুফি খেলা হয়নি, ভালোই হয়েছে। এটি জোড়াসাঁকোয় ২৭ জুলাই তারিখে লেখা, অপারেশনের তিন দিন আগে। রবীন্দ্রনাথ আশি বছরের জীবনে যা-কিছু লিখেছেন তার কোনো কিছুর মতোই এ নয়।

---

*শেষ লেখা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৪৮। বারো আনা

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি,
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর॥

এর সম্বন্ধে কী বলবার আছে? এ কি কবিতা? এ কি বিশেষ কলাকৌশলে বিশেষভাবে বানানো ও সাজানো কোনো কথা? এ যেন হঠাৎ উঠে এসেছে অন্তরের গভীর উপলব্ধির কোনো বাণী, তার যেটুকু বলবার সেটুকু বলেই চুপ, তারপর আমরা যুগ যুগ ধ'রে তা নিয়ে ভাববো।

এগারো নম্বরে বল্‌ছেন :

রূপ-নারায়ণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ-জগৎ
স্বপ্ন নয়।

কোনো-এক শেষরাত্রে এটি লেখা, সম্ভবত কোনো স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে। এ-রূপনারাণকে ভূগোলে খোঁজা বৃথা। তার স্রোত বইছে কবির স্বপ্নে। কিংবা তা হয়তো এই বিশ্বেরই প্রাণস্রোত। তার তীরে গাঁথা রইলো কবির অঙ্গীকার : 'জানিলাম এ-জগৎ স্বপ্ন নয়।'

দুটো সুর বেজেছে। প্রথমটা হলো

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি।

আর একটা—

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে

জীবনে যা সত্যিই মূল্যবান মৃত্যু তাকে নষ্ট করতে পারে না, আবার মৃত্যুই জীবনকে সম্পূর্ণতা দেয়—এই তার নিপুণ শিল্প। এ দুটো কথাই পাশাপাশি চলেছে, আর দুটো কথাই নানাভাবে বলা হয়েছে আগেকার

অনেক কবিতায়। তত্ত্বকথায় যাবো না, শুধু এটুকু বলবো যে আমাদের কবি জীবনের মতো মৃত্যুকেও সম্পূর্ণ ভোগ করে গেছেন, শেষের দিককার এ-বইগুলো সেই সুরেই বাঁধা। মৃত্যুর অভিজ্ঞতায় জীবনকে সম্পূর্ণ করলেন, যাবার আগে এই তাঁর শেষ কীর্তি, শেষ দান।

তাই সব অলঙ্কার একে একে খুলে ফেলা হলো। এখন ও-সব নিরর্থক মনে হয়। উপমা পড়ে রইল দূরে, মিল চুকে গেলো, শব্দঝঙ্কার চুপ। ললিত নয়, মধুর নয়, ছন্দের কারুকার্যে বন্ধুর নয়। সরল, সংহত কঠিন দু'একটি বাণী কালের বুকে তিনি খোদাই করছেন, আর ঘোমটায়-আধো-মুখ-ঢাকা মৃত্যু পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। বাণীবিন্যাস আর নয়, শুধু বাণী।

শেষ কবিতাটি ('তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছো অকীর্ণ করি') তিনি শোধন ক'রে যেতে পারেননি। এমনও হতে পারে যে কবিতাটি অসম্পূর্ণ। যে অবস্থায় ওটি আমাদের হাতে এলো, তাতে এ-কথাই মনে হয় যে ওটি কবির একটি দুরূহতম রচনা বলে গণ্য হবে। শেষ কোন কথাটি তিনি বলতে চেয়েছিলেন তা জানবার সঙ্গত কৌতূহল থেকে নানারকম ব্যাখ্যা এর হবে, কিন্তু এ খুবই সম্ভব যে ঠিক তাঁর বলবার কথাটুকু ধরা পড়বে না। যাকে বলছেন সে যে মৃত্যু এটুকু মাত্র অনুমান করা যেতে পারে, কিন্তু কী যে বলছেন তা খুঁজতে গেলে দেখি বাক্য পদে-পদেই ছলনা করে

মৃত্যু তাঁর জীবনে যে পূর্ণতা আনলো তার কথা বলেছেন, আবার আমাদের জীবনে যে-শূন্যতা আনবে তার কথাও বলতে ভোলেননি :

> রৌদ্রতাপ ঝাঁ-ঝাঁ করে
> জনহীন বেলা দু-পহরে।
> শূন্য চৌকির পানে চাহি।
> কোথাও সান্ত্বনা-লেশ নাহি।

এ-লাইন ক'টি সর্বদাই মনে আনবে বিশেষ একটি ঘরের, বিশেষ-একটি চৌকির ছবি, যা চিরকালের মতো শূন্য হ'য়ে গেলো। অন্য পক্ষে তাঁর নিজের শেষ কথা এই :

> আমি চাহি বন্ধুজন যারা
> তাহাদের হাতের পরশে
> মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
> নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ
> নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।
> শূন্য ঝুলি আজিকে আমার;—
> দিয়েছি উজাড় করি

যাহা কিছু আছিল দিবার,
প্রতিদানে যদি কিছু পাই
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।

আর দুর্যোগে, বিভীষিকায় আচ্ছন্ন আজকের এই পৃথিবী? তাকেও তিনি ভোলেন নি—

ঐ মহামানব আসে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।...
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

এই তাঁর শেষ গান—এবং শেষ আশা।

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদকীয়

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সহজ ভাষায় লেখা সর্বজনভোগ্য বই আর বেশি প্রচারিত হওয়া উচিত নয়, ইওরোপের মনীষী মহলে এই রকম একটা কথা উঠেছে। তার কারণ ইওরোপীয় ভাষায় আজকাল এ ধরণের বই অগুনতি বেরুচ্ছে, আর তাদের কাটতিও দেদার। ইংরেজিতে নানা বিজ্ঞানের সহজ ও সংক্ষিপ্তসার কত যে আছে তা কলকাতারও যে কোনো বইয়ের দোকানের জানলার সামনে মিনিটখানেক দাঁড়ালেই টের পাওয়া যায়। তার ফলে আজকের দিনে সাহিত্যে ও শিক্ষিত লোকের কথাবার্তায় বৈজ্ঞানিক বুকনির ছড়াছড়ি—বিশেষ ক'রে যে সব বিজ্ঞান আমাদের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, যেমন প্রাণতত্ত্ব কি মনস্তত্ত্ব, তাদের নিয়ে অনধিকারচর্চা আজকের শিক্ষিত সমাজের ব্যাধি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশেও এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা বেন সীরিজের ছ'পেনির বই কি বড়ো জোর জুলিয়ন হক্সলির প্রবন্ধ প'ড়েই নিজেকে বিজ্ঞানে সবজান্তা মনে করেন।

এই কারণে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে 'পপুলার' গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যদেশে আজকাল প্রতিকূল মত শোনা যাচ্ছে। কতগুলো বিষয় আছে যা স্বভাবতই শুধু বিশেষজ্ঞের অধিগম্য, তা নিয়ে সাধারণ লোক ছেলেখেলার বেশি কিছু করতে পারে না, এবং সেটা না-করাই ভালো। কিন্তু ইওরোপে যে কথা খাটে আমাদের দেশে তা অবশ্য খাটে না। যেমন আমাদের আহার অত্যন্ত একপেশে, তাতে শরীরপুষ্টির সমস্ত উপাদান উপযুক্ত মাত্রায় মেশানো থাকে না, তেমনি আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাও অত্যন্ত সংকীর্ণ, তাতে মানসিক বিকাশের অনেকগুলি জরুরি উপাদানই বাদ পড়ে। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকে কোনো শিক্ষাই আমরা পাই না। খুব সম্প্রতি এ-অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিত সমাজেও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অতল অজ্ঞতা অনেক সময় দেখা যায়— অশিক্ষিত কি নিরক্ষর জনসাধারণের কথা ছেড়েই দিলুম। আমাদের শিক্ষার এই অসম্পূর্ণতা যে আমাদের জাতীয় চরিত্রকে দুর্বল ক'রে দিচ্ছে এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর বেদনাবোধ ছিলো, এবং এ-অভাব অন্তত কিছুটা ভ'রে তোলবার উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বভারতীর তরফ থেকে লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালার প্রবর্তন করেন। এই সীরিজের প্রথম বই তাঁরই রচিত পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণকাহিনী 'পথের সঞ্চয়'। তারপর আরো চারখানা

বেরিয়েছে 'প্রাচীন হিন্দুস্থান'—প্রমথ চৌধুরী, 'পৃথ্বী পরিচয়'—প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, 'আহার ও আহার্য'—ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য ও 'প্রাণতত্ত্ব' রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা যাক: 'শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়।······বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান-চর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।···আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ। এই কারণে আমাদের গ্রন্থগুলিতে ভাষার আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারা যাবে বলে আশা করি নে কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হবে না।'

বাংলাভাষায় সরল বিজ্ঞান লেখবার যেটা প্রধান অসুবিধে তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ উদাসীন ছিলেন না। আমাদের দেশের পণ্ডিতরা ইংরেজি বই প'ড়ে ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষা দেন ও ইংরেজিতেই অধ্যাপনা করেন, অতএব নিজের বিষয়ে বাংলায় দু'কথা লিখতে হ'লে তাঁরা অনেকেই হতাশ হন ও হতাশ করেন। এ ধরনের বই লেখবার জন্য তাই এমন লোক দরকার যিনি বিশেষজ্ঞ হ'য়েও মাতৃভাষার ব্যবহার জানেন। সে ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত তারও উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন—লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালার যেটি প্রথম বই সেটি অবশ্য গ্রন্থমালা আরম্ভ হবার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলো, রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়ের' কথা বলছি। এই আশ্চর্য ছোটো বইটিতে রবীন্দ্রনাথ এক হিসেবে বাংলা গদ্যের চরম ব্যবহার ক'রে গেছেন। তত্ত্বের আলোচনা আমার অধিকারের বাইরে, শুধু এটুকু বলবো যে বিশ্বসৃষ্টির বিজ্ঞান ও বিশ্বসৃষ্টির কবিত্বের অপরূপ মিলন ঘটেছে এই বইটিতে। পড়তে-পড়তে এক-এক জায়গায় গা কাঁটা দেয়। আর কঠোর পরিভাষাগুলোকে মুখের কথার মধ্যে গুলিয়ে এমন সরস সহজ রচনা শুধু রবীন্দ্র-প্রতিভাতেই সম্ভব—'বেগনি-পারের আলো' কি 'লাল-উজানি আলো' আর কার কলম দিয়ে বেরুতে পারতো!

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনগুপ্তের 'পৃথ্বী পরিচয়ে'ও এই কথাগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এ বইটির পরিসর অনেক ব্যাপ্ত, তবু ভাষা সর্বদাই স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত। তার কারণ বলতেই হয় এই যে লেখক শান্তিনিকেতনে

অধ্যাপক ও রবীন্দ্র-আবহে কিছুটা পরিপুষ্ট। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ যে ভয় করেছিলেন ভাষার আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করা যাবে না, সে-ভয় শেষ পর্যন্ত হয়তো অমূলক ব'লেই প্রমাণিত হবে। পশুপতিবাবুর 'আহার ও আহার্য' ও সুখপাঠ্য। 'প্রাচীন হিন্দুস্থানে'র ভাষার তারিফ করা বাহুল্য, কারণ বইটির লেখক প্রমথ চৌধুরী। তবু বলবো, প্রমথবাবুর রচনাবলীর মধ্যেও ভাষার দিক থেকে এই বইটির স্থান অতি উঁচুতে। এও এক রকম 'বালভাষিত গন্থ'। ছোটো ছোটো কথা, ছোটো ছোটো বাক্য, অথচ কী অর্থঘন, কী ইঙ্গিতময়। চৌধুরী মহাশয়ের এই ইতিহাস তাঁর 'ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি'র মতোই ক্ষুদ্র একটি মাস্টারপীস।

এ-সীরিজের পঞ্চম ও আধুনিকতম বই শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণতত্ত্ব' (Biology)। এ-বইটিরও ভাষা তারিফ করবার মতো। পরিসর অতি অল্প, কিন্তু তথ্যে কমতি নেই; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বত্র আছে এদিকে রচনায় আছে সাহিত্যিক স্বাদ। ইংরেজি পরিভাষার আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা না ক'রে চলতি মৌখিক কথাতে ভাবটা প্রকাশ করলে যে অনেক সময় ভালো ফল পাওয়া যায় সে-বিষয়ে রথীন্দ্রনাথ সচেতন। কয়েকটি কথা, (যেমন protoplasm, chromosome ইত্যাদি,) তিনি ইংরেজিতেই রাখতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু সেগুলো লেখা হয়েছে বাংলা অক্ষরে, সেটা ভালো। তবে এটা দেখে ভালো লাগে যে দেহযন্ত্র সম্পর্কিত অনেক কথা, আমরা যে-গুলো মুখে ইংরেজিতেই বলি তাদের বাংলা খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়।

পরিশেষে আবার বলতে হয়, বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা আমাদের সাহিত্যের একটি প্রধান অভাব পূরণ করতে উদ্যোগী। বইগুলো দামেও শস্তা—আট আনা থেকে এক টাকার মধ্যে—(একই দাম রাখতে পারলে বোধ হয় ভালো হ'তো), অতএব এদের বহুল ব্যবহারে কোনোদিকেই বাধা নেই। আমাদের স্কুলগুলোতে এ-সব বই ব্যবহৃত হ'লে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ভিৎ পাকা হ'তে পারে, তাছাড়া সাধারণ পাঠকেরও এদের সঙ্গে পরিচয়ে প্রচুর লাভ। এদের উদ্দেশ্য বিষয়গুলির সঙ্গে পাঠককে মোটামুটি পরিচিত ক'রে দেয়া—যে পরিচয় প্রাথমিক না হোক মাধ্যমিক শিক্ষারই অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু আমাদের শিক্ষাপ্রণালী অতি ক্ষীণ, এ বইগুলোর সংযোজনা ঘরে ব'সে হ'তে পারে, এবং হওয়া উচিত। সব বয়সের এবং সকল শ্রেণীর পাঠকেরই এগুলো কাজে লাগবে, কারণ আমাদের সাধারণ জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ। আশা করা যায়, বিশ্বভারতী এই সীরিজে আরো অনেক বই বের করবেন এবং তার মধ্যে সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতি অ-বৈজ্ঞানিক বিষয়ও থাকবে।

'সোভিয়েট দেশ'

সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'সোভিয়েট দেশ' নামে একটি বই (১৷৹) আমরা সমালোচনার জন্য পেয়েছি। বইটিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের নানা দিক নিয়ে বাংলার বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিকেরা আলোচনা করেছেন। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-রক্ষায় যে দেশ এখনও পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী, তার সম্বন্ধে নানা তথ্য জানবার উৎসাহ আছে অনেকেরই। এ-বই তাঁরা সাদরে গ্রহণ করবেন। বইটির উৎসর্গ 'রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে', মলাটে আছে সোভিয়েট ভাস্কর ডিমিট্রি সাপলিনের একটি মূর্তির প্রতিলিপি।

এ ছাড়া এই সমিতি আরো দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, বুদ্ধদেব বসুর 'সোভিয়েট ইউনিয়নে শিক্ষা ও সংস্কৃতি' ও গোপাল হালদারের 'সোভিয়েট যুদ্ধের তিন মাস'। এক আনা ক'রে এদের দাম।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র আটটি খণ্ড এ পর্য্যন্ত বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন। পঞ্চম খণ্ড পর্যন্ত 'কবিতা'য় বিস্তৃতভাবে সমালোচিত হয়েছে, ষষ্ঠ খণ্ডেরও আংশিক আলোচনা করা হয়েছে। এই খণ্ডগুলিতে আছে: ৬ষ্ঠ খণ্ড: কবিতা ও গান—কণিকা; নাটক ও প্রহসন—হাস্যকৌতুক; উপন্যাস ও গল্প—গোরা; প্রবন্ধ—লোকসাহিত্য। ৭ম খণ্ড: কবিতা ও গান—কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা; নাটক ও প্রহসন—ব্যঙ্গকৌতুক, শারদোৎসব; উপন্যাস ও গল্প—চতুরঙ্গ; প্রবন্ধ—ব্যঙ্গকৌতুক। ৮ম খণ্ড: কবিতা ও গান—নৈবেদ্য; স্মরণ; নাটক ও প্রহসন—মুকুট; উপন্যাস ও গল্প—ঘরে বাইরে; প্রবন্ধ—সাহিত্য। এ ছাড়া গ্রন্থপরিচয় ও চিত্রাবলী অবশ্য প্রতি খণ্ডেই আছে।

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র অপ্রচলিত সংগ্রহও দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। কবির বাল্য ও প্রথম যৌবনের যে-সব রচনা তিনি নিজে পরিত্যাজ্য মনে করতেন অথচ যেগুলো তাঁর প্রতিভার পরিণতি অনুসরণ করবার পক্ষে অপরিহার্য, সেগুলো সবই এ দুটি খণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে। এর সম্বন্ধে আলোচনা অদূর ভবিষ্যতে করবার ইচ্ছা রইলো।

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র প্রতি খণ্ডের অন্তর্গত প্রতি গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা ভবিষ্যতে হয়তো আর করা সম্ভব হবে না, তার কারণ কাগজের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা। তবু প্রতি সংখ্যাতেই আমরা রচনাবলী প্রসঙ্গে একটি

প্রবন্ধ দেবার চেষ্টা করবো, এবং স্বাভাবিক সময় ফিরে এলে হয়তো 'কবিতা'র আকারও এতখানি বাড়ানো সম্ভব হবে যাতে তার কোনোদিকেই অঙ্গহানি করতে না হয়। আপাতত কিছু ছাঁট-কাট না করলে উপায় নেই।

কাগজের টানাটানির দরুন রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের সংকল্পও আমাদের বর্জন করতে হলো।

রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রতিকৃতি

শ্রীমতী রাণী চন্দ অঙ্কিত "Two Portraits of Rabindranath Tagore" আমরা এইমাত্র পেলাম। একটি ১১ মাঘ ১৩৪৭, অন্যটি ২৮ মে ১৯৪১ তারিখে আঁকা। কবির জীবনের শেষ বছরে এই দুটি পোর্ট্রেটই তাঁর আঁকা হয়েছিলো, এবং এ-ছবি দুটি এঁকে শ্রীমতী রাণী চন্দ আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ছবি দুটির প্রতিলিপি ও মুদ্রণ অতি চমৎকার, এবং দুটিই কবিস্বাক্ষরিত। বাইরের সৌষ্ঠবও অনিন্দ্য। নিজে রাখবার পক্ষে ও প্রিয়জনকে উপহার দেবার পক্ষে ভারি সুন্দর একটি জিনিষ বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন। দাম ১৸৹।

'কবিতা'র পৌষ সংখ্যা

'কবিতা'র এই সংখ্যা প্রকাশ করতে অনেকটা দেরি হ'লো। প্রাচ্য-জগতে মহাযুদ্ধের আবির্ভাবের কথা স্মরণ ক'রে পাঠকরা এ-বিলম্ব ক্ষমা করবেন। এ-সংখ্যার জন্য উদ্দিষ্ট রবীন্দ্র-রচনাবলীর সমালোচনা এবং শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তর লেখা অন্যান্য সমালোচনা সময় ও কাগজ বাঁচাবার জন্য শেষ মুহূর্তে প্রেস থেকে ফিরিয়ে এনে চৈত্র সংখ্যার জন্য রেখে দিতে হ'লো।

এই পৌষ সংখ্যা আমরা খুব কম ক'রে ছাপাতে বাধ্য হয়েছি। যে-সব গ্রাহক অপ্রাপ্তি সংবাদ দেবেন তাঁদের পুনরায় কাগজ পাঠানো সম্ভব হবে না, এ-কথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে।

সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু। কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।...

মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা থেকে
ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

কবিতা

সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা | চৈত্র, ১৩৪৮ | ক্রমিক সংখ্যা ৩১

আটপৌরে

অমিয় চক্রবর্ত্তী

আকাশ চাদরটা ময়লা জেটির একটানা কালো কয়লা,
নূরনবীর মাস পয়লা
অত্যন্ত ঘটা ক'রে নয় ট্যাঁকে পয়সা গোটা ছয়
গড়ের মাঠ পেরিয়ে ঘোরে
ফুটবল দেখে, ডোরা-কাটা গেঞ্জি খেলোয়াড় লাফাচ্চে, জোরে।
চানাচুর এক পয়সা মুখে পোরে।
উবু হয়ে বসেচে কয়েকটা লোক ট্রামলাইনের পাশে, ঘাসে
ঘোড়দৌড় মাঠটার; আওয়াজ আসচে বাজে ঠাট্টার;
স্টীমারের ভোঁ সোয়া পাঁচটার
টাকী থেকে যাবে রাজগঞ্জের ঘাটে।
—এম্নি একটা হতে আরেকটায় শূন্যে বেলা কাটে।
কী হবে এর পরে এখন ফিরলে ঘরে
সাঁঝরাত্রে
আড়াইমণ দিনের শ্রান্তি গাত্রে?
নূরনবীর মনটা তখনো উড়বে নোংরা তক্তায় শুয়ে
ছেঁড়া কাগজ যেমন ফুঁয়ে,
এলোমেলো দৈবের ডিক্রি:
সেই সিদ্ধ ছোলাকলাই বিক্রি,
কুকুর নিয়ে বেড়ায় মেম সাহেব, "জনি, জনি,"
ছাতা তুলে ডাকচে সারাক্ষণই;

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৮

গুড্স্‌ট্রেনের লাইন, গাড়ি নেই, গঙ্গার পারটায় ;
ধোঁয়া-ঢাকা শিবপুরের ধারটায় ;
কতগুলো বয়া ভাস্‌চে,
মাল্লারা চেঁচায়, ডিঙি তিনটে ঘাটে আস্‌চে ;
আজব মস্ত-নল জাহাজ, নাম্‌ল সারঙ্
ফিতে-বাঁধা গোল টুপি, কুর্ত্তাটা নীল রঙ্ ;
ফিটনে ফিরিঙ্গি খালাসী, মুখে চুরোট ;
ঝাঁকা মুটে বইচে মোট ;
ফোর্ট্ উইলিয়মে লম্বা লম্বা পোল, উপরে লাল বাতি ;
বৃষ্টির মেঘ জম্‌চে, নেই সেই ছেঁড়া ছাতি,
—অতএব ইডেন গার্ডেনটা গেল বাদ :
মিটমিটে কেরোসিনের ঘরে ফিরে মগজে উড়চে সিনেমার সাধ

হিরন্ময় পাত্রে ঢাকা নয়, কয়লায় কালো সত্য
লক্ষ কোটি প্রাণধারণের এই তত্ত্ব।

"বিড়ি-ধরানো, পান-চিবোনো, মাদুরে-
চ্যাপ্টানো প্রাণ। তবু চিরন্তনের আমি আদুরে
আমি নূরনবী।"
তা'র নাকডাকা সুরে এই শুনতে পাই আমি অকবি ;
তবু, গাঁজার টানে তা'র প্রাত্যহিক গ্লানি ডুবোবার খবর
আমার কাছে জবর।
অতিবাস্তবও নয়, আদর্শও নয়, এক রত্তি
শুধু সত্যি।

একই জগতে থাকি, চল্‌চে সবি ;
আমি আর নূরনবী
চিনিনা কেউ কাউকে—
উচ্চ কাব্যের পরিহাস ছেঁড়া উড়ো প্রাণের ইতিহাস
যার কথায় ধ্যানের সর্ব্বনাশ
—সেলাম, বেহস্তের এই ফাউকে ॥

ছিন্ন সূত্র

বুদ্ধদেব বসু

চৈত্র মাসে ত্বপুরবেলায়
পাতা-ঝরা গাছের তলায়
এসেছে বেদের দল।
ক্ষণিকের ঘরকন্না দর্শকের হৃদয় ভোলায়।
খড়কুটো জড়ো ক'রে আগুন জ্বালায়
যুবতী বেদিনী,
বাজে রিনিঝিনি
কাচের প্রগল্‌ভ চুড়িগুলি,
বুকের কাঁচুলি
পরিশ্রমে ঈষৎ হাঁপায়,
আচমকা হাওয়া এসে খামোকা কাঁপায়
লাল ঘাঘরা, সবুজ ওড়না।
চৈত্রের রোদ্দুরে যেন বিচিত্রবরণা
রাধিকার ছবি।

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৮

আছে সবি।
হাঁড়িকুড়ি চালডাল শালপাতা,
আমি যারে বলি যা-তা
সেই মতো আর কত
ইতস্তত
রয়েছে ছড়ায়ে।
উলঙ্গ আনন্দে ধুলোমাটিতে গড়ায়
কালোকেলো কয়েকটা শিশু।
বুড়োবুড়ি দুই জোড়া
চুপ ক'রে ব'সে ছাখে জীবনের প্রথম মহড়া
শিশুর চঞ্চল কলোচ্ছ্বাসে।
ঐ দিকে আরো দুটো মেয়ে
গর্বিত আতপ্ত লাস্যে হাস্যালাপে রত,
যুবকেরা আশে-পাশে ঘোরাঘুরি
কতবার ক'রে যায়, দেখেও ছাখে না,
অথচ তাকায় আড়চোখে।
হাওয়া দেয়, উহুন ধোঁয়ায়,
নিচু হ'য়ে গাল দুটি ফুলিয়ে ফুঁ দেয়
একটি ছোট্ট মেয়ে,
যখন দাঁড়ালো উঠে মুখখানি তার
ছাই লেগে হাঁড়ির তলার মতো কালো
তাই দেখে উচ্চহাসি হঠাৎ মাখালো
অতর্কিত ফূর্তির রঙে
এ-রাঁধাবাড়ারে,
ধূলিলীন দীনতার সংকীর্ণ ভাঁড়ারে
আকস্মিক আলো ক'রে দিয়ে গেলো।
হাসিগল্প আনন্দের ফাঁকে-ফাঁকে
ঘরকন্না চলে বাঁকে-বাঁকে।

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৮

এ যেন বাস্তব নয়; এরা যেন কখনো জানে না
কাজ কারে বলে।
অফুরন্ত ছুটির রাজত্ব থেকে মুক্ত কোলাহলে
আসে আমাদের দেশে চৈত্রের দুপুরবেলায়,
কিছুক্ষণ মত্ত থাকে রাঁধাবাড়া ঘরকন্না-খেলায়,
তারপর কোথায় মিলায়
নিত্যপরিবর্তনের বিচিত্র লীলায়।
ছাই, ভাঙা হাঁড়ি, আর কিছু খোসা শাকসবজির,
চিহ্নগুলি প'ড়ে থাকে অন্তহীন চড়ুইভাতির।

মনে-মনে বলি, ওরা সুখী নয়,
এ আমারই ভুল।
আমারই রঙিন
কল্পনার ফুল।
ওরা যে দরিদ্র অতি, ওদের কি সুখী হওয়া সাজে?
ওরা যদি সুখী হয়, সে-অন্যায় রূঢ় হ'য়ে বাজে
ইতিহাস-বিধাতার বুকে।
মনে-মনে বলি, আমি ঢের ভালো আছি
নিয়মিত পানাহারে, নিশ্চিন্ত আরামে
শিক্ষিতের শৌখিনতায়।
জীবনের অবরুদ্ধ ক্ষীণতায়
ওরাই কৃপার পাত্র, প্রবৃত্তির আবর্তে ওরাই
বন্দী হ'য়ে আছে; চিন্তার চড়াই-উৎরাই
ওদের অনধিগম্য, সভ্যতার বিচিত্র রম্যতা
ওরা তার কিছুই জানে না। ওরা একান্তই দেহী।
দেহটা তো চির দাস, মানুষের মন শুধু জানে
দুর্জ্ঞেয় মুক্তির টানে

আকাশে আকাশে ব্যাপ্ত হ'তে,
অনির্বচনীয় অন্ধকারে, অনিশ্চিত অপূর্ব আলোতে।

বুদ্ধি বলে বার-বার
সে-মুক্তি আমার।
ওরা বন্দী শরীরসীমায়, আমি মুক্ত মানস জীবনে।
এই তুলনায়
আমারই যে জিৎ
বুদ্ধি বলে বার-বার এতে ভুল নেই।
তবু কেন আমার হৃদয়ে
যেন কোন অতীতের স্মৃতি ব'য়ে
বাজায় মাতাল বাঁশি দক্ষিণের হাওয়া।
রক্তে বাজে গান,
জাগে ঢেউ অশান্ত উচ্ছল
সেখানে বেদের দল
অশিক্ষিত কলোচ্ছ্বাসে উচ্চহাসে
তোলে তোলপাড়।
মনে হয় আমি কবি, আমার আসন
ওদেরই ধুলায় ছিলো, কবে হ'লো নির্বাসন
সে-সহজ, স্বাধীন জীবন থেকে
গম্ভীর, সুস্থির
ধুতি-পাঞ্জাবির
ইস্ত্রি-করা ভদ্রতায়।
আমারে যে পলে-পলে বেঁধে ক্ষুদ্রতায়
আমার স্বজাতি যারা; কেরানি কি ইস্কুলমাষ্টার হ'য়ে
ছদ্মবেশে চলাফেরা করি, আসলে আমি যে কবি
সেই পরিচয়

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৮

প্রাণপণে লুকায়ে-লুকায়ে
জীবনের রসস্রোত ক্রমেই শুকায়।
ঐ যে বেদের দল
ওরি মধ্যে আমার আদিম বাসা।
যারা কবি যারা গান গায়,
ওরা যে তাদেরে চায়,
তরুণীর তীক্ষ্ণ চোখে আছে পুরস্কার,
শিশুর উদ্দাম নৃত্যে অজস্র উৎসাহ,
আছে নেশা ঘাঘরার রঙে,
আছে খুশি আকাশে-বাতাসে।
ওদের সমাজে
কবিত্ব লজ্জার নয়, ছদ্মবেশ কবিকে হয় না নিতে,
অলজ্জ প্রাচুর্য নিয়ে উন্মুক্ত খুশিতে
একান্তই কবি হ'তে পারে যে সে
এই তো পূর্ণতা তার।
তাই বার-বার
যদিও বোঝায় বুদ্ধি ভালো আছি, খুব ভালো আছি,
তবু এ-হৃদয়
চায় ফিরে যেতে ঐ পথের ধুলায়
প্রথম জন্মের সেই অস্থির কুলায়ে।
কিন্তু এও জানি মনে-মনে
এ কেবল নিষ্ফল আক্ষেপ, অনর্থক বাসনা-বিলাস,
জীবনের সরল উল্লাস
আমার তো নয় আর।
সর্বস্বত্ব তার
ত্যাগ ক'রে এসেছি যে, সভ্যতার কাছে
এই মোর দেনা।
হবে না, হবে না
বেদের মহলে ফিরে যাওয়া।
যে-শৃঙ্খলে আমি বাঁধা ঢুকেছে তা জীবনের মূলে,
ছাড়পত্র হারায়েছি, রাস্তা গেছি ভুলে'।

স্বগত

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

মৃদু হাতে ছুঁই মুঠি ভরে নিই তোমার ও মুখ
সন্ধ্যাকালে।
প্রান্তর ঘেঁষা মনেরে বুঝাই,
রজনীগন্ধা শত যোজনে ত একটি ফোটে
এখন, যখন
আমারই আয়ুর অলিন্দে এসে কিশোর এ চাঁদ
বাঁশের খোঁচায় জরজর এই বাঁশবাগানে,
গৃহ উপান্তে,
এই মুহূর্ত্তে।
উপন্যাসে কি চন্দ্রালোকে,
বায়ুকুঞ্চিত দীঘি হেসেছিল বালখিল্যের অনাহত
হাসি? অবাক মেনেছি এ নির্ব্বেদে!
কুচিকুচি করে ছিঁড়ে-ফেলা প্রেমপত্র এ যে!
প্রেমের এ পথ সুগম ত নয়।
আত্মপ্রসাদ নেই তবু বলি
ভুলে গেছি কবে দেখেছি আকাশ জুড়ে
তোমার বিলোল কটাক্ষ। মোরে হেনেছে
চিন্তা, অনিদ্রা আর তিরস্কৃতি,
তোমার স্মরণ।
মুখে মুখে সব সতীর্থেরা ত ছড়া কেটে গেছে
দেয়ালে এঁকেছে ব্যঙ্গ চিত্র।
লজ্জাই করে।
তবু এ আবির্ভাব।
আগমন নয়। চারুসজ্জার মেখলায় ঘেরা
তোমার চরণ ফুটায় কমল অন্ধকারে।

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৮

অদ্ভুত লাগে—চাঁদে-পাওয়া কাক ডেকে যায় বারে-
বারে আকাশের ভগ্ন কোণে
কোকিল দুরূহ—
গৌরীশৃঙ্গে তুষার সমাধি পেয়েছে কবে—
বাহাদুরী নয়—দুঃখে জানাই।
বিদূষকও নই। প্রতিদিন আমি অন্ধকারে
অস্তিত্বের পালোয়ানী পেশী সজোরে নাচাই।
মনের উলুকী কর্কশ ডাকে রাত্রি কাঁপায়।
দিনের আলোকে কোনও বন্ধুকে বলি বুক ঠুকে:
প্রেমের ব্যাপারে যৌথ ব্যবসা প্রবঞ্চনারই
সামিল, নতুবা বন্ধুকৃত্যে ত্রুটিতালিকার
বোঝা বেড়ে যায়। দুটি বালিকার
মন নিয়ে তুমি বাঁয়া তব্‌লার বোল ফোটাবে কি
এই আসরে!
বন্ধু ছেড়েছি।
অহরহ কোনও প্রেয়সীরে ডাক দিয়েছি জীবনে
উন্মন ক্ষণে।
এদিকে হঠাৎ দুটি পায়ে লাগে বিষম তাড়া—
খেটে খুটে খাওয়া, নিঃশেষ হওয়া ক্ষয়ে যাওয়া
পেশী নিয়ে কি পোষায়?
তবু এ ধাবন কুর্দন যেন সার্কাসী ঘোড়া।
তবু এ ভাগ্য লাঞ্ছনা পায় আমারই হাতের প্রবল ঘায়ে।
শ্রমসাধ্যের ঘামে ভেজা মনে, এই প্রান্তরে
তোমার স্মরণ রজনীগন্ধা শত যোজনে ত একটি ফোটে।

১৯৩৭-'৪১

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এখনো তোমার মনের খবর রাখি।
দেখা হলো ফের অনেক দিনের শেষে।
তুমি দেখা দিলে সেই অভিনব বেশে।
হৃদয় তোমার এখনো উতলা পাখী।

সুচরিতা মোর! সময় আসিলো নাকি?
অধুনা হৃদয়ে জটিল ভাবনা নানা।
বাহিরে বাগানে ফুটেছে হাসনুহানা।
হৃদয় তোমার আজো কি উতলা পাখী?

এদিকে আকাশে উড়েছে বিমানগুলি।
অবাধে ছিঁড়েছে ছড়ানো কুয়াশাজাল।
নিমেষে বিমান ভেঙেছে মাথার খুলি।
ভয়ে নতমুখে নীরবে তালতমাল।

সুচরিতা মোর! তোমাকে ভুলিনি আমি।
বাহিরে আকাশে প্রলয় গভীর হয়।
আসে দুর্য্যোগ, তার চেয়ে বেশী দামী
হয়তো তোমার পুরানো প্রণয় নয়!

এখনো তোমার মনের খবর রাখি।
অবাধে ছিঁড়েছে বিমান কুয়াশাজাল।
ভয়ে নতমুখ নীরবে তমালতাল।
হৃদয় তোমার আজো কি উতলা পাখী?

মধ্যবিত্ত প্রেম

হরপ্রসাদ মিত্র

হাত মেলালুম আমরা আবার শিমূলতলার ট্রেনে
সেই ক্ষণিকের পান্থশালায় চব্বিশে অঘ্রাণে।
একলা ফিঙের একটু দোলায় টেলিগ্রাফের তার
চমকে ভাবে, কে এসেছে সাত সমুদ্র পার!
পিছিয়ে পড়ে মহুয়া আর শাল-পিয়ালের বন,
জানি, জানি কতো অসীম যুগল প্রাণীর মন।

অনেক ফাঁকির ইতিবৃত্তে দিইনি সেদিন হাত,
সেই আমাদের গভীর-চাওয়া আদিম সুপ্রভাত।
ঝলক-দেওয়া এনামেলের নতুন প্রসাধন
প্রশান্তি তার ভাসিয়ে এলো অশ্রু ঝরার ক্ষণ।
আমি বললুম 'পলাশ কোথায়?—এ-তো সবুজ স্তূপ
'ফাগুন যদি না আসে তো হেমন্ত রয় চুপ?'

হাত মেলালুম আমরা আবার শিমূলতলার ট্রেনে,
কে জানে কি ঘটছে তখন মস্কোতে-য়ুক্রেনে।
কোন পাইলট নিখোঁজ হ'লো, কোন বাহিনী শেষ,
কোন পদাতিক পায়নি খুঁজে বুলবুলিদের দেশ।
বিশ্বে আছে পরম সত্য সাঁওতালী এক মাঠ,
দেখে এলুম কিমাশ্চর্য্য প্রাণের পদপাত।

রাষ্ট্রনেতার মঞ্চ থেকে টাটকাতরো বাণী
খসে পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে ইংরেজী-ইরানী।
কান দিই-নি সে সব কথায় ছুটির আনন্দেতে,
তা' ছাড়া সেই রাজ্যে খবর-কাগজ কোথায় পেতে।
অচেনা কোন ইষ্টিশানে শুনে ঘুঘুর ডাক
আমরা ভুলে গিয়েছিলুম খবর-ওলার হাঁক।

হাত মেলালুম আমরা আবার শিমূলতলার ট্রেনে
সে যেন এক নতুন ছবি বাঁধা মলিন ফ্রেমে।
নিষ্প্রভ এক মধ্যবিত্ত, স্তিমিত পাঞ্জাবী।
আটপৌরে-র ছিলো নাকো অ-সাধারণ দাবী।
যুদ্ধে আমি যাইনি, আমি ভীরু অর্ব্বাচীন,
কোনো দিন যে ছোঁয়নি এ হাত কোনো ঘোড়ার জিন।

বিনা মূল্যে পেয়ে গেলুম নতুন মহাদেশ,
সেই দেশে যাঁর পড়েনি পা, কথায় মেশান শ্লেষ।
ব্যঙ্গ ক'রে বলেন তিনি আমায় 'প্রেমিকরাজ'।
আমার নতুন রাজ্য যেন তাঁর-ই মাথায় বাজ।
স্মিতহাস্যে করেছি আজ তাঁকেও সম্ভাষণ,
কাঁচা সোনার দীপ্তিতে ফের জ্বলে ধূলির ধন।

এই রয়েছি আপিস-ঘরে, আজ পয়লা পোষ,
চক্‌চকে টাক বড়বাবু, অয়স্কান্ত ঘোষ।
ঘুলঘুলিতে চড়ুইপাখী, ঘরে খাতার ঘ্রাণ,
তুমি গেছ তোমার পথে, আমি-ও নই ম্লান।
এই দুপুরের মিঠে ছোঁয়াচ লাগে সকল গায়।
সেই কবিতার স্মৃতি মনে—"জানি গো দিন যায়।"

বলছে হেঁকে অনেক লোকে, 'প্রতিক্রিয়াশীল!
'ফুলকে যারা ফুল ব'লেছে মারো তাদের ঢিল।'
তোমার মনে থাকে যদি মীনকুমারীর সাধ,
নতুন শাস্ত্রে লেখা সেটা চরম অপরাধ।
গভীর গর্ত্তে ব'সে বলেন অধীর কোলা ব্যাঙ
বল গৌরীশৃঙ্গ নামুক যেখানে তাঁর ঠ্যাং।

হিমালয়ের সঙ্গে আমার নেইক জ্ঞাতিত্ব।
সারা অঙ্গ ঢাকে ভিজে মাটির মাতৃত্ব।

গৌরীশৃঙ্গ নয়কো মিতা, নয় কেহ ভেকরাজ,
মধ্যবর্ত্তী রাজ্যে নিবাস, সওদাগরের কাজ—
অর্থাৎ এই হিসেব-নিকেষ, তার বেশি আর নয়।
এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশে হই লয়।

আওতাতে ফুল ফুটলো আহা, সেই ক্ষণিকের জয়।
তারপরে থাক শীতের বাতাস—উত্তরেতেই বয়।
মন্থর এই পাঁজির পাতায় যেই আসে দিন লাল,
বহুদিনের তুষার ভেজায় এনামেলের গাল।
তারপরে ফের ছাড়াছাড়ি, পরম পরিত্রাণ।
কবে কোথায় রইলো প'ড়ে চব্বিশে অঘ্রাণ।

উপসংহার

সমর সেন

হাওয়ায় বসন্তের পূর্বরাগ।
বন্ধুর দেশে সূর্যাস্তে
লাল পাহাড়ের দিকে চলি ;
আর একজনের লাজরক্ত গাল
কয়েকটি কথায় পৃথিবীর মৃত্যুহীন গান।

সময় সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে।
দিল্লীর পথে ধূলো ওড়ে
ধূসর দিন বর্ম পরে শিবির ছাড়ে ;
রাত্রি—হৃতসন্তান, শুষ্ক জননী।

চৈত্র, ১৩৪৮

মহিমা

What man has made of man !—*Wordsworth*.

নির্জন সন্ধ্যার পথ, অসহায় ল্যাম্পপোস্ট প্রাণভয়ে ক্ষীণ,
পলাতক উদরের উনুনের ধোঁয়া নেই, স্বচ্ছ চন্দ্রালোক।
দুর্মর নীলাভ আলো ঝরে' যায় গাঢ় নীল আকাশে সঙ্গীন
পূর্ণিমার ভয়াবহ চন্দ্রালোক ! শত্রুদের পুষ্পকচালক
শুনেছি হদিস্ পায় জঘন্য জ্যোৎস্নায়। তবু প্রাণের মর্মরে
স্তরে স্তরে দেখি ঝরে সত্তার সুনীল আলো ; প্রাণের চূড়ায়
মৃত্যুর মহিমা চাই, অজ্ঞ অপঘাত নয় ; আবিশ্বসমরে
অনর্থক কলকাতার মধ্যবিত্ত কুরুক্ষেত্রে করুণা কুড়ায় !

জনগণমনে অধিনায়কের শূন্য স্থান, পূর্ণ করো বীর !
শেয়ানে শেয়ান হোক কোলাকুলি সঙ্গোপনে, তবু চীন, রুশ—
দেশে দেশে কৃষাণ মজুর যতো ঢেলে দেয় তাদের পৌরুষ
স্বার্থের বর্দ্ধিষ্ণু ছিদ্রে, বনেদীর বনিয়াদে। মুমূর্ষু অস্থির
দেশে দেশে যুদ্ধ চলে, ভারতের ভিৎ টলে। প্রাণের দুর্দিনে
পূর্ণিমার কলকাতাও জটায়ুর পাখা মেলে দূর রুশে, চীনে ॥

ফাল্গুন

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শানানো চোখের সূর্য লোল লুব্ধতায়
আপনাকে করেছে ধারালো।
ফাল্গুনে আগুন জ্বলে, নীল শিখাময়
তারপর রাত্রি ঘনকালো।
কখনো সৌখীন চাঁদ
মাথা ঝিমঝিম-করা আলো।
কখনো : বাদুড় কালপ্যাঁচা মশা
পাউডার-স্নোতে মাজাঘষা
বাতাসে-ফোলা শাড়ির ফানুষ
ভিতরে মানুষ।

একটু হাসি একটু কান্নায়
নিজেকে রান্না ক'রে সুস্বাদু করা।
অনেক বাসি পাপ আর টাটকা পুণ্যে
শূন্যে
বাসা বাঁধা।
কৃষ্ণসাধা মন
সর্বক্ষণ।

শাদা রোদ্দুরে লাল মিছিলে
রাজপথে ডাক মিলে
সন্ধ্যায় জনসভায়।
তারপরে প্রেম বিয়ে ক্লান্তি—
চাকরি বিনে কোথা শান্তি ?
দারুণ জটিল এ-জীবন !

সকালে শস্তা দোকানে গরম চায়ের ফাঁকে
ভাগকরা কাগজ পড়া।
পোষা কোকিল
নাগরিক বসন্তকে ডাকে।
কাকে কাকে লড়াই।
বোষ্টমী গলা সাধে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, শ্রীরাধে।
ফাল্গুনে আগুন জ্বলে নীলে
সাইরেন ডাকে জুট মিলে।

আধ্যাত্মিক নায়ক

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

"Cut it short !
On doomsday 'twon't be worth a farthing !"

—'মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, সিরিয়া
নিঃশেষ, চুরমার—
ইংরেজ, জর্মান, ফরাসী।
ভারত যে আদিম সত্যকে দেখেছিল,
যার উপর তার…'

মনে হল যাদুঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।
তোমার কথার স্তূপ।
সামনে স্লীট্ ট্রেঞ্চ,
ফিরে চাইবারও সময় যে নেই।

তোমার কথা ভাল করে ভেবে দেখব,
এই যুদ্ধের শেষে, আগামী যুদ্ধের আগে,
সংকীর্ণ অবসরে।

চৈত্র, ১৩৪৮

সনেট

প্রমথনাথ বিশী

উঠিয়াছে ঝড় ওই ! সোনার মুকুট
শতাব্দীর শীর্ষ হ'তে হয় হরি লুট
দিগ্বিদিকে : সুপিনদ্ধ রাজ্যের সীমানা
ইতস্ততঃ নিরবধি, যেন জলে টানা,
তার চেয়ে দৃঢ় নয় ; মৌসুমি মেঘের
পুঞ্জীভূত অট্টালিকা ঝঞ্ঝার বেগের
সংঘাতে যেমন ধ্বসে—ভাঙে রাজ্য কত ;
অতীতের ধূলো উড়ে গড়ে ছায়াপথ
ভবিষ্যের ; তাণ্ডবের মৃত স্তূপতলে
সত্য দয়া ন্যায় ধর্ম্ম কাঁদে অশ্রুজলে।
সভ্যতার গজ-কূর্ম্মে চলেছে লড়াই
বিধাতা বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন ; তাই
ক্ষুধিত গরুড় আসে আর নাই দেরী
যুগান্তের শিবা সম ফুৎকারিছে ভেরী ॥

শরতের ঘাসের এক ফালি জমি

নরেশ গুহবক্সি

রাজার আসর প্রমোদ-প্রাসাদ-কক্ষে নয়
ঐখানে, ঐখানে,
শিঞ্জিনী-পরা অলক্ত-রাঙা পায়ে নেচেছিল নর্ত্তকী
যৌবন-লীলা হিল্লোলি' ঐখানে।
অশ্রু-সজল বাষ্পের মত মেঘ উঠেছিল কোনখানে ?
কোনখানে ?
ধরণীর মাটি কাঠবিড়ালির গান শুনেছিল নেপথ্যে ব'সে ঐখানে,
ঐখানে।

'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে'

গল্প-উপন্যাস রচনার প্রণালী মোটমাট দুটো। এক হ'তে পারে, লেখক কোনো-একটি চরিত্রের—কিংবা পর পর একাধিক পাত্র-পাত্রীর জবানিতে সমস্ত গল্পটি বললেন। কোনো-একজনের মুখ দিয়ে আগাগোড়া গল্পটি বলাবার একটা লাভ এই যে তাতে ক'রে বাস্তবসদৃশতার ভাবটা খুব বেশি ফোটে, অসুবিধের মধ্যে লেখকের দৃষ্টি অবশ্যতই সংকীর্ণ হ'য়ে আসে, ঘটনার উপর অবারিত অধিকার থাকে না, পাঠকের নজরে একটাই দৃষ্টিভঙ্গি তিনি আনতে পারেন, তার বেশি না। এ-অসুবিধে কিছুটা দূর হয়, একটির বদলে দু'তিনটি পাত্র-পাত্রীকে মুখপত্র করলে, কিন্তু তাতে আবার চিঠি কিংবা ডায়ারির শরণ নিতে হয়—আর সেটুকুই অস্বাভাবিক। রিচার্ডসনের পামেলা কিংবা রবীন্দ্রনাথের বিমলা বড়োরকমের ঘটনার জালে জড়িয়েও অত লম্বা-লম্বা চিঠি কিংবা ডায়ারি কেন লিখবে, লেখবার সময়ই বা তাদের কোথায় এ-প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে, কিন্তু এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। প্রশ্নটিকে আরো জটিল করা যায় যদি বলি বিমলা, সন্দীপ, নিখিলেশ—এরা সকলেই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতোই ভালো লেখে এ কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো। তবে আসল কথা এই যে প্রশ্নটাই অনর্থক, এদের দীর্ঘ ও পুরোপুরি সাহিত্যিক রচনাগুলিকে অসঙ্গতি বলাই অসঙ্গত। এ তো সাহিত্যে একটা প্রথা ছাড়া আর কিছু নয়, এবং অন্য নানা প্রথার মতো একেও চুপ ক'রে মেনে নিতে হবে। রঙ্গমঞ্চে যখন একটি ঘর দেখানো হয় যার তিন দিকে মাত্র দেয়াল থাকে, বাস্তবিকতা থেকে এই বিরাট বিচ্যুতিতে আমরা আপত্তি করিনে; পোর্শিয়া কিংবা ম্যাকবেথজায়া যখন শেক্সপিয়রের ভাষায় কথা বলে তখনও আমাদের কানে তা অসহ্য শোনায় না; এ-ও সেইরকম। সাহিত্যকলা চিরকালই ভোক্তার কাছে কিছুটা কল্পনার ব্যবহার দাবি করেছে, তাতে রাজি হ'তে না-পারলে সাহিত্যচর্চা না-ক'রে বরং গণিতচর্চা করা ভালো।

গল্প-উপন্যাস রচনার আর একটি যে-প্রণালী, সেটিই আজকের দিনে সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত। তাতে লেখক সর্বগ ও সর্বজ্ঞ, এক কথায় স্বয়ং বিশ্ববিধাতার অনুকারক। কেউ সেখানে 'আমি' নয়, সকলেই 'সে'; লেখক নিজে অনুপস্থিত থেকে সকলের কথাই ব'লে যাচ্ছেন। কেমন ক'রে এটা হ'লো যে একই সময়ে বিভিন্ন ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, সকলের মনের কথাই বা তিনি জানলেন কেমন ক'রে, এ-প্রশ্ন আমরা কখনোই করিনে, এ-ও অন্য একটি সাহিত্যিক প্রথা, যা আমরা মেনে নিয়েছি। এ দুয়ের মাঝামাঝি আরো

* রবীন্দ্র রচনাবলী: ৭ম ও ৮ম খণ্ড।

একটি রাস্তা উদ্ভাবিত হয়েছে; সেখানে গল্প একজন 'আমি'ই বলছে, কিন্তু সে-'আমি' গল্পের কোনো প্রধান চরিত্র নয়, এমন কি কোনো চরিত্রই হয়তো নয়, সে হয় নির্লিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক কথক মাত্র, নয় ঘটনাবলীর সঙ্গে অতি সামান্য সূত্রে যুক্ত। কথাসরিৎসাগর, আরব্যোপন্যাস, ডেকামারোন—সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের গল্পসংগ্রহগুলি প্রায় সবই এই ধরনে রচিত। আধুনিক যুগে এই ধরনটিকে নিখুঁত করেন ও তাতে নতুন একটি রসের সঞ্চার করেন ফরাসি গাল্পিক মোপাসাঁ। প্রাচীন গল্পগুলিতে এই নৈর্বক্তিক 'আমি' একেবারেই অনুপস্থিত, সে নিজের মুখে পরের গল্প বলছে, এইটুকু মাত্র তাকে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু মোপাসাঁর রচনায় সে-'আমি' গল্পের ভিতরেই আছে, অথচ থেকেও নেই। মোপাসাঁ নিজের মুখে নিজের গল্পও কখনো-কখনো বলিয়েছেন, কিন্তু তাও এমন কৌশলে যে গল্পের আসল ওজন পড়েছে অন্য কারুর উপরে, 'আমি'টি আধা-অশরীরী মিডিয়মের কাজ ক'রেই খালাস। কথকতার এই অভিনব ভঙ্গিতে কৃতী হ'তে পেরেছেন বিলেতে ম্যাক্স বিয়রবোম, সমরসেট মম-এর মতো দু'একজন লেখক আর আমাদের দেশে একমাত্র প্রমথ চৌধুরী। এ-ভঙ্গিটি ছোটো গল্পে চমৎকার মানায়, এবং সিদ্ধি যদিও দুরূহ, এ-পথে দেশে-বিদেশে নব-নব গাল্পিক নিত্যই আকৃষ্ট হবেন, তাতেও সন্দেহ নাই।

ছোটো গল্পে মানায়, কিন্তু উপন্যাসে নয়। সব দিক ভেবে দেখতে গেলে, উপন্যাসের পক্ষে বোধ হয় সেই পদ্ধতিই সব চেয়ে ভালো যাতে লেখক সর্বগ ও সর্বজ্ঞ। উপন্যাসের ক্ষেত্রটি এতই ব্যাপ্ত যে এই পদ্ধতি ছাড়া তার প্রতি সুবিচার করা যায় কিনা সন্দেহ। ছোটো গল্প জীবনের ছোটো একটি টুকরো দেখিয়েই ছুটি পায়, কিন্তু উপন্যাসের পটভূমিকা জীবনের সমগ্রতার মধ্যে ব্যাপ্ত, তাই উপন্যাসের পক্ষে এই পদ্ধতিতেই সব চেয়ে বেশি বাস্তবসদৃশতা। আমাদের মন যেমন নিজের ব্যক্তিগত জীবনেই আবদ্ধ থাকে না, আশে-পাশে যে-জীবনস্রোত ব'য়ে চলেছে তাকেও লক্ষ্য করে ও তা থেকেও রস পায়, তেমনি ঔপন্যাসিকও যে তাঁর বৃহৎ মন ও প্রবল মননশক্তি নিয়ে নিজে আড়ালে থেকে কাছের ও দূরের সমগ্র জীবনস্রোত দেখছেন ও আমাদের দেখাচ্ছেন, এতে আমরা ভারি একটি আনন্দ পাই। মনে হয়, এ তো ঠিক জীবনেরই মতো। জীবন যেমন নিজের খেয়ালে অবাধে ব'য়ে চলে, কারুর তোয়াক্কা রাখে না, কারুরই মুখের দিকে তাকায় না, উপন্যাসেও তেমনি ঘটনার স্রোত স্বাধীনভাবে প্রবাহিত, তফাৎ শুধু এই যে বাস্তবজীবনের মতো তা উচ্ছৃঙ্খল নয়, দায়িত্বহীন আকস্মিকতার স্থান সেখানে নেই, তার সমস্ত ঘটনাবিন্যাস শিল্পরচনার দুর্লক্ষ্য নিয়মে শাসিত ও সুমিতিসম্পন্ন। উপন্যাসে এই বৃহত্ত্বের, এই সমগ্রতার স্বাদ দিতে হলে লেখকের পক্ষে কোনো-একটি

বা বিশেষ কোনো-কোনো চরিত্রের শরীরে আবদ্ধ না-থেকে স্বাধীন ও অদেহী দ্রষ্টা হওয়াই ভালো।

'গোরা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতিতেই উপন্যাস লিখেছেন, 'শেষের কবিতা' ও তার পরের উপন্যাসগুলিও তা-ই। মাঝখানে দুটি বই এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে'। 'গোরা'র ছ'বছর পরে এ বই দুটি লেখা।

আপাতদৃষ্টিতে 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে'তে অনেক মিল। এ-দুটি একই বছরে লেখা (১৯১৬), দুটিই প্রথম প্রকাশিত হয়, 'সবুজপত্রে' দুটিই 'আমি' অবলম্বন ক'রে রচিত, এ দুটিতেই সে-সময়ে প্রচলিত ভিক্টোরীয় উপন্যাসের আকার ও আকৃতি পরিহার ক'রে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের নতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করেন। কথাসাহিত্যে কারুকলার ক্ষেত্রে বঙ্কিম যেখানে পৌঁচেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন ছোটো গল্পে—সেটা অনিবার্য ছিলো, কারণ বাংলা ছোটো গল্প রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। কিন্তু উপন্যাসের আঙ্গিকে তিনি অনেকদিন পর্যন্ত পুরোনো নিয়েই তৃপ্ত ছিলেন, নতুন পরীক্ষার কথা ভাবেননি। কিন্তু 'চতুরঙ্গ' লেখবার সময় পুরোনো পদ্ধতি তাঁর আর যথেষ্ট মনে হ'লো না, নতুন পথ তিনি ধরলেন। তারপর 'ঘরে-বাইরে'।

অবশ্য 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে'কে জোড়া-বই ব'লে ভাবলেও চলবে না; বিষয়বস্তুতে ও উদ্দেশে এরা স্বতন্ত্র। তাছাড়া ভাষাতেও এরা মেলে না। 'চতুরঙ্গ' সাধুভাষায় রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস, 'ঘরে-বাইরে' চলতি ভাষায় তাঁর প্রথম উপন্যাস। কিন্তু এই অমিলের মধ্যেও একটি মিল প্রচ্ছন্ন রয়েছে; 'চতুরঙ্গে'র সাধুভাষায় চলতিভাষার অনেক গুণই বর্তমান, 'ঘরে-বাইরে'র চলতিভাষা অনেকাংশেই সাধু ভাষা। ভাষার আলোচনাটাই আগে করা যাক।

সাধারণত আমরা বাংলা গদ্যকে সাধু কি চলিত আখ্যা দিই শুদ্ধু ক্রিয়াপদগুলোর দিকে তাকিয়ে। এ-মানদণ্ড শুধু যে কার্যকরী তা নয়, বিচারের অন্য কোনো উপায় নেই ব'লে এটিই সর্বত্র গৃহীত। আর সত্যি বলতে, শুদ্ধু ক্রিয়াপদের অদল-বদলে বাংলা গদ্যের স্বাদ ও সৌরভ অনেকখানি বদলে যায়, এ-কথাও মানতে হয়। 'আমি যাইতেছি' বললে যা হয়, 'আমি যাচ্ছি' বললে যাওয়াটা তার চাইতে অনেকখানি বেশি হয় বইকি। তবু দু'একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন বাকি থাকে। 'পরশুরামে'র গদ্য কি সাধুভাষা, আর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্য চলতি ভাষা? আইনত, কাগজে কলমে, নিশ্চয়ই তা-ই; কারণ 'পরশুরামে'র ক্রিয়াপদগুলি সাধুভাষার আর সুধীন্দ্রনাথের ক্রিয়াপদগুলি চলতি ভাষার। কিন্তু সে-সঙ্গে এও বলতে হয়

যে 'পরশুরামে'র গদ্যে আমরা পাই চলতি ভাষার মেজাজ, আর সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে সাধুভাষার মেজাজ। 'পরশুরামে'র প্রধান নির্ভর মুখের ভাষার ইডিয়ম, সুধীন্দ্রনাথের উপাদান দুরূহ, অপ্রচলিত কিংবা সদ্যোগঠিত সংস্কৃত কথা। এখানে দেখা যাচ্ছে বাইরের চেহারাটা প্রতারক, বহিরঙ্গ ছেড়ে আত্মার বিচার করলে দেখা যাবে যে 'গড্ডলিকা' চলতি ভাষায় ও 'স্বগত' সাধুভাষায় রচিত।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাইরের চেহারার শাসন, অর্থাৎ ক্রিয়াপদের আদেশ, মেনে চলতেই হয়, নয়তো ছোটো ভুল এড়াতে গিয়ে বড়ো ভুলের গর্তে পা দেবার আশঙ্কা আছে। আমি আশা করছি যে সাধু ও চলিতের এই ক্রিয়াপদ নির্ভর বিভেদ একদিন আমাদের ভাষা থেকে উঠে যাবে, তখন সবাই সেই ভাষাই ব্যবহার করবেন আজকাল যাকে বলা হয় চলতিভাষা। কিন্তু তাহ'লেও দুটো ভাষা থাকবে; একটা সাধু, আর-একটা কম সাধু; একটা গম্ভীর, সুস্থির, সংস্কৃতবহুল, অন্যটা হালকা, ইডিয়মপ্রধান, দ্রুতপরিবর্তনশীল মুখের কথার সঙ্গে তাল রাখতে চঞ্চল। ক্রিয়াপদগুলো এক হ'লেও এ দুয়ের জাতের তফাৎ চিনতে আমাদের একটুও কষ্ট হবে না। বর্ক্‌-এর বক্তৃতার আর শেরিডানের নাটকের ইংরেজি কি একই ভাষা নয়, কিন্তু ঠিক একই কি? ভাষার এই দুটো ভঙ্গি অনিবার্য, একটাকে বলা যাক ধ্রুপদী, আর-একটাকে খেয়ালি। এ দুয়ের মাঝখানে, আর এ দুয়ের বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রণের ফলে ভাষার আরো অনেকগুলো স্তরও অনিবার্য; সব চেয়ে গম্ভীর থেকে সব চেয়ে হালকা পর্যন্ত কত যে সূক্ষ্ম ভেদরেখা তার কি অন্ত আছে। আজকাল বাংলায় আমরা যাকে চলতি ভাষা বলি, তাও তো আসলে একটা ভাষা নয়, তার মধ্যেও অনেক স্তরভেদ আছে, কিন্তু প্রাচীন ক্রিয়াপদ নিয়ে একটা প্রতিযোগী সাধু ভাষা দাঁড়িয়ে আছে ব'লে তার প্রতিতুলনায় সেই বিভিন্ন স্তরগুলোকে অভিন্ন ক'রে দেখবার দিকে আমাদের ঝোঁক হয়। এমন দিন যদি আসে, যখন আজকাল যাকে সাধুভাষা বলি তা আর লেখা হবে না, তখন সুধীন্দ্র দত্তের গদ্য অত্যন্ত সাধু অর্থাৎ ধ্রুপদী ব'লেই গণ্য হবে, আর 'পরশুরাম' বিরূপ ক্রিয়াপদ সত্ত্বেও হয়তো খেয়ালি মহলেই জায়গা পাবেন। অনেকে হয়তো বলবেন তাহ'লে ক্রিয়াপদগুলোয় আপত্তি কী। আপত্তি এই যে যে-কথাটা মুখে কখনো বলি না সেটা লিখবো কেন? বিশেষ্য বিশেষণগুলি যতই দুরূহ কিংবা দুরুচ্চার্য হোক, কোনো-এক সময়ে কোনো-না-কোনো ব্যক্তির মুখের কথায় সেগুলো বসবে এমন সম্ভাবনা আছে, কিন্তু 'সাধু' ক্রিয়াপদ মৌখিক ব্যবহারের একেবারেই বাইরে। মুখের কথায় সাধারণত যার ব্যবহার নেই, অথচ হবার বাধাও নেই, এমন কথা সাহিত্য থেকে বাদ দিতে গেলে সাহিত্যকে অত্যন্ত খাটো করা হয়,

কিন্তু যে-কথা মুখের ভাষায় ব্যবহৃত হ'তেই পারে না, তাকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের অনায়াসে চলতে পারে, এবং তাকে রাখলেও কিছু উপরি-পাওনার আশা নেই। অতি সুশ্রাব্য ও মার্জিত ভাষা হ'লেই যে মুখের কথার আসর থেকে তাকে স'রে পড়তে হবে তা তো নয়। শ্রেণীভেদে ও ব্যক্তিভেদে মুখের কথারও কত বৈচিত্র্য। বর্ক-এর অমন যে গাল-ভরা লম্বা-কথার ইংরেজি, সেও তো তাঁর মুখেরই ভাষা। কিন্তু হাজার যুক্তিতর্ক দিয়েও, আর পরশুরামের রচনায় মৌখিক মেজাজের অমন প্রাবল্য সত্ত্বেও, এটা প্রমাণ করা যাবে না যে 'গড্ডলিকা'র গল্পের কোনো-এক সময়ে একজন মানুষেরও মুখের ভাষা হবার সম্ভাবনা আছে। উল্টোদিকে যদি বলা হয় যে রবীন্দ্রনাথের পাত্রপাত্রীদের মতো ভাষায় কোনো বাঙালি কখনো কথা কয় না, তার উত্তর এই যে একজন বাঙালিকে আমরা জানতুম যিনি নিতান্ত ঘরোয়া আলাপও ওরই খুব কাছাকাছি ভাষায় করতেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে সঙ্গে এটুকুও জুড়ে দেবো যে রবীন্দ্রনাথেরই প্রভাবে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের মুখের ভাষা দিন-দিনই মার্জিত হচ্ছে; পঁচিশ বছর আগে যে-কথাটা মুখের কথায় শুনলে হয়তো হাসি পেতো, আজকাল সে-রকম কথা বালক-বালিকার মুখেও শোনা যায়, কেউ লক্ষ্য করে না।

সাধুভাষা ও চলতি ভাষা নিয়ে বিতর্কের যখন আরম্ভ, সেই সময়ে 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে' লেখা। সে আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ তার্কিক হ'য়ে এলেন না, এলেন স্রষ্টা হ'য়ে, চলতি ভাষাকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার ভার তিনিই গ্রহণ করেলেন। 'ঘরে- বাইরে'র পর তিনি আর সাধুভাষা ব্যবহার করেননি, আর জীবনের এই শেষ পঁচিশ বছরে তার গদ্যরচনা যেমন বিচিত্র ও অপর্যাপ্ত, তেমনি উৎকর্ষের চরমচুম্বী। উত্তরপঞ্চাশে এসে এতদিনের অভ্যস্ত বনেদি ভাষাকে চিরকালের মতো বিদায় দিয়ে তিনি যে অর্বাচীন ও বহুনিন্দিত চলতি ভাষাকে গ্রহণ করলেন তার পিছনে প্রমথ চৌধুরী ও 'সবুজপত্রে'র প্রভাব প্রত্যক্ষ। কিন্তু এ-কথা মনে করলে চলবে না যে এ-প্রভাব না-এলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে এ-বিপ্লব ঘটতোই না। এ-বিপ্লবের মূল ছিলো তাঁর নিজেরই সাহিত্যিক পরিণতিতে, এর তাগিদ ছিলো তাঁর নিজেরই অন্তরে। 'ঘরে-বাইরে' যদিও চলতি ভাষায় তাঁর প্রথম উপন্যাস, তাঁর প্রথম রচনা কিংবা গ্রন্থ নয়। বালক বয়স থেকেই তাঁর বাঁ হাত চলতি ভাষাতেই চলেছে। চিঠিপত্র ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি বেসরকারি লেখাগুলো সবই চলতি ভাষায়, সে-ভাষার মনোহারিতা চির অম্লান। সতেরো বছরে লেখা 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে'র বাকচাতুর্য আজও আমাদের মুগ্ধ করে, রবীন্দ্র-গদ্যের, কিংবা বাংলা গদ্যের কোনো সংকলনগ্রন্থই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না 'ছিন্নপত্র' থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি না-দিয়ে। শান্তিনিকেতন-সিরিজের

কথা ভুললে চলবে না, মনে রাখতে হবে 'গোরা'য় কথোপকথন মুখের ভাষাতেই দিয়েছিলেন, আর 'ঘরে-বাইরে'র আগে সমগ্র কৌতুক-নাট্য ও হাস্যরচনাগুলি, তাছাড়া 'অচলায়তন' পর্যন্ত নাটক লেখা হ'য়ে গিয়েছিলো। অবশ্য নাটক চলতি ভাষায় ছাড়া লেখা হ'তেই পারে না, কথাটা উল্লেখ করলাম শুধু এইটে দেখাতে যে 'ঘরে-বাইরে' রবীন্দ্র-সাহিত্যে আকস্মিক কিছু নয়, নানা সুরের নানা রসের চলতিভাষার রচনা ইতিপূর্বেই তাঁর কলম দিয়ে প্রচুর পরিমাণে বেরিয়েছিলো। এ-কথা অনায়াসেই মনে করা যেতে পারে যে, তিনি যখন 'ঘরে-বাইরে' লিখতে বসলেন তখনই ঐ ভাষার উপর—কিংবা ভাষার ঐ ভঙ্গির উপর—অবাধ কর্তৃত্ব তাঁর অধিকারে। 'ঘরে-বাইরে'র বৈশিষ্ট্য শুধু এটুকু যে এটি চলতি ভাষায় তাঁর প্রথম সরকারি সাহিত্য রচনা, যা কৌতুক-নির্ভর কিংবা নাট্যজাতীয় নয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ ক'রে এলে দেখা যাবে যে 'ঘরে-বাইরে' এই বিচিত্র ইতিহাসে একটি অনিবার্য ও সম্পূর্ণ ন্যায়সম্মত ধাপ। এটা আমরা দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পীজীবনে বারে-বারেই নতুন হ'য়ে জন্মেছেন, পুরোনো খোলস ছেড়ে বারে-বারেই প্রাণের নবীন উদ্যম নিয়ে তাঁর আবির্ভাব একটি আশ্চর্য ঘটনা। মাঝে-মাঝে ভাটা এসেছে, সে কেবল অভাবিতপূর্ব জোয়ারের সূচনা। মোটামুটি বলা যায় 'মানসী'র আগে পর্যন্ত যা কিছু তিনি লিখেছেন সব প্রথম পর্যায়ে পড়ে, দ্বিতীয় পর্যায় 'মানসী' থেকে 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য' থেকে 'গীতালি' তৃতীয় পর্যায় তার পরেই আবার একটি নবজন্মের শুভলগ্ন। অবশ্য এই বিভাগগুলি আঁটোসাঁটোভাবে নিলে চলবে না, কারণ প্রত্যেক বিভাগের ভিতরেই নানা-রকম ঘূর্নিস্রোত ধরা পড়ে, নানা আপাতবিরোধী ভাব ও ভঙ্গির সমান্তরাল প্রবাহ বিভাগবিলাসী সমালোচককে তুর্কি-নাচন নাচায়। রবীন্দ্রনাথ এতই বড়ো যে কোনোরকম ফ্রেমের মধ্যেই তাঁকে বাঁধা অসম্ভব, এই বিভাগগুলি তাঁর অগ্রগতির সব চেয়ে স্থূল ধারাটা লক্ষ্য করবার সহায় হ'তে পারে, তার বেশি কিছু নয়।

গত মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ, সেই সময়টা রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মোড়-ফেরানো লগ্ন। গদ্যে 'জীবনস্মৃতি' ও পদ্যে 'গীতালি' পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, একটিতে সাধুভাষার চরম উৎকর্ষে পৌঁচেছেন, অন্যটিতে এসে ঠেকেছেন এক ধরনের গীতিকবিতার শেষ প্রান্তে। তৃতীয় পর্যায় শেষ হ'লো, এবার চতুর্থের পালা। এ-প্রক্রিয়াগুলো অবশ্য সচেতন নয়, কিন্তু এমন অনুমান করলে ভুল হয় না যে সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রাণমন নতুনের পদধ্বনির জন্য কান পেতে রয়েছে। সেই যে নতুন, যা অচিরেই একদিন পঞ্চাশোত্তর প্রৌঢ়ের বাণীতে নবযৌবনের দৃপ্ত গানে উচ্ছল হ'য়ে উঠলো—'ওরে নবীন, ওরে আমার

কাঁচা, ওরে সবুজ ওরে অবুঝ, আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' এই নতুনের, এই নতুন-হবার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের নিজেরই মধ্যে। তারই দুঃসহ বেগে প্রমথ চৌধুরীকে তিনি প্ররোচিত করলেন নবীনের মুখপত্র 'সবুজপত্র' প্রকাশে। ঠিক সেই সময়েই তিনি যেন অনুভব করলেন যে প্রচলিত পত্রিকাগুলি নিয়ে তাঁর আর চলছে না, তাঁর আন্তর্বিপ্লবের প্রকাশের জন্য আধারও নতুন হওয়া দরকার। আর সেই উপযুক্ত আধারটি প্রমথ চৌধুরী যখন তাঁর সামনে ধরলেন, তাঁর বাণী-বন্যা গদ্যে পদ্যে 'সবুজপত্রের' ক্ষীণ অঙ্গ ছাপিয়ে মাসের পর মাস উপচে পড়তে লাগলো। 'সবুজপত্র' প্রমথবাবুর সৃষ্টি যতখানি, রবীন্দ্রনাথেরও তার কম নয়।

এই নবজন্মের, নবযৌবনের তোড় যে কী প্রচণ্ড তা এ থেকেই বোঝা যাবে যে 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে', 'ফাল্গুনী' ও 'বলাকা' কাছাকাছি সময়ে রচিত ও একই বছরের মধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। অনতিপরে এলো 'পলাতকা', চতুর্থ পর্যায় শুরু হ'তে-হ'তেই দেখতে-দেখতে কূল ছাপিয়ে ছুটে চললো বন্যার মতো, 'লিপিকা'য় পেলো পূর্ণতা, তারপর 'পূরবী'তে পঞ্চম তিথি।

আবার ভাষার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

সে-কালে যাঁরা চলতি ও সাধুভাষা নিয়ে বিতর্ক ক'রেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আসল কথাটা ধরতে পারেন নি। যাঁরা সাধুভাষার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা মনে করতেন চলতি ভাষা মানেই ইতরলোকের ভাষা, কলকাতার ককনি-বুকনি, ইংরেজিতে যাকে বলে স্ল্যাঙ্। এ-ধারণাটি কতদূর ছড়িয়েছিলো তা এ থেকেই বোঝা যাবে যে তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় চলতি ভাষায় লেখা কয়েকটি লাইন তুলে দিয়ে (শোনা যায় তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনাও থাকতো) পাশ-করিয়েদের বলা হ'তো সেটি 'chaste and elegant Bengali'তে রূপান্তরিত করতে। অন্যপক্ষে চলতিভাষার অনুরাগীদের মধ্যে অনেকে ভাবতেন যে সাধুভাষার ক্রিয়াপদগুলো বদলে দিলেই তা চলতি ভাষা হ'য়ে ওঠে। বাংলা গদ্য স্বচ্ছ, দ্রুত ও সাবলীল হ'য়ে উঠবে, তাকে ইচ্ছেমতো বাঁকানো চোরানো ঘোরানো ফেরানো যাবে—চলতি ভাষার আসল সার্থকতা যে এইখানে তা সে-সময়ে অনেকেই বোঝেননি। মেছোনি-বুকনির সঙ্গে তার যে আত্মীয়তা নেই তা প্রমাণ করবার জন্যে প্রমথ চৌধুরীর তৎকালীন কোনো-কোনো শিষ্য অতি জমকালো সংস্কৃতবহুল ভাষাই লিখতেন—তফাতের মধ্যে থাকতো শুধু ক্রিয়াপদগুলোর মৌখিক রূপ। অনেকটা যেন ক্রিয়াপদ-বদলানো বঙ্কিমি ভাষার পরিবেশন। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় প্রথম থেকেই যে-সহজ ভঙ্গিটি ছিলো, সেটি 'সবুজপত্রে'র লেখকদের মধ্যে এক অতুলচন্দ্র গুপ্তই আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন ব'লে মনে হয়।

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৮

আমার মনে হয় চলতি ভাষার প্রকৃত সার্থকতা কোথায় তা রবীন্দ্রনাথ, যুক্তিতর্ক দিয়ে না হোক, শিল্পীমনের অবচেতনে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই পর-পর লিখলেন 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে'। উভয় গ্রন্থেই আছে ভাষাসৃষ্টির পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ফলাফল বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। 'চতুরঙ্গে' কথোপকথন সুদ্ধু সাধুভাষায় লেখা—কিন্তু এ-ভাষার এমনই নিপুণ সংযত বিন্যাস, এর ভঙ্গি এমনই সহজ ও স্নিগ্ধ যে সমস্ত বইটি শেষ ক'রে তারপর হঠাৎ আমরা যেন অবাক হয়ে উপলব্ধি করি যে এটি সাধুভাষায় লেখা, চলতি ভাষায় নয়। চলতি ভাষার আত্মিক গুণ রবীন্দ্রনাথ এতে সবই দিয়েছেন, শুধু চেহারাটা রেখেছেন সাধুভাষার। বাংলা রচনার আসল মুশকিলই ক্রিয়াপদ নিয়ে, ওদের যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে পারলেই ভাষা ধারালো হয়, এ-কথাটা আজ লেখকমহলে খুব বেশি জানাজানি হ'য়ে গেছে, কিন্তু 'চতুরঙ্গ'ই প্রথম বাংলা বই যাতে ক্রিয়াপদের সংখ্যাহ্রাসের দিকে স্পষ্ট চেষ্টা দেখা যায়। এ-দিকে মন দিয়েছিলেন ব'লেই রবীন্দ্রনাথের শেষের দিককার গদ্য সিদ্ধির এমন চরম পৌঁচেছিলো, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার মূল রহস্যটা এই যে ক্রিয়াপদ কমানো, শানানো ও মৌখিক ভাষা থেকে নতুন জোগানো হয়েছে। বলা যেতে পারে 'গল্পগুচ্ছে'র দ্বিতীয় খণ্ড থেকেই তাঁর ভাষায় এ-লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু 'চতুরঙ্গে'র নিবিড় সংহত ইঙ্গিতময় রচনাভঙ্গিতে এটা খুব বেশি ক'রে চোখে পড়ে। 'আমার প্রতিবেশিনী বালবিধবা', 'তখন ক্রিসমাসের ছুটি', 'পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড়ো আড়ত'—এ-ধরনের বাক্যরচনায় আজকাল আমরা অত্যন্ত বেশি অভ্যস্ত, কিন্তু সে-সময়ে এগুলো ছিলো অভিনব ও দুঃসাহসিক, এবং এরই ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নতুন ভাষা গড়বার হাত পাকাচ্ছিলেন। আর একটা লক্ষ্য করবার এই যে, এই সময়কার গদ্যে তিনি কোনো-কোনো শব্দের চলিত রূপ সাধুভাষায় বসাতে দ্বিধা করেননি, তার (তাহার) তাকে (তাহাকে) ইত্যাদি প্রায়ই পাওয়া যায়, 'চতুরঙ্গে' কোনো-কোনো ক্রিয়াপদেরও চলিত রূপ নিয়েছেন, পাতা ওল্টাতে 'বেরো' 'এগোতেই' এ দুটি চোখে পড়লো। 'চতুরঙ্গ' পড়লে এটা বেশ বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের প্রাণমন এখন চলতিভাষার জন্যে উদগ্রীব হ'য়ে উঠেছে, সাধুভাষা আর তাঁকে ধ'রে রাখতে পারবে না। এবারেও তিনি সাধুভাষা লিখলেন বটে, কিন্তু তাকে বাজালেন চলতি ভাষার সুরে, সাধু ও চলিতের মূল প্রভেদ শুধু যে ক্রিয়াপদে নয়, সাধু ক্রিয়াপদেও যে চলতি ভাষার স্বচ্ছতা সম্ভব তারই প্রমাণ 'চতুরঙ্গ'।

তাই যদি হয়, যদি সাধুভাষা দিয়েই চলতিভাষার কাজ করানো সম্ভব হয়, তাহ'লে আলাদা একটা চলতি ভাষা কেন? প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, নয়তো 'ঘরে-বাইরে' হ'তো না। রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' লিখেছেন যেন

নিজেকে প্রাণপণে চেপে রেখে; যে-উপাদান স্বভাবতই অনমনীয়, তাকে সাপের শরীরের মতো খেলাতে গিয়ে তাঁর দম প্রায় ফুরিয়ে যায় আরকি। এইজন্যেই 'চতুরঙ্গে'র ভাষা এমন চাপা, আগাগোড়া যেন দাঁতে-দাঁতে চেপে বলা, কোথাও দম ফেলবার জায়গা নেই। রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক স্বভাবতই উচ্ছলতার দিকে, 'চতুরঙ্গে'র কঠোর সংহতি তাঁর সমগ্র গদ্যসাহিত্যে একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তাঁর মন সাধুভাষাকে আর চাচ্ছে না, অথচ যা চাচ্ছে তা ঐ সাধুভাষার কাছেই আদায় হয় কিনা এই পরীক্ষা করতে গিয়েই এ সংহতি এসেছে। মন খুলে কথা বলতে পারেননি, নিজেকে ছেড়ে দিতে পারেননি—কারণ তাহ'লেই যে ভাষা সমস্ত বাধা ভেঙে চলতিপথে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এর পরেই সাধুভাষার শাসন আর টিকলো না, বাঁধ ভাঙলো, 'ঘরে-বাইরে'তে পেলেন বিপুল আনন্দময় মুক্তি। সে-মুক্তির, সে-আনন্দের স্বাদ তার প্রথম লাইন থেকেই পাওয়া যায়। অকৃপণভাবে, নিঃশেষে তিনি ভোগ করলেন এই নতুন মুক্তির আনন্দ, কোথাও কোনো আড়াল রাখলেন না। 'চতুরঙ্গ' অত্যন্ত বেশি সংহত, আর তারই প্রতিক্রিয়ায় 'ঘরে-বাইরে' অত্যন্ত বেশি উচ্ছ্বাসী। এদিক থেকে এ দুটি পর-পর বইয়ে আশ্চর্য রীতি-বৈপরীত্য। কিন্তু তাতে অবাক হবার কিছু নেই, একটা অন্যটার কারণ।

সত্যি বলতে, 'ঘরে-বাইরে'র ভাষায় কিছুটা আতিশয্য আছে। এ যেন বড্ড বেশি জোর দিয়ে বলা, বড্ড বেশি ঘি-মশলার রান্না, মোটের উপর বড়োই যেন বেশি। অলঙ্কারের এমন প্রাচুর্য যে কথাগুলি প্রায়ই বক্তৃতাঢঙের হ'য়ে পড়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে rhetorical। প্রথম থেকেই চোখে পড়ে 'যে' আর 'তো' এই ছোটো দুটি শব্দের ছড়াছড়ি। বাংলায় এ-অব্যয় দুটির কাজ হচ্ছে বাক্যের দেহে বিশেষ-কোনো দিকে জোর চালিয়ে দেয়া—এ জোর সব সময় দরকার হয় না, ঘন-ঘন এলে ক্লান্তিকর হয়। অনেক সময় জোরটা স্পষ্ট ক'রে দিতেও হয় না, প্রচ্ছন্ন থেকেই তা নিজের কাজ ক'রে নেয়। কিন্তু 'ঘরে-বাইরে'তে এ-রকম কোনো ফাঁক রাখা হয়নি। আর বিশেষণ—তাই বা কত! প্রায়ই তারা একা আসে না, একসঙ্গে দুটি তিনটি ক'রে আসে। উপমা কথায়-কথায়, রূপকের আনাগোনা সর্বত্র। বাক্যগুলি প্রায়ই বহু অংশে গাঁথা, কিংবা দুটি বিপরীত ভাবের সংযোজনায় অ্যান্টিথিসিসে দীপ্যমান। বই খুলে প্রথম যে বাক্যটি পড়ি তাকে সমস্তটার নির্দেশক হিসেবে নেয়া যেতে পারে—

'মাগো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর।'

এখানে মা-র স্মারক হ'য়ে তিনটে জিনিস এসেছে, মা-র চোখের বর্ণনায় লেগেছে তিনটি বিশেষণ। তারপর:

চৈত্র, ১৩৪৮

'সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই যে উষা-সতীর দান; দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?'

আশ্চর্য, আশ্চর্য সুন্দর, পড়তে-পড়তে নেশা ধরে। তবু লক্ষ্য না-ক'রে পারিনে 'যে'-র পৌনঃপুনিকতা, কানে ঠেকেই প্রশ্নবোধক ভঙ্গির ঘনবিন্যাস, এইটুকু পরিসরের মধ্যে কত উপমার কত প্রতীকের ঠেসাঠেসি। 'চতুরঙ্গে'র কঠোর সরলতা থেকে হঠাৎ এক ঐশ্বর্যের ঘূর্নির মধ্যে এসে দিশেহারা হ'তে হয়। 'চতুরঙ্গে' বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত, ভাষার কারুকার্য বিরল, শুধু মাঝে-মাঝে দু'একটা প্যারাডক্স জাতীয় কথা চোখে পড়ে, যেমন 'কোনো গরজ নাই সেইটেই আমার সব চেয়ে বড়ো গরজ', কিংবা 'আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেদের মানিবার জোর বেশি,' কিংবা কখনো কোনো কথা একটি নিটোল নিপুণ এপিগ্রামের মতো গ'ড়ে ওঠে, যেমন, 'ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মান তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়—তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।' কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, এ ছাড়া 'চতুরঙ্গে'র ভাষা যতদূর সম্ভব সরল ও ভূষণবিরল। এদিকে 'ঘরে-বাইরে'তে অলঙ্কারের ভাণ্ডার একেবারে উজোড় ক'রে ঢেলে দেয়া হয়েছে—যেন চলতে-ফিরতে পায়ে মুক্তো ঠেকে, হাতে হীরের ফল ঝ'রে পড়ে।

ঐশ্বর্যের এই আতিশয্য গদ্যরীতির উৎকর্ষের চরম নয়। 'ঘরে-বাইরে'র আগে 'ছিন্নপত্র' ও পরে 'লিপিকা'—রীতিবিচারে এ দুয়েরই স্থান 'ঘরে-বাইরে'র উপরে। চলতিভাষার—বলতে গেলে বাংলা ভাষার—সব চেয়ে যেটি মনোহর রূপ, যা স্বচ্ছন্দ, দ্রুত ও উজ্জ্বল, অথচ যাতে সুর খুব চড়া নয়, জোর খুব বেশি নয়, যা সমারোহ এড়িয়ে চলে কিন্তু কারুকার্যকে অস্বীকার করে না, তার দেখা রবীন্দ্রনাথের রচনায় 'ঘরে-বাইরে'র আগে অনেকবারই পাওয়া যায়, পরেকার কথা ছেড়েই দিলুম। অবশ্য পরেও তিনি আরো একবার সমারোহের দিকে ঝুঁকেছিলেন 'শেষের কবিতা'য়; কিন্তু তার সঙ্গে 'ঘরে-বাইরে'র রচনাভঙ্গির পার্থক্য যথেষ্ট, যথাস্থানে তার আলোচনা করবো।

এটুকু জিজ্ঞাস্য থাকে যে যে-গদ্যরীতি রবীন্দ্র-রচনায় আগেও নেই পরেও নেই হঠাৎ 'ঘরে-বাইরে'তে তা এলো কোত্থেকে। আগে একেবারেই নেই তা কিন্তু বলা যায় না। চলতি-ভাষায় নেই, সাধুভাষায় আছে। 'কেকাধ্বনি'

প্রভৃতি প্রথম যুগের প্রবন্ধ স্মরণীয়। এ সম্বন্ধে তিনি শেষ বয়েসে বলেছিলেন যে ওগুলো গদ্য-পদ্য জাতীয় রচনা, পুরোপুরি গদ্য হ'য়ে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ ওতে কবিত্ব খুব বেশি মাত্রায় আছে, গদ্যে যতটা সয় তার বেশি। কোনো-কোনো ছোটো গল্পও এই জাতের। 'ঘরে-বাইরে'ও তা-ই। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে সাধুভাষায় তাঁর প্রথম সরকারি গদ্যরচনা বড়ো বেশি কবিত্বময় হ'য়ে উঠতে চাইতো, অথচ একই সময়ে তাঁর বেসরকারি লেখায় ঘরোয়া চলতিভাষার স্মিত সুষমা লক্ষ্য করবার। এতদিন পর্যন্ত—নাটক বাদ দিয়ে—তিনি চলতি ভাষা লিখেছেন বিশ্বের জন্য নয়, নিজের খেয়াল খুশিতে, তাই তার সহজ স্বাভাবিক স্রোতটি বাধা পায়নি। 'ঘরে-বাইরে'ই চলতি ভাষায় তাঁর প্রথম উপন্যাস, তাই এ-বই লিখতে কিছুটা আত্ম-সচেতনতা হয়তো অনিবার্য হয়েছিলো। পাছে এই ভাষাকে কেউ আটপৌরে ব'লে অবহেলা করে, এ-রকম একটা আশঙ্কা হয়তো তাঁর মনে ছিলো, তাই একে নিয়ে গেলেন একেবারে সমারোহের উচ্চতম শিখরে। চলতি ভাষাকে অমার্জিত ব'লে নিন্দে করবে এত সাহস কার! এই ত্যাখো!

এ ছাড়া আর-একটি কারণ যা হ'তে পারে তার ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়েছি। সাধুভাষার আঁটোসাঁটো কাঠামো থেকে প্রকাশ্য, অলজ্জ মুক্তির উদ্দাম উল্লাস 'ঘরে-বাইরে'র পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে আছে। যে-বিপ্লব নতুন সৃষ্টি আনে এ সেই বিপ্লব, এবং সব বিপ্লবেরই প্রথম ঝোঁকে কিছুটা বাড়াবাড়ি হ'য়ে থাকে। 'বলাকা'র যে-কবি নবীনের দিগ্বিজয়-যজ্ঞের পুরোহিত, 'ঘরে-বাইরে' তাঁরই হাতে একটি দীপ্ত লাল নিশান। এ যে বিদ্রোহের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস, তাই এ অত্যন্ত বেশি। যে-মুক্তিকে অনেকদিন মনে-মনে কামনা করা গেছে, তাকে প্রথম হাতে পাওয়ার আনন্দে এ আত্মহারা। তাই 'ঘরে-বাইরে'তে 'স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ-উন্মত্ততা।'

এই পর্যন্ত শুধু ভাষার কথা। এ-দুটি বইয়ের রসবস্তু নিয়ে আলোচনা পরে হবে।

বুদ্ধদেব বসু

স মা লো চ না

ঘরোয়া। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ। বিশ্বভারতী।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ঘরোয়া" পড়লুম। চমৎকার বই। ঘরোয়া মানে ঠাকুর পরিবারের ঘরের কথা। আমরা যখন কলকাতায় কলেজে পড়ি তখন এখানে ইংরাজী ভাষায় Gup and Gossip নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হত, যার বাঙ্গলা নাম "গল্প ও গুজব"।

অবনীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তা ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস নয়, গল্প-গুজব। তিনি অপর আত্মীয়ের মুখে যা শুনেছেন আর নিজে যা দেখেছেন সেই সব কথাই লিখেছেন; তাই বইখানি অতি সুখপাঠ্য হয়েছে। সমগ্র ঠাকুর পরিবার সম্বন্ধে দু'চার খানি পুস্তিকা আছে যা কেউ পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রায়ণের পর অনেক কাগজে তাঁর বংশাবলীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে; তার থেকে এইমাত্র জানা যায় যে কে কার সন্তান—তার বেশী কিছু নয়।

এ পরিবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই ধনী পরিবার হয়ে ওঠে। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশধরেরা পাথুরেঘাটার ঠাকুর পরিবার আর তাঁর বড় ভাই নীলমণি ঠাকুরের বংশধররা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশ, যে বংশে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং স্বগুণে স্বনামধন্য, সুতরাং তাঁর কোনও পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি চিত্রবিদ্যায় একজন আর্টিস্ট ব'লে দেশে বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু এ পুস্তকে তিনি নিজের কৃতিত্ব বিষয়ে কোনও কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি ঠাকুর পরিবারের ঘরাও কথা বলেছেন। পূর্বে বলেছি এ-পুস্তক ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস নয়, তাই বলে উপন্যাসও নয়।

পুরোনো জমিদার বংশের ইতিহাস কিম্বদন্তিতে পরিপূর্ণ, আর সে সকল কিম্বদন্তি অবশ্য বিশ্বাস্য নয়। আমি দু একটি পুরানো জমিদার বংশের বিষয় জানি, যাদের পারিবারিক ইতিহাস পূর্বপুরুষের বীরত্ব ও বিলাসিতার কাহিনীতে ভরপুর, অর্থাৎ romantic। কিন্তু অবনবাবুর "ঘরোয়া" romantic সাহিত্য নয়। যে-সব গল্পগুজব তিনি বলেছেন সবই নিরীহ। রবীন্দ্রনাথের কবি-কাহিনীই পুস্তকের প্রধান কথা ও পাঠকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক।

যে-সময়ে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হই, প্রায় সেই সময়েই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন আমার বয়েস আঠারো আর অবনীন্দ্রনাথের বছর পনেরো।

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৮

কবির বাল্য জীবনীর বিষয় তখন কিছুই জানতুম না, পরে তাঁর জীবনস্মৃতি প'ড়ে অনেক কথা জানতে পাই। অবনীনাথ যা আত্মীয় স্বজনের কাছে শুনেছেন ও চোখে দেখেছেন আমার তা দেখবার শোনবার সৌভাগ্য ঘটে নি।

রবীন্দ্রনাথের বয়েস যখন ২৫ তখন থেকেই তাঁকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানি। কোনও দু'জন মানুষের পূর্বস্মৃতি কখনোই অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় না। সুতরাং আমাদের উভয়ের স্মৃতির কিছু গরমিল আছে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা মোটামুটি সত্য। অবনীন্দ্রনাথ কবির জীবনের ইতিহাস লেখেন নি, মুখে বলেছেন, তাও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলফ করে নয়, বলেছেন গল্প হিসেবে। তাতেই তাঁর গল্প গুজব এত মনোহারী হয়েছে। এ গল্প শুনে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হয়। মুখের কথার সঙ্গে লিখিত কথার যে প্রভেদ থাকে, অবনীন্দ্রনাথের এই গল্পের বইয়ে তা সম্পূর্ণ বজায় আছে।

অবনীন্দ্রনাথের এ গল্প যখন ছাপার অক্ষরে উঠেছে তখন তা সাহিত্য হয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে এর ভাষা। আমি লেখাতেও মৌখিক কথার পক্ষপাতী। কিন্তু আমি কখনও এত চলতি কথা ও বানান ব্যবহার করি নি। অবনীন্দ্রনাথ খেয়ালমাফিক ব'কে গিয়েছেন। সে বকুনির লেখিকাকে বাহাদুরি দিই। তুমি বকে যাচ্ছ, আমি শুনে যাচ্ছি, আর পরে তা লিখে ফেলছি— এ তো সকলে পারে না। লেখিকা ঠাকুর পরিবারের ঘরোয়া লোক নন, এবং ও-পরিবারের আবহাওয়ায় বাল্যাবধি বাস করেন নি; সুতরাং তাঁর পক্ষে এ লেখা সহজ হয়নি। অবনীন্দ্রনাথ লেখিকার নাম যে পুস্তকে জুড়ে দিয়েছেন তা ঠিকই হয়েছে। এ-পুস্তক যে লোকপ্রিয় হয়েছে তার জন্য অবনীন্দ্রনাথ ও লেখিকার উভয়েরই সমান গৌরব প্রাপ্য। বিশেষতঃ অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প হাঁফ জিরিয়ে বলেছেন, একটানা বলে যান নি। অবনীন্দ্রনাথের বলবার অসাধারণ স্ফূর্তি লেখিকা তাঁর লেখায় সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে লেখিকার কলমে শ্রুতি ও স্মৃতির অপূর্ব মিলন ঘটেছে।

প্রমথ চৌধুরী

চৈত্র, ১৩৪৮

বন্দীর বন্দনা (২য় সংস্করণ), বুদ্ধদেব বসু। ডি, এম, লাইব্রেরি।

বয়স যখন অল্প, যৌবনের প্রারম্ভ, তখন কল্পনার প্রসার হয় বিস্তৃত কিন্তু তার আকার থাকে অস্পষ্ট। নিতান্ত যারা জন্ম-পাটোয়ারী তারা বাদে সাধারণ লোকের মনেও এ বয়সে দেখা দেয় কল্পনার কুজ্ঝটিকা। কাব্য-সৃষ্টির দায় নিয়ে যাদের জন্ম তাদের মনও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বভাবতই তাদের মনের কল্পনা আরও সুদূর-প্রসারী, ছায়াপথের মত অনুভূতির আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং ছায়াপথের মতই মৃদু আলোয় আলোকিত শুভ্র মেঘাকার, যার মাঝে মাঝে দেখা যায় সংহত জ্যোতিষ্কের সমুজ্জল জ্যোতি। দু-চার জন ছাড়া, যেমন কীট্স, প্রায় কবির প্রথম বয়সের কাব্য মনের এই ছায়াপথের প্রতিচ্ছায়া। বেশীর ভাগ কল্পনা নীহারিকার মত ছড়ান, আকারে গ'ড়ে ওঠে নি; কিন্তু সাধারণ মনের কুয়াশা নয়, কবি-মানসের দীপ্তি তা থেকে বিচ্ছুরিত। অল্প কিছু কল্পনা নক্ষত্রের উজ্জ্বল-কঠিন রূপ নিয়েছে, ভাবী জ্যোতিষ্ক-মালার পূর্ব্বাভাস। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। বাইরের জগৎ ও সামাজিক জীবনের সংস্পর্শে চেতন ও অচেতন মনে যে অনুভূতি সঞ্চিত হয় মনের রসায়নে তা থেকে জন্মে বিচিত্র সব ছায়ামূর্ত্তি,—ছবি, সুর, ভাব, চিন্তার। মনে কল্পনার এই প্রবাহ কাব্যের মৌলিক উপাদান। এই কল্পনার জগৎ প্রতি মানুষে ভিন্ন; কারণ এর মূলে আছে কেবল অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা নয়, সমগ্র মনের গড়নের ভিন্নতা, যা জন্মগত। কবির মনের স্পর্শানুভূতি সাধারণ মনের চেয়ে বহুতরমুখী ও অনেক বেশী তীক্ষ্ণ; সে মনের রসায়ন অদ্ভুত বিচিত্রকর্ম্মা। কিন্তু এ-কল্পনা-প্রবাহের প্রকাশ কাব্য নয়। মনে এ কল্পনার প্রবেশ ও গতি খামখেয়ালী, অসংলগ্ন, নিতান্ত সাময়িক ও ব্যক্তিগত কারণে পরিবর্ত্তনশীল। কবিকর্ম্ম হচ্ছে এই নানাত্ব থেকে যোগ্য উপাদান মূর্ত্তির একত্বে গ'ড়ে তোলা। সে মূর্ত্তির রূপ ও উপাদানের যোগ্যতা-বোধ দুই-ই যোগায় কবির সৃষ্টি-প্রতিভা। কিন্তু কবি-কর্ম্মের কৌশল আয়ত্ত করতে অনেক কবিরই সময় লাগে। প্রতিভারও আছে পরিণতি। সেইজন্য কবির প্রথম বয়সের কাব্যে অনেক কল্পনা দেখা দেয় যা অনেকটা সোজাসুজি এসেছে কবির কল্পনা-জগৎ থেকে কবির কাব্যে, কবি-কর্ম্মের গড়ন সম্পূর্ণ যারা পায় নি।

বুদ্ধদেবের প্রথম কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা'র দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে। এর কবিতাগুলি পরবর্ত্তী বই 'কঙ্কাবতী' ও বুদ্ধদেবের আধুনিক কবিতাগুলির সঙ্গে একসঙ্গে পড়লে তাঁর কবিকর্ম্মের এই পরিণতি সহজেই চোখে পড়ে। "বন্দীর বন্দনা" নামের কবিতাটির সুর বই-এর আরও কয়টি কবিতার মুল সুর,—যেমন "শাপভ্রষ্ট," "মানুষ" "মোহমুক্ত"। রক্তমাংসের

বাসনা-কামনার অনিবার্য্য আকর্ষণ, আর তাতে ধরা দিয়েও মানুষের, বিশেষ কবি-মনের, চরম অতৃপ্তি। কল্পনার বিষয়বস্তু বড়। মানুষের এই দ্বৈত-রহস্য ধর্ম্মের নানা অনুষ্ঠানে, তত্ত্বচিন্তার বহুস্তরে আত্মপ্রকাশ করেছে।

"রক্ত-মাঝে মত্তফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন,
শিরায় শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ,
লোলুপ লালসা করে অন্তমনে রসনা-লেহন।
তবু আমি অমৃতাভিলাষী!—"

"বন্দীর বন্দনা" কবিতায় এই দ্বৈতকে কাব্যের মূর্ত্তি দেওয়া হয়েছে—বন্দনার ছলে বিধাতাকে বিদ্রূপের কল্পনায় যে তাঁর সৃষ্টি মানুষ, প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী মানুষ, নিজেকে নিজে গড়েছে অমৃতের পুত্র, 'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু' ক'রে।

"প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রচেছো আমায়—
নির্ম্মম নির্ম্মাতা মম! এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার।...

* * *

বিশ্বস্রষ্টা, তুমি মোরে গড়েছো অক্ষম করি' যদি,
মোরে ক্ষমা করি' তব অপরাধ করিয়ো ক্ষালন।"

কিন্তু

"তুমি যারে সৃজিয়াছ, ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি,
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ।
বিশ্বের মাধুর্য-রস তিলে তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি;—তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে-মহা-সৃজন-কালে—তুমি শুধু জানো সেই কথা।...
আমি কবি, এ-সঙ্গীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর—
তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,
এই গর্ব মোর।
লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেল হানি'
তোমার সকাশে।"

পুনশ্চ "মানুষ" কবিতায়,—

"আমি যে রচিব কাব্য, এ-উদ্দেশ্য ছিলো না স্রষ্টার,
তবু কাব্য রচিলাম, এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।"

কাব্য-কল্পনার বিপক্ষে দার্শনিক সন্দেহ অবান্তর। সুতরাং এ প্রশ্ন তোলা চলে না যে যে-বিধাতার ইচ্ছাশক্তি বিশ্ব ও মানুষ সৃষ্টি করেছে দেহের ভোগ-কামনা কেন তাঁর সৃষ্টি, আর মনের মুক্তির বাসনা তাঁর সৃষ্টি নয় কেন! কিন্তু এই যুক্তির সন্দেহ অন্য সন্দেহ মনে আনে কাব্য-পরীক্ষায় যা প্রাসঙ্গিক।

চৈত্র, ১৩৪৮

"বন্দীর বন্দনা" কবিতা থেকে যে সব জ্যোতিষ্ক-কণা আহরণ করেছি সে সব সত্ত্বেও সমস্ত কবিতাটি কাব্যানুভূতির চোখে লাগে যেন নীহারিকাপুঞ্জ। তার কারণ কি এই নয় যে যে-বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশে এই কাব্যের গড়ন কবি তাকে নিয়েছেন গতানুগতিক বিশ্বাস থেকে। সে বিশ্বাসের উপর কবি-কল্পনার সে প্রতীতি নেই কাব্যের মায়াসৃষ্টির জন্য যা অপরিহার্য্য। রামপ্রসাদ যখন গেয়েছেন

"মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত।

*　*　*　*

আমি দিন মজুরী নিত্য করি
পঞ্চ-ভূতে খায় মা বেটে।"—

তখন, সাধন-ভজনের কথা বলছি নে, কিন্তু কাব্য-পাঠকের কল্পনায় সে "মা" জীবন্ত হয়ে ওঠেন। "বন্দীর বন্দনা"র বিধাতা কবির একটা বিশেষ ভঙ্গী প্রকাশের উপলক্ষ মাত্র। পুতুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মনে বিদ্রোহ-রস জাগান সম্ভব নয়।

"বন্দীর বন্দনা" কবিতার এ দিকটা আলোচনা করছি এইজন্য যে এর মধ্যে বুদ্ধদেবের কবিতার পরিণতির একটা দিকের তথ্য রয়েছে। তাঁর প্রথম বয়সের কাব্যের অনেক জায়গার কল্পনার অবলম্বন গতানুগতিক বিশ্বাস ও মত, যার সঙ্গে কবির মনের নিগূঢ় যোগ নেই। সে বিশ্বাস অতি প্রাচীন হোক বা অত্যাধুনিক হোক বুদ্ধদেবের কাব্য সেখানে দুর্ব্বল। মনকে আবিষ্ট করে না।

"তাই আজ মুক্তকণ্ঠে আমন্ত্রণ করি তোমা, হে সুন্দরী নারী,
সকল বিক্ষোভ আজ অতিরিক্ত সুরা-সম ফেলেছি উগারি।
নাহিকো সংশয় আর;—এতদিনে আমি বুঝিলাম—
ওগো নগ্নদেহা নারী—তোমার কী দাম!"

খুব জোরের সঙ্গেই অতি আধুনিক মোহমুক্তির বাণী অতি আধুনিক নগ্নতায় প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এ কবিতা মনকে সে 'মুডে' সম্পূর্ণ নিয়ে যায় না। কারণ এ 'মুড' কবির নিজের ধার করা, কল্পনার অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত নয়। এর ভঙ্গী ও ভাষায় যে জোর সে বাইরের জোর, এবং সেইজন্য অতিরিক্ত জোর। ওমর খৈয়মের কথা মনে পড়ে। সেও 'মোহ-মুক্তি'র বাণী। কিন্তু সে কাব্যের জগৎ ও জীবনের তত্ত্বে পাঠকের বিশ্বাস অবিশ্বাস নিরপেক্ষ তার 'মুড' কাব্য-পাঠককে সম্পূর্ণ 'হিপ্‌নটাইজ' করে। বুদ্ধদেবের কবিতাটি যে করে না তার প্রধান কারণ ও-কবিতার 'মুড' যথার্থ 'মুড' নয়, attitude মাত্র।

চৈত্র, ১৩৪৮

সম্প্রতি কেউ কেউ বলেছেন যে আমাদের বর্ত্তমান কাল শ্রেষ্ঠ কাব্য স্থষ্টির অনুপযোগী। কারণ তেমন কাব্যের স্থষ্টির জন্ত চাই বিশ্ব ও সমাজ ব্যবস্থার একটা সনাতনত্বে কবির মনের বিশ্বাস এবং তাতে কবির অন্তরের সায়। কিন্তু এ কালে কোনও কিছুর সনাতনত্বে বিশ্বাস কারও মনে দৃঢ় নয়, এবং চলতি বা কল্পিত কোনও সমাজব্যবস্থায় কারও অন্তরের সম্পূর্ণ সায় নেই। এ মতের মধ্যে সম্ভব এইটুকু সত্য আছে যে বড় কাব্য, বিশেষ 'লিরিকে' কবির কল্পনার মূলে একটা সত্য দৃষ্টির প্রত্যয় বোধ থাকে। কিন্তু এ রকম প্রত্যয় আজ আর নেই এ কথা সত্য নয়। যেমন পূর্ব্বকালে তেমনি একালে সত্য-মিথ্যা নানা বস্তুতে মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে। তার মধ্যে কোনও কিছু সনাতন নয়, সবই পরিবর্ত্তনশীল ও অপেক্ষিক—একটি। প্রকৃত কি কল্পিত কোনও সমাজব্যবস্থাই মানুষকে চরম তৃপ্তি দেবে না—আর একটি। এ কালের কবি যদি সত্যই বড় কাব্য রচনায় অক্ষম হন তার কারণ সকল প্রত্যয়ের ধ্বংসাভাব নয়; তার কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে বড় কাব্যের মূলে যে সব প্রত্যয় ছিল, যাতে আর এখন প্রতীতি নেই, তাদের ছেড়ে নব লব্ধ প্রত্যয়ের ভিত্তিতে কাব্য রচনার প্রতিভা সুতরাং সাহসের অভাব। "ন কাব্যার্থবিরামোঽস্তি যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ"। ইউরোপের মনীষী সমাজের এখানে ওখানে যে ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্বে ফিরে যাবার আগ্রহ দেখা দিয়েছে তার মূলে এই সাহসের অভাব। দান্তের মহাকাব্য যখন রচনা হয়েছিল ঐ তত্ত্বের ভিত্তিতে তখন তাতে ফিরে গেলে এ কালের মহাকাব্যও গড়ে উঠবে!

বুদ্ধদেবের কবিতা সেখানেই কাব্যের অনাবিল আনন্দ দেয় যেখানে সে কাব্যের কল্পনার মধ্যে তাঁর মনের নিবিড় আত্মীয়তার নাড়ীর সংযোগ; ঐতিহ্যের কি হাল গতানুগতিকের বাইরের চাপে জোড়া লাগান নয়। এই বাইরের চাপ বুদ্ধদেবের কল্পনা অল্পদিনেই কাটিয়ে উঠেছে। 'কঙ্কাবতী'তে এর প্রভাব নেই। তাঁর আধুনিক কবিতাগুলি, যা 'কবিতা'র পৃষ্ঠায় ছড়ান রয়েছে, এ থেকে মুক্ত। 'কঙ্কাবতী'র কবিতা

> "নিতান্ত মনের কথা, ছোটো কথা;"
> (কঙ্কাবতী। 'আমার কবিতা (রমাকে)'।)

কিন্তু কেবল 'রমা' নয়, কাব্যরসিকেরাও "খুসি হবে প'ড়ে"। প্রথম যৌবনের কল্পনায় বৃহত্ত্বের মায়া ছুটে গেছে, দেখা দিয়েছে কল্পনাকে কাব্যের গড়ন দেবার কবি-কর্ম্মের নিপুণতা। যেমন "কঙ্কাবতী"র "বেহায়া" কবিতাটি। "বন্দীর বন্দনা"র অনেক কবিতার তুলনায় নিতান্ত হালকা।

কিন্তু ছবি, ছন্দ, সুরের অনায়াস পরিপূর্ণ মিলনে এ "ড্রামাটিক লিরিক"টি কাব্য-সাহিত্যের কোণে অক্ষয় হয়ে থাকবে। হোলোই বা সে কোণ ছোট।

"কোনো বন্ধু-র প্রতি" নামের দীর্ঘ কবিতাটি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে কীট্‌স যাকে বলেছেন sublime egotism। ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজের জীবনের সঙ্গে বোনাপার্টের জীবন তুলনা ক'রে কবির জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছিলেন। এ "সাব্‌লিমিটি"র একটু "রিডিকুল্যাস্" দিক না থেকে যায় না। বুদ্ধদেবের কবিতারও আছে। "সেকালের যে রাজাদের"

" দু'টি ছিলো প্রধান ব্যসন;
* * * * *
পৃথিবী—প্রথমা প্রিয়া; তারপর, নারী।"

পৃথিবী থেকে অনেকদিন তারা লোপ পেয়েছে। তাদের জীবনাদর্শের মাপে আজ কোনও কিছুকে মাপা কাব্যের কল্পনাতেও নিরর্থক। কিন্তু এ egotism ছাড়িয়ে কবিতার দ্বিতীয় পর্ব্বে যখন কবি-চিত্তের আশা-আশঙ্কা বেজে উঠেছে তখন অকবি পাঠকেরও মনের তার হার্মনিতে বেজে ওঠে।

" না, না,—নহে কবি-যশ,
মহান কাব্যের বুকে নহে সে নামের অমরতা।
* * *
...কিন্তু যেই আত্মার আলোক
শুভ্র আলোকের কণা এ-বারের এ-জন্মের মতো
লভেছিনু, তার দীপ্তি কভু নিবিবে না, তার গতি
যুগ হ'তে যুগান্তরে অবিরাম চলিবে বহিয়া,
নব-নব কবিদের জন্ম-ক্ষণে নামিবে আবার—
বিধাতার স্তুতি-লেখা জ্বালি' দিবে তাঁদের ললাটে;
তোমার, আমার স্পর্শ তারি সাথে লভিবেন তাঁরা।"

সকল কবির Ode on the Imitations of Immortality।

"অমিতার প্রেম", "মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান", "অপর্ণার শত্রু"—সেই শ্রেণীর কবিতা যার প্রকাশ-ভঙ্গী বাংলা কাব্য-সাহিত্যে একটু নূতন রূপ এনেছে। এই প্রাথমিক কবিতাগুলি অনাবশ্যক দীর্ঘ, এবং সমগ্র কবিতা মূল কল্পনা থেকে যেন স্বচ্ছন্দগতিতে বেরিয়ে আসে নি, কিছু আয়াসের চিহ্ন আছে। কিন্তু এ সূচনা। "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।"

"বিজয়িনী" ও "পরাজিতা"—যুগ্ম সনেট দুটির "মদনভস্মের পূর্ব্বে" ও "মদনভস্মের পরে"র ধ্বনি বাঙ্গালী পাঠকদের আনন্দ দেবে।

"ক্ষণিকা" কবিতার আরম্ভে আছে,

"আমরা রচেছি আজ প্রেম-মুগ্ধ, মধুর মিলন
মিলাইয়া বাস্তবে স্বপন;"

চৈত্র, ১৩৪৮

বই-এর শেষ কবিতা "মোরা তার গান রচি"তে প্রশস্ত জীবন-নদীর কল্পনা,—

"মিশে আছে সোনা আর ধূলা যার সলিল শীকরে।"

নিখাদ বাস্তবে আর অমিশ্র ধূলায় হয় ত কাব্য গড়া চলে, কিন্তু সে কাব্য গড়ার চেষ্টা বুদ্ধদেবের কাছে পরধর্ম্ম। তাঁর কল্পনা যেখানে বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্ন মিলায়, বালুতে স্বর্ণরেখা দেখতে পায় সেখানেই সম্পূর্ণ কাব্যের মূর্ত্তিতে গড়ে' উঠতে পারে। তাঁর কাব্যসৃষ্টির এই স্বধর্ম্ম, যাতে নিধন নেই। সে কাব্য সত্য কথা হয়ত বলতে পারে না, কিন্তু কাব্য-কথা বলে।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

পৌত্তলিক, হরপ্রসাদ মিত্র।

রুদ্রবসন্ত
তিহাং নদীর বাঁকে } অশোকবিজয় রাহা

আকাশ ও অন্যান্য কবিতা, মৃণালকান্তি দাশ।

আজকালকার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আবহাওয়াটা বোধ হয় কবিমনের পক্ষে খুব স্বাস্থ্যকর নয়। বিশেষত যখন দেখি উদীয়মান শক্তিশালী লেখকদের রচনা কবিতা হতে হতে জোর করেই শেষ মুহূর্ত্তে বেঁকে দাঁড়িয়েছে, তখন 'পরিস্থিতি' যে গুরুতর সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতি সকলের মনেই ছাপ দেয়, লিখ্‌তে গেলেই, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, রচনায় তার প্রকাশ সম্ভব ও স্বাভাবিক। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা, অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে, অতি প্রকট না হয়ে একটু প্রচ্ছন্ন থাক্‌লে তার ফল ভালো ছাড়া মন্দ হয় না। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে সম্প্রতি কয়েকজন প্রকৃত ক্ষমতাশালী কবির আবির্ভাব হয়েছে। এঁদের কবিমনের পরিচয়—এঁদের সজ্ঞান চেষ্টা সত্ত্বেও—রচনাতেই স্বপ্রকাশ। ছন্দের উপরও এঁদের অনেকেরই অসাধারণ দখল। তবুও ভাবতে দুঃখ হয় যে এত ক্ষমতা সত্ত্বেও এতখানি রচনার মধ্যে সত্যি সত্যি কতটুকু জিনিষ এঁরা আমাদের দিতে পেরেছেন। অনেক সময়ই একটা চমৎকার কবিতা পড়তে পড়তে মনটা যখন কবিত্বের অচ্ছোদজলে ডুব দিয়েছে, তখন হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে আসে খুব সত্য এবং অনতিক্রম্য পাঁকের গোলায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বড় বেশি কাছের জিনিষকে ভালো করে' দেখা যায় না, দূরে থেকে

দেখ্‌লেই দেখা যায় তার সম্পূর্ণ সত্যরূপ। একটা আধুনিক কবিতা পড়তে পড়তে সেই কথাই মনে হচ্ছিলো।

নতুন রোদের সোনা,
পৃথিবীতে নতুন সকাল,
দিগন্তে শবের হাসি চাঁদ।
হিট্‌লার, মুসোলিনি, চার্চিল, দেশি গান্ধীবাদ
চারিদিকে কী অমোঘ ফাঁদ। (বুধ—পৌত্তলিক)

হিটলার, মুসোলিনি এঁরা নিরেট, অমোঘ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু কাব্যের উচ্চতর স্তর থেকে দেখলে হয়তো দেখা যাবে যে এই মহামহারথীরা সব মিলে মিশে একটা idea মাত্রে পর্যবসিত হয়ে গেছেন। আমার মতে সেইরকম idea গুলোই কাব্যের উপজীব্য।

হরপ্রসাদ মিত্রের 'পৌত্তলিক' পড়তে পড়তেই বিশেষ করে' এসব কথা মনে হচ্ছিলো। কারণ, 'পৌত্তলিকে'র কয়েকটি কবিতাতেই দেখি প্রকৃত কবিত্বের অসম্পূর্ণ পরিচয়। সুখের বিষয় একথা তাঁর মাত্র কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু ধরুন,

"দেখিলাম বহুদূর পাহাড়ের নীচে
কী নিথর বনছায়া কাঁপে!
দুপুর তো যায়···
কে ঘুমায়?
—মণিমালা রায়। (প্রেম)

একটি সুন্দর রেখাচিত্র—এবং কবিতা। কিংবা ধরুন—সম্পূর্ণ কবিতাটিই উদ্ধৃত করছি—

গোধূলিতে আকাশ হ'লো নীল,
নিঃসঙ্গ একটা গাছের মাথা
ছাদের সমান উঠেছে।
—পূর্ণিমার সমুদ্রে সুদূর অস্পষ্ট এক দ্বীপ!
হঠাৎ মনে পড়ে
কবে দেখেছি তাকে রোগশয্যায়,
কালো পাহাড় থেকে নেমে-আসা
শীর্ণ একটি জলের ধারা। (গোধূলিতে)

অনাড়ম্বর সারল্যে আন্তরিক আবেগের সুন্দর প্রকাশ। কিন্তু আমার মনে হয় হরপ্রসাদ যেখানেই অত্যন্ত আত্মসচেতন, সেখানেই তাঁর এ আন্তরিকতা যেন পাঠকের মনে তেমন করে' আর লাগে না।

হরপ্রসাদের প্রকাশের ভঙ্গীটি ভারি সুন্দর, দেখ্‌বার চোখ ও দেখাবার কায়দা দুটোই তাঁর আয়ত্তে। বাক্‌সংযম, ছন্দের উপর দখল এবং প্রকাশের

চৈত্র, ১৩৪৮

সারল্য—এক কথায় সার্থক কাব্য-রচনার যা-যা প্রয়োজন—সবই হরপ্রসাদ মিত্রের আছে। 'পৌত্তলিক' একখানা ভালো কবিতার বই, একথা স্বীকার্য। কিন্তু হরপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করি তাঁর 'তুমি' কবিতাটির মতো অমন চমৎকার একটি ভাবদিগ্ধ কবিতার প্রথম দু'টি লাইন—

অটোমোবিল সমিতির ফলক:
সাবধান সম্মুখে বিপদ।—

কি একেবারে নিরর্থক নয়? পাঠকের মনে চমক লাগিয়ে দেওয়া ছাড়া ওর কি আর কোনো উদ্দেশ্য আছে?

হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতা আমার ভালো লাগে এবং তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চাশা পোষণ করি বলেই এসব কথা বলা প্রয়োজন মনে করলাম। তাঁর 'পৌত্তলিক' গ্রন্থের 'প্রেম', 'গোধূলি' 'স্মৃতি' কবিতাগুলি আমার বিশেষ ভালো লেগেছে। এবং 'বুধ' কবিতাটি হিটলার মুসোলিনির অনধিকার-প্রবেশ সত্ত্বেও উপভোগ্য। 'পৌত্তলিকে'র কবিতাগুলোতে আধুনিক খ্যাতনামা অনেক কবির প্রভাব এখনও স্পষ্ট। কিন্তু এটা নিন্দার বিষয় নয়। 'পৌত্তলিকে' বৃহৎ সম্ভাবনা আছে এবং তার চেয়ে বেশি আমাদের আশা করা বোধ হয় উচিতও নয়।

শ্রীহট্টের অশোকবিজয় রাহার একসঙ্গে প্রকাশিত 'রুদ্রবসন্ত' আর 'ডিহাং নদীর বাঁকে' এক নতুন তাজা আবহাওয়ার ঘ্রাণ নিয়ে এলো। 'ডিহাং নদীর বাঁকে' একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য, একথা নিঃসঙ্কোচে, নিঃসন্দেহে বলা যায়। বইখানি ত্রুটিশূন্য নয় কিন্তু অসাধারণ। আজকালকার দিনে এমন অনাড়ম্বর কবিতা লেখা, এমন শহুরে অতিবিদ্যার খপ্পর থেকে মুক্ত থাকা, বোধ হয় শ্রীহট্টবাসী বলেই অশোকবিজয় রাহার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এবং আশা করি খুব শিগগিরই তিনি কলকাতাবাসী হবেন না। "ডিহাং নদীর বাঁকে"তে কয়েকটি আশ্চর্য ভালো প্রেমের কবিতা আছে—এবং যদিও "মেঘলা দিনে" কবিতাটিতে বুদ্ধদেব বসুর প্রতিধ্বনি অত্যন্ত স্পষ্ট তবু এর সহজ সৌন্দর্য প্রকৃতই উপভোগ্য। এ ছাড়া "স্মারক", "একটি রূপকথা" "নাগকন্যা", "মধুচন্দ্রিকা" উল্লেখযোগ্য কবিতা। শেষোক্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করছি:

"তোমার বিছানা হতে হঠাৎ উঠে
চুপি চুপি একবার আসিবে ছুটে,
ভেজানো দুয়ার দিয়ে একটু হাওয়া।
একটু চুড়ির সুরে চমকে চাওয়া,
পিঠ্‌ভরা এলোচুল পাখার মতো,
ঠোঁট দুটি ঠোঁটে এসে হঠাৎ নত।"

অশোকবিজয় ছবিগুলি আঁকেন বড় সুন্দর। এবং সে-সব ছবির মধ্যে আছে তাঁর প্রকৃত কল্পনাশক্তির পরিচয়। আমার হাতে যে-বইখানা পড়েছে, দুঃখের বিষয় বাঁধানোর গোলমালের দরুণ তাতে শেষ কবিতা "রাত্রির যাত্রী" অসম্পূর্ণ। কিন্তু যেটুকু অংশ আছে তার মধ্যে মিলের আশ্চর্য কৌশল আমাকে মুগ্ধ করেছে। অথচ 'ডিহাং নদীর বাঁকে'র অধিকাংশ কবিতাতেই অশোকবিজয় মিল বর্জন করেছেন কেন বুঝলাম না।

দুঃখের বিষয় "রুদ্রবসন্তে"র এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা সম্ভব নয়। আমি আশা করছি এটাই আগেকার লেখা, এখানে যে কেবল লেখকের কল্পনার প্রসার কম তা নয়, এখানে 'ট্রাম', 'বাস্', 'পেট্রোল', 'ইয়োরোপ' 'বিংশ-শতাব্দী' ও 'চিৎপুর' এরা সবাই ভিড় করে' কবিতার স্থান সঙ্কীর্ণ করে' তুলেছে। রুদ্রবসন্তও সুরচিত কিন্তু "ডিহাং নদীর বাঁকে"র রচয়িতার পূর্ববর্তী রচনা হবার উপযুক্ত মাত্র।

মৃণালকান্তি দাশের "আকাশ ও অন্যান্য কবিতা"র কবিতাগুলোতে একটা কোমল মাধুর্য আছে, যা অনেকেরই ভালো লাগবে। 'আকাশে'র অধিকাংশই প্রেমের কবিতা, এবং বিষয়ের সঙ্গে মৃণালকান্তির রচনাভঙ্গী চমৎকার খাপ খেয়েছে। বইখানি পড়ে' মনে হয় মৃণালকান্তি আধুনিক কোনো কোনো কবির উৎসাহী পাঠক; কেননা তাঁদের কাব্যের ছায়া এঁর রচনায় খুবই স্পষ্ট। 'আকাশে'র কবিতাগুলোর বেগ অত্যন্ত লঘু, উষ্ণতা এখানে কম, যদিও কবিতাগুলোর একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আছে। তরুণ কবিদের রচনায় আর একটু আবেগ থাকা বোধ হয় ভালোই। তাতে প্রাণশক্তিরই প্রাচুর্য সূচনা করে।

অজিত দত্ত

সঞ্চারী—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রকাশক—কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা, মূল্য এক টাকা।

সঞ্চারী বিমলাপ্রসাদ বাবুর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ।

বিমলাবাবুর কাব্যের প্রধান লক্ষণ হইতেছে স্বল্পভাষিতা এবং অনেক স্থানেই তীক্ষ্ণভাষিতা। বুদ্ধিপ্রধান কবিসত্তা সমগ্রভাবে ব্যাপৃত নয় বলিয়াই কবি ধীরে সুস্থে ছাঁটিয়া ছুলিয়া কবিতার ছত্রগুলিকে তীরের

কলার মত লঘু ও তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিবার সচেতন সুবিধা পাইয়া থাকেন। বিমলাবাবুর ভাষায়—তাঁহার কাব্য—

"গোপন উৎস হ'তে
নেমে আসে স্রোত তীক্ষ্ণ ভাষার উপল-কঠিন পথে।"

—বিমলাবাবুর কবিতা পড়িলে মনোযোগী পাঠক বুঝিতে পারে যে প্রত্যেকটি শব্দের উপরে কবির আত্মসমালোচনার হাতুড়ির অনেকগুলি আঘাত পড়িয়াছে—কিন্তু প্রত্যেক আঘাতের ফলে শব্দগুলি সুন্যস্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—ভোঁতা হইয়া যায় নাই।

বিমলাবাবুর কাব্যের দ্বিতীয় লক্ষণ হইতেছে ইহার অন্তর্নিহিত শ্লেষ—কিংবা irony।

বিমলাবাবুর কবিতায় যে দীপ্তি তাহা চকমকি পাথরের; চোখ ঝলসাইয়া দেয়—আবার অগ্নিকাণ্ড বাধাইতেও বাধা নাই।

শ্লেষ প্রকাশের পক্ষে couplet রচনায় দক্ষতা আবশ্যিক। Couplet রচনায়, সমস্ত কবিতার শেষে চরম দুইটি হাতুড়ির আঘাতদানে, বিমলাবাবুর দক্ষতা উল্লেখযোগ্য।

"তপোবনে কভু থাকি নাই তাই, জানি না তাহার দান
শুধু শুনিয়াছি সেখানেও ছোটে পঞ্চশরের বাণ।"

'নির্ব্বেদ' কবিতার শেষতম ছত্রটি মারাত্মক—যার ঘাড়ে পড়িয়াছে তার কি অবস্থা ভাবিতেছি।

তব বেদান্ত মোর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ।

তাঁহার 'তির্য্যক' কবিতার শেষের চারি ছত্র—

"সবি হেথা সূচীমুখ
ধ্বনি ব্যঞ্জনা আলোচনা আর কবিতা প্রণয়রীতি।
শুধু লাগে অহেতুক,
হুল-ফোটানোর মন্তর-জানা গৌড়ী রসের প্রীতি।"

এই জাতীয় কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'প্রতিষ্ঠা' নামে কবিতাটি—এক হিসাবে বইয়ের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ কবিতা। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য-হানি করিব না—আগাগোড়া পড়িতে অনুরোধ করি।

বিমলাবাবুর কবিতার তৃতীয় লক্ষণ হইতেছে বিমলাবাবুর মনস্তত্ত্ববিদের দৃষ্টি আছে—যার ফলে শুধু প্রকাশের উপরে নয়, মানসিক প্রক্রিয়ার উপরেও তাঁর দৃষ্টি আছে; কিম্বা প্রকাশের চেয়ে প্রক্রিয়াটার মূল্যই তাঁর কাছে অধিকতর। কবি নিজেই বলিয়াছেন—

"প্রসঙ্গ-চেয়ে পদ্ধতি মম দামী।"

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৮

বাংলা গল্পে উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ কিছু কিছু হইয়াছে, কবিতায় তাহা এখনো আরম্ভ হয় নাই বলিলেই চলে; বিমলাবাবুর কাব্যে তাহার সূচনা আছে বলিয়া মনে হয়। বিমলাবাবুর কবিতার চতুর্থ গুণ তাঁহার চিত্ররচনার ক্ষমতা।

"পাড়াগাঁয়ের স্তব্ধ দুপুর…
দূরে দিগন্ত মেশা মাঠে সূচীমুখ রৌদ্রে
বুড়ো চাষা বোঝা-মাথায়
ধুঁকছে তবু চলেছে।
কলা-বাগানের আধ ছায়ায়
ক্ষেতের নতুন কড়াইশুঁটি খেতে খেতে
আমরা দু'জনে তখন হেসেই লুটোপুটি,
কী যেন কথায়…… "

আর কতকগুলি কবিতা আছে, যেগুলিকে কোন রকমেই আধুনিক বলা যায় না—যদিও ষোল আনাই কবিতা, ব্যক্তিগত ভাবে সেগুলি আমার প্রিয়। যেমন,—'বলেছ আসিবে তুমি', 'যেদিন আসিবে তুমি,' 'ত্রয়ী', 'ট্রায়াড্‌স' 'স্বপ্ন'।

ইহার বেশি পরিচয় দিতে হইলে আগাগোড়া বইখানি উদ্ধৃত করিতে হয়—আর সে কাজও খুব কঠিন নয়, কারণ বইখানি খুব ছোট। পরিচয় প্রসঙ্গে কোন পাঠকের কৌতূহল যদি জাগ্রৎ করিতে পারিয়া থাকি—তবেই আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

প্রমথনাথ বিশী

পূর্বলেখ : বিষ্ণু দে। কবিতা ভবন। ১৸০। শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের আঁকা পচ্ছদপট।

"পূর্বলেখ" শুধু সংখ্যার দিক থেকে নয়, বিষ্ণুবাবুর কাব্যবিকাশের নিজস্ব দিক থেকেও তৃতীয় পর্যায় সন্দেহ নেই। "উর্বশী ও আর্টেমিস্‌" থেকে "চোরাবালি" এবং "চোরাবালি" থেকে "পূর্বলেখ"—প্রত্যেকবারই তিনি বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হয়ে চলেছেন।

প্রথম কবিতা "বিভীষণের গান" যেন ফতোয়া কবিতা। রাক্ষসরা স্বর্ণ-লঙ্কা গড়েছিল লুণ্ঠিত অর্থে, বিভীষণ তাদের দিক ছেড়ে গেল মানুষের দিকে, নির্যাতকের শ্রেণী ছেড়ে নির্যাতিতের শ্রেণীতে। কবিও দিক বদল করেছেন। টীকার সাধারণ শোনালো, কিন্তু বিষ্ণুবাবুর কাব্যে অপরূপ। সেটাই প্রতিভা, দিকবদলটুকু উপলক্ষ হয়ত। তবু সার্থক সন্দেহ নেই;

কারণ এতদিন তাঁর কবিতায় বিশ্বাসের মূলসূত্র ছিল না, "পূর্বলেখে" তা এল। এটা তাঁর অগ্রগতির প্রধান লক্ষণ ব'লে মনে করি, কারণ মহৎ কাব্যে বিশ্বাস, তা যে জাতেরই হোক, অনিবার্য: নইলে শেষ পর্যন্ত দানা বাঁধে না। এবং সব চেয়ে সুখের কথা বিষ্ণুবাবুর বিশ্বাস বিচারনির্ভর ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিপ্রসূত।

আহা! আজ যদি পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ
মন্থিয়া নীল অভ্রচক্র ঘর্ঘরে
লুকাব না কেউ প্রকারছায়ার গহ্বরে!
স্বাগত গেয়েছি জগতে নাচায় দীর্ঘকাল,
হে বজ্রপাণি! স্বধর্মে মোরা সন্দিহান।

ঠাট্টা আছে কিন্তু আভিজাতিক ভঙ্গিটা নেই। "চোরাবালির" চটুল ও চালিয়াৎ নায়ক নায়িকাদের দেখা পেলুম না। আজকের মিছিলটা একেবারেই আলাদা—

বীরদল চলে হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ।" (বৈকালী)

সামাজিক ক্ষয়ের চেতনা কবির মধ্যে অনেক বিশাল ও গম্ভীর হয়েছে। একটা ফূর্তির ভাব অবশ্য আছে, কিন্তু সেটাও হাল্কা নয়, তাছাড়া পটভূমি "চোরাবালি"র চেয়ে অনেক ব্যাপক। ধরুন "মুদ্রারাক্ষস"। বিষ্ণুবাবু ব'লে নিয়েছেন "কবিতাগুলির অধিকাংশই ১৯৩৫-৪০ সালে সামাজিক উপলক্ষ্যে বা ফরমাসে লিখিত।" উপলক্ষ্যটা হয়ত হালের কোনো রাজনৈতিক সভা, অন্তত তাতে বাহান্নটি বলদের সঙ্গে একান্নটি প্রণামের যোগাযোগ ঘটিয়ে কৌতুক জমে বেশি। এর সঙ্গে "চোরাবালি"র ব্যঙ্গকবিতাগুলির তুলনা করুন ("কবিকিশোর" বা ওই ধরণের যাই হোক)—কবি সেখানে চঞ্চল ও অতৃপ্ত সন্দেহ নেই, তাঁর নায়ক নায়িকারাও খেলো, অন্তঃসারশূন্য। তবু কবির জগৎ এদের নিয়েই। অর্থাৎ দৃষ্টি যথেষ্ট ব্যাপক হয় নি।

"চোরাবালি"র প্রেমের কবিতা বিস্ময় এনেছিল, সেখানে কবির সুকুমার মন ধরা পড়েছে। অভিজ্ঞতা আর চিন্তার দিক থেকে সে মন তখনো এত বিজ্ঞ হয় নি, কিন্তু প্রত্যেকটি কোমল বৃত্তি সৃজনীশক্তিতে অপূর্ব্ব। উদাহরণ—"ঘোড়সওয়ার" "ক্রেসিডা" ইত্যাদি। "পূর্বলেখে" এ মন বিজ্ঞ হয়েছে, ভোঁতা হয় নি। আধুনিক মনে প্রেমের যে বিকাশ তা অবশ্য "চোরাবালি"তে ও ছিল, প্রেমের বিকৃতি নিয়ে বিক্ষেপও ছিল, কিন্তু মোটের উপর একটা হাল্‌কা ভাব—

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে দেবে
উধাও আজো হয়নি আমার মন।

এর সঙ্গে "পূর্বলেখে"র তুলনা করুন,

> বিদায়! তন্বী! পৃথুল পৃথিবী তোমায় ডাকে
> সভ্য লোকের প্রবল স্বার্থে হে বন্দিনী!
> ... ...
> তুমি ভেসে যাবে তুচ্ছ মোদের সচ্ছলতায়...

মন বিজ্ঞ হয়েছে, তাই বিষাদটাও অনেক গভীর। ভাবালুতা নেই, কারণ কবি জানেন এ সমাজে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। তবু তিনি পাকা সংসারীর ভান করে সিনিক-সুলভ মুখোস খুঁজছেন না, ওটাও এক ধরণের বক্র ভাবালুতাই। ভাবুকভাবটুকু রইল শুধু।

"পূর্বলেখে"র প্রধান কবিতা "জন্মাষ্টমী" আর "পদধ্বনি"।

"পদধ্বনি" মহাভারতের মৌষল পর্ব্বের শেষ দুটি অধ্যায়কে আশ্রয় করে লেখা: যদুকুল ধ্বংস হয়েছে, ধনঞ্জয় তখন যদুবংশীয় কামিনীগণ ও ধনরত্ন নিয়ে পঞ্চনদ দেশে। এমন সময় দস্যুদল আক্রমণ করল, কুরু-ক্ষেত্রের বীর বাধা পর্যন্ত দিতে পারল না, তাও নিছক শক্তির অভাবে। মহাভারতের ঐতিহ্য যাঁদের মনে আছে তাঁরা বোঝেন কী বিরাট ট্রাজেডি। নাটকীয় পরিস্থিতির চূড়ান্ত। এই বিরাট নাটক বিষ্ণুবাবু মাত্র কয়েক পৃষ্ঠায় পুরে দিয়েছেন, মহাভারতের আবহাওয়া তাঁর গম্ভীর বলিষ্ঠ ছন্দে।

> চোখে তার কুরুক্ষেত্র, কানে তার মত্ত পদধ্বনি,
> ক্ষমা করো অতিক্রান্ত জীর্ণ অহংকারে।
> ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার!
> হে সঞ্জয়, ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব অক্ষয়।

মনে মহাভারতের সংস্কার থাকলে এ-কবিতা পড়ে একটা প্রথম শ্রেণীর নাটক পড়বার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়, এবং এটুকুতে শেষ হলেও কম নয়। কিন্তু পুরো কবিতার প্রতীকটা যদি নেওয়া যায় তা হলে রস আরো জমবে সন্দেহ নেই, কারণ তা হলে এটা একেবারে আজকের দুনিয়ার কবিতা। ধনঞ্জয় তখন পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রতীক। যতদিন এ সভ্যতার শিরায় রক্ত ছিল যৌবনে চঞ্চল, ততদিন তার ইতিহাস শুধু দিনের পর দিন জয়ের ইতিহাস। এখন ভাঙন ধরেছে, পুরোনো শক্তি নেই, স্মৃতিটুকু আছে মাত্র। তাই অনার্য আক্রমণে বাধা দিতে পারে না, একে দস্যুবৃত্তি বলে অথর্ব্ব অভিসম্পাত করে শুধু—

> স্মৃতির ঐশ্বর্যে ধনী বার্ধক্যবাসরে
> সঞ্চিত অতীত্র জানি গচ্ছিত জীবন,
> তবু অভিমানী
> কেন অকারণ পক্ষবিধূনন! আর সেই পদধ্বনি!

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৮

ও কি আসে নগ্ন অরণ্যের
প্রাকপুরাণিক প্রাণী? —

এই প্রতীকী অর্থ গ্রহণ করলে দেখব "পূর্বলেখ" ঠাসবুনোনির চাদর, আর টানাপোড়েন দুদিকের সুতোই চিন্তার পাকে মজবুত। অর্থাৎ, ব্যষ্টিদৃষ্টিতে প্রত্যেক কবিতায় যে বিশ্বাস সমষ্টিদৃষ্টিতে সমগ্র গ্রন্থে তারই বিকাশ। এতে প্রমাণ হয় বিশ্বাসটা গভীর তার ব্যাপক।

চিন্তার দিক থেকে "জন্মাষ্টমী" বিষ্ণুবাবুর চরম রচনা। নানান ছবি,—এলোমেলো, অনেক সময়ে একান্তই খাপছাড়া। একেবারে আধুনিক মনের প্রতিচ্ছবি। শৃঙ্খলা দূরের কথা, একটা শান্ত ভাব পর্যন্ত নেই। প্রচ্ছদপটের ছবিটা জলজলে হয়ে ওঠে, ভাঙাচোরা, বিশৃঙ্খলতা, বীভৎসতা। সেখানেও আধুনিক মনকে শিল্পী নগ্নভাবে এঁকেছেন। বস্তুতঃ, যামিনীবাবুর ছবির সঙ্গে আধুনিক কাব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; দুয়ের উৎস এক, প্রভেদ শুধু ভাষায়।

আধুনিক মনের ভগ্নস্তূপে সংলগ্নতা অন্বেষণ নিষ্ফল—সমাজের ভিত্তি প্রলাপের ভিত্তি, তার প্রতিচ্ছবিতে সংলগ্নতা জুটবে কোথা থেকে? অবশ্যই সচেতন শিল্পী জানেন এই প্রলাপই চরম কথা নয়, ইতিহাসের রথচক্র ঘুরবে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে আসবে নবজন্ম। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত প্রলাপটা প্রলাপই।

"জন্মাষ্টমী"র কথাও এই। এ জীবনের ব্যর্থতা, পঙ্গুতা কবির মধ্যে প্রায় আবেশে পরিণত হয়েছে। অবশ্যই তিনি জানেন এতেই শেষ নয়, তাই বলে এখন থেকে জয়গান ধরাটাও শৈশবসুলভ। জন্মাষ্টমীতে নবজন্মের প্রার্থনা রইল, জয়গান নয়। বৈশ্যসভ্যতার সুরুতে যে জয়গান এসেছিল আজকের কবি তাতে সান্ত্বনা পেলেন না—"বন্ধু, ও গান নয়।" নতুন গান আসবে, নবজাতকের গান, জন্মাষ্টমীর গান। কিন্তু এখন তা কোথায়?

অগণন ভিড়াক্রান্ত এ সহরে, হে সহর স্বপ্নভারাতুর।
লেক আর খালপার, এস্‌প্লানেড্ আর চিৎপুর।

কবি তবু দৈনিকপত্রিকার কেরাণী নন, শুধু রিপোর্ট সংগ্রহই তাঁর কাজ নয়। বর্ণনায় শৃঙ্খলা না থাকলেও ব্যক্তিত্বের সংহতি রইল। এলোমেলো ভাঙাচোরার মধ্যেও তাই আর একটা একটানা সুর পাই, কবির সুকুমার মন থেকে সে সুর উঠ্‌ছে, সে মন সুন্দরকে চায়।

উদাহরণ—

আমি যেন গ্রাম্যজন
বসে আছি বিমূঢ়, উৎসুক,
সংসারের কলজনে ঝিকিঝিকি বাকি থাকে, কেটে যায় বেলা—ইত্যাদি

কিংবা—

অমাকৃষ্ণ তমিস্রারে দুই হাতে ঠেলে ঠেলে কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের ব্যূহ ভেদ করে
চলেছে দুর্জয় একা, পদক্ষেপে ছড়ায়ে রিক্ততা—ইত্যাদি।

অথচ প্রতি পদে ব্যর্থতা, সব আশা ভেঙে চুরে মিশমার হচ্ছে। জন্মাষ্টমী এই জুড়ি সুরের গান।

অবশ্যই "জন্মাষ্টমী" ও "পদধ্বনি",—এবং পূর্বলেখের প্রায় সমস্ত কবিতায়—সব চেয়ে আশ্চর্য বিষ্ণুবাবুর ছন্দকৌশল। সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকায় সে আলোচনা বালিশভাষণে পরিণত হবার ভয়, তাই বিরত হলুম। যোগ্যতর সমালোচক ওদিকে মন দেবেন আশা করি।

* * *

লড়াইএর ফলে সম্পাদকের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতি সংকীর্ণ, তাই "পূর্বলেখ"কে পুরো মর্যাদা দেওয়া গেল না। সংক্ষেপে সম্পূর্ণ আলোচনার শক্তি নেই বলে লজ্জিত।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কাব্য-জিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। দ্বিতীয় সংস্করণ। আষাঢ়, ১৩৪৮। ৸০+৯৬ পৃ। সুচারু বাঁধাই। দেড় টাকা।

অতুলবাবুর 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' বাঙ্‌লা ভাষায় কাব্য ও রসবিচার সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা সুলিখিত ও সুপরিচিত প্রামাণ্য গ্রন্থ। তেরো বছর আগে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল; সে-সংস্করণের সব পুঁথি নিঃশেষে বিক্রী হ'য়েছে কি না, তা' নিয়ে গ্রন্থকার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। না হ'য়ে থাকলেও কিছু এসে যায় না, কারণ, সাম্প্রতিক সাহিত্য-বিচারে যে নৈরাজ্য চলেছে তা'তে এই অমূল্য বইখানি নতুন করে বাঙালী সাধারণ পাঠক, সাহিত্য-রচয়িতা ও সমালোচকদের চোখের সম্মুখে ধরা প্রয়োজন ছিল। সেইজন্যেই এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ খুব সময়োচিত হ'য়েছে। আর এক কারণেও নতুন সংস্করণের প্রয়োজন ছিল; একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতর পরীক্ষায় বইখানি পাঠ্যতালিকাভুক্ত, এবং সাহিত্য-বিচার এবং রসতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো বই যদি পড়াতে হয় তা'হলে নিঃসন্দেহে এ বইখানিরই নাম করতে হয়; অথচ বইখানা বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল না।

কবিতা

চৈত্র, ১৩৪৮

অতুলবাবুর এই বইখানার প্রশংসা করা বাহুল্য মাত্র, কারণ, এ-বই প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। আলোচ্য বিষয়ে 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' বাঙ্‌লা ভাষায় 'ক্লাসিক' পর্যায়ভুক্ত বল্‌লে কিছু অত্যুক্তি করা হয় না। কাজেই সে-চেষ্টা করবো না। এই বইয়ে তিনি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতামত অবলম্বন করে সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি মূল প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন, এবং ধ্বনি, রস, কথা ও ফল এই চারিটি মুখ্য বিষয়কে আশ্রয় করে তাঁর আলোচনা কেন্দ্রীকৃত করেছেন। তার ফলে কোথাও কোথাও বক্তব্য বিষয়ের পুনরুক্তি ঘটেছে, কিন্তু তা'তে কিছু ক্ষতি হয় নি, কারণ একই জিনিষ বিভিন্ন দিক থেকে দেখার ফলে বক্তব্য আরও স্পষ্ট হ'য়েছে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র জটিল অরণ্য, অথচ সেই অরণ্যকেই অতুল বাবু মনোরম উদ্যান করে গড়ে তুলেছেন স্বল্প পরিসর এই গ্রন্থের মধ্যে। স্পষ্টতই তিনি আলঙ্কারিকদের সমস্ত আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন নি', কাব্য অর্থাৎ সাহিত্য সম্বন্ধে প্রধান কয়েকটি জিজ্ঞাসাই তাঁর আলোচ্য। অতুলবাবু যে রসবোদ্ধা এবং আধুনিক মনের জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে যে তিনি সজাগ তা আমরা বুঝ্‌তে পারি এই নির্বাচন থেকে। কাব্য সম্বন্ধে, এক কথায় সাহিত্য সম্বন্ধে, একান্ত সাম্প্রতিক জিজ্ঞাসাও যে তাঁর মন ও দৃষ্টি এড়ায়নি' সে পরিচয় পাওয়া যায় পরিশিষ্টে রংপুর সাহিত্য-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির যে অভিভাষণ-রচনাটি দ্বিতীয় সংস্করণের নতুন যোজনা তা' থেকে। লেখকের রসবোধের প্রমাণ আরও পাওয়া যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সব উদাহরণ তিনি নিজে সংগ্রহ করেছেন বাঙ্‌লা, সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য থেকে এবং যে উপায়ে তিনি তাদের বিশ্লেষণ করেছেন. তার ভেতর, বিশেষ করে মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্ব থেকে এবং রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' থেকে যে দু'টি অপূর্ব দ্যুতিময় রত্ন উদ্ধার করে যে-ভাবে তাদের রসের ইঙ্গিত আমাদের চিত্তের নিকটতর করেছেন তারও ভেতর।

লেখক যে-ক'টি প্রধান জিজ্ঞাসার আলোচনা করেছেন, সে-সম্বন্ধেও নানা অলঙ্কারিকের নানা মত ও ব্যাখ্যা, কিন্তু সব মত ও ব্যাখ্যার আলোচনা তিনি করেননি', তিনি শুধু সেই সব মত ও ব্যাখ্যার আলোচনা করেছেন যা' তাঁর নিজস্ব রসবিচারের ও রসবোধের নিকষে খাঁটি সোনার দাগ কেটেছে। সেইগুলিকেই তিনি নিজের ও আলঙ্কারিকদের যুক্তি দিয়ে যুক্তিসহ করে উপস্থিত করেছেন। আলোচ্য বিষয়ে এই হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা, কারণ তার ফলেই লেখকের মতামতগুলি শক্ত দানা বেঁধে উঠতে পেরেছে, এবং তাঁর রসগ্রাহী মনের সুগভীর অনুভূতি বইটির নিবন্ধগুলিতে ধরা পড়েছে। অলঙ্কার-প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের মন অতুল বাবুর যে নয়, এটা সাহিত্য-

রসিক পাঠকের পক্ষে সুখের কথা; নিবন্ধগুলিতে পাণ্ডিত্যের অভাব নেই একথা সত্য, কিন্তু পাণ্ডিত্য গভীর মনন ও অনুভবের জারকরসে মজে গলে গিয়ে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে; অতুলবাবুর কৃতিত্ব এইখানেই এবং বইখানির মূল্যও ঐখানে। এ-বইয়ে তিনি সাহিত্য-বিচারে চিন্তার যে তীক্ষ্ণতা, বিশ্লেষণের যে নৈপুণ্য ও রসদৃষ্টির যে গভীরতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্যে পাঠক, সাহিত্যিক ও সমালোচক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

তবু, সবিনয়ে একটি প্রশ্ন নিবেদন করবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। এ-প্রশ্নটি কাব্যের বা সাহিত্যের অন্তফলনিরপেক্ষত্ব সম্বন্ধে তাঁর দু'টি উক্তিকে নিয়ে। কাব্য বা সাহিত্য যে অন্তফলনিরপেক্ষ, লেখকের এ-মত আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করি। বস্তুতঃ, তাঁর নিবন্ধগুলিতে এমন একটি মতামতও পাইনি' যার সঙ্গে আমি একমত নই। পরিশিষ্টে, সমাজ ও সাহিত্যের যোগাযোগ নিয়ে সাহিত্য-বিচারে যে-সব বিপত্তির সৃষ্টি হয়, বিশেষভাবে সাম্প্রতিক বাঙ্‌লা সাহিত্য-সমালোচনায় অহরহ যা' হচ্ছে, তার প্রতি তিনি যে-সব ইঙ্গিত ও মন্তব্য করেছেন সেগুলোও আমি মানি। আমার প্রশ্নটি একটি কতকটা গৌণ বিষয় সম্বন্ধে। তিনি বলেছেন, "লৌকিক মন ও জীবন থেকে যে-সাহিত্য বিচ্ছিন্ন তার ধারা হয় ক্ষীণ। সাহিত্যের ভাগীরথী মানুষের লৌকিক সুখদুঃখের খাত্ ছাড়া বয় না। এইজন্য পৃথিবীর যা' বড় সাহিত্য, মানুষের মন ও জীবন তার উপকরণ।" অতি যথার্থ ও সর্বজনগ্রাহ্য উক্তি। কিন্তু পরের পৃষ্ঠায়ই এই প্রসঙ্গেই তিনি বল্‌ছেন, "Escapist কাব্য যদি ivory tower-এ উঠেও কাব্য হয়, তবে তা' সার্থক, হোক্‌না তার ধারা শীর্ণ।"

সাহিত্য-সমালোচনায় escapism কথাটার চল্‌তি আজকাল প্রায় সংক্রামক। কে কখন কি অর্থে তা' ব্যবহার করেন সর্বত্র তা' সুস্পষ্ট নয়। সাধারণতঃ অনেকেই লৌকিক মন ও জীবন, এক কথায় বস্তু-জগৎ বলতে একান্তভাবেই সমসাময়িক সমাজ, রাষ্ট্র বা ভাব-জীবনগত প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোকে বুঝে থাকেন, অর্থাৎ বস্তু-জগৎ বা লৌকিক মন ও জীবনগত বস্তুকে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থেই গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানের অতি তুচ্ছ বস্তুও বড় হ'য়ে দেখা দেয়, তার আলোড়নে যাঁরা অস্থিতধী তাঁদের পক্ষে এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়, তবু কাব্যবিচারে এই সংকীর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টি একান্তই অগ্রাহ্য। অতুলবাবু বোধ হয় তাঁদের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। আমি কিন্তু এই ঘোলাটে মনের দৃষ্টি যাঁদের তাঁদের কথা বলছি না। কিন্তু বস্তুর বৃহত্তর, বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা সম্বন্ধে যাঁরা সচেতন এমন দায়িত্বশীল স্থিতধী লোকেরাও escapism,

escapist-কাব্য ইত্যাদি কথা তাঁদের মতামত প্রকাশে ব্যবহার করে থাকেন; তাঁরা বোধ হয় এই কথা বলেন যে, কোনো কাব্য বা সাহিত্য-সৃষ্টি যখন লৌকিক মন ও জীবনগত বস্তুর বস্তুপরতা থেকে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, তখন তা' escapist-কাব্য বা সাহিত্য। কাব্যের জগৎ বস্তুর জগৎ নয়, আলঙ্কারিকদের এই উক্তি অতুল বাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও স্বীকার করি; সে-জগৎ যথার্থই অলৌকিক মায়ার জগৎ। কিন্তু, বস্তুনিরপেক্ষ মায়া ত নেই, সে তো অসম্ভব! কাজেই বস্তুনিরপেক্ষ কাব্যও নেই। একথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে লৌকিক মন ও জীবনরূপ বস্তু থেকে একান্ত ভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, অর্থাৎ ivory towerএ উঠে (এবং ivory tower-এর ব্যঞ্জনা ত তাই) সার্থক কাব্য হ'তে পারে কি? অর্থাৎ escapism ও কাব্য, গভীরতর অর্থে এ দু'টি কথা পরস্পর-বিরোধী নয় কি? অতুলবাবু বলছেন, এ ধরণের সাহিত্যের ধারা ক্ষীণ, শীর্ণ হতে বাধ্য। আমার বক্তব্য হ'চ্ছে, সভ্য সামাজিক মানুষের পক্ষে ivory tower-এ উঠে বাস করা, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে লৌকিক মন ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, বিচ্যুত হ'য়ে একান্তে বাস করা অসম্ভব; মন ও জীবনের উপর জাগতিক বস্তুপরিবেশের সূক্ষ্ম ও জটিল ক্রিয়ার প্রভাব কেউই একেবারে বিলোপ করে দিতে পারেন না, অন্ততঃ বস্তুর রূপ নিয়েই যাঁদের লীলা সেই কবিরা পারেন না। এবং তা' পারেন না বলেই কোনো কবির পক্ষেই ivory tower-এ escape করাও সম্ভব নয়; কোনো বিশেষ mood-এর কাব্যরচনার বেলায়ও তা' হয় না। অথচ কথা দুটোরই ব্যবহার যখন করা হয় তখন একটা relative অর্থেই করা হয়, এটাই ধরে নিতে হবে; অন্ততঃ আমার ত তাই ধারণা। যে-সব কবি বা লেখকের দৃষ্টি ও মন লৌকিক মন ও জীবন বস্তুর বস্তুপরতা বা বস্তুধর্ম সম্বন্ধে সচেতন তাঁদের রচিত সাহিত্যের ধারা বেগবান্ ও স্রোতবহুল হ'বার সম্ভাবনা বেশী; যাঁদের তা' নেই বা যে পরিমাণে কম সেই পরিমাণে তাঁদের রচিত সাহিত্যের ধারা ক্ষীণ, শীর্ণ হ'তে বাধ্য। কাজেই কথাটা দাঁড়াচ্ছে এসে' degreeর পার্থক্যে, kindএর নয়। তারপর কোন্‌টা সার্থক ও মহৎ সাহিত্য আর কোন্‌টা নয়, কোন্‌টা বৃহৎ সাফল্য আর কোন্‌টা ছোট সাফল্যের নিদর্শন, তার বিচার হ'বে কাব্যজিজ্ঞাসাগত মীমাংসার মূল নির্দেশকে স্বীকার করেই, তা' নির্ভর করবে রচয়িতার ব্যক্তিগত সৃষ্টিপ্রতিভারই উপর। এই আমার প্রশ্ন; মীমাংসা একে বল্‌বার ধৃষ্টতা আমার নেই।

আরও একটি জিজ্ঞাস্য। অতুল বাবু আলঙ্কারিকদের রীতি ও ইংরাজী 'স্টাইল' কথাটিকে সমার্থক বলে ধরে নিয়েছেন। এ-বিষয়ে আমার একটু

সন্দেহ আছে। রীতি হ'লো 'পদ-রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী,' কিন্তু 'স্টাইলে'র অর্থ কি তাই? 'স্টাইল' কি শুধু "কাব্যের অবয়ব-সংস্থান"? 'স্টাইল' কথাটা ইংরাজী; কাজেই রসবোদ্ধা ইংরাজ সমালোচকেরা যখন বলেন 'style is the man himself' তখন বোধ হয় রীতির চেয়ে বেশী কিছু ইঙ্গিত করেন, যা' ব্যক্তিগত বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গীকে অতিক্রম করে যায়। স্টাইলের আদি ও চরম পরিচয় বাক্‌ভঙ্গীতে অর্থাৎ ভাষায়, সন্দেহ নেই; কিন্তু বিশিষ্ট বাক্-ভঙ্গীই 'স্টাইল' যেন নয়। ব্যক্তির চিৎ-সত্তা বা personality তো সার্থক বাক্‌ভঙ্গীতে থাকেই, কিন্তু 'স্টাইল' বল্‌তে প্রত্যেক রচনায় গভীর ও ব্যাপক যে অনন্যসদৃশ বিশিষ্ট স্বতন্ত্র অনুভূতির প্রেরণা থাকে তার ইঙ্গিতও যেন পাওয়া যায়। অন্ততঃ রসবোদ্ধা ইংরাজ সাহিত্য-সমালোচকেরা এই অর্থেই ত 'স্টাইল' কথাটি ব্যবহার করে থাকেন বলে আমার ধারণা। অবশ্যি, বামন যখন বলেন 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' তখন এক একবার মনে হয় হয়ত তিনি স্টাইলের সম্পূর্ণ অর্থের দিকেও ইঙ্গিত করেন, কিন্তু তারপরে পরবর্তী শ্লোকে বামন নিজেই যখন 'রীতি' ব্যাখ্যা করেন 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতি' বলে' তখন আত্মা কথাটার অর্থ যেন হারিয়ে যায়। একথা স্বীকার করতেই হয়, 'স্টাইল' শব্দের বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ 'রীতি'র চেয়ে ভালো আর কিছু বোধ হয় হ'তে পারে না, কিন্তু তা' প্রাচীন আলঙ্কারিকদের অর্থে নয়; সে-অর্থ আরো বিস্তৃত করে, অর্থাৎ connotationটা আরো বাড়িয়ে দিলেই 'রীতি' শব্দ 'স্টাইল' অর্থে ব্যবহৃত হ'তে পারে। যা হোক, এ সম্বন্ধে পরিষ্কার করে জান্‌বার আগ্রহ আমার রইলো।

নীহাররঞ্জন রায়

কবি-প্রণাম—সম্পাদক: নলিনীকুমার ভদ্র, অমিয়াংশু এন্দ, মৃণালকান্তি দাশ ও সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। বাণীচক্র ভবন, শ্রীহট্ট। অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯। [৮]+১১২+৩০ পৃ। ৪ হাফটোন্ চিত্রপৃষ্ঠা। দেড়, দুই ও তিন টাকা।

ছোট হ'লেও শ্রীহট্টে যে একটি রসিক, অনুভব-পরায়ণ, সজাগ ও দায়িত্ব-নিষ্ঠ সাহিত্যগোষ্ঠী আছে, তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল এই সঙ্কলনগ্রন্থটি উপলক্ষ্য করে। কয়েকজন তরুণ অথচ সার্থক কবি ও লেখক এ-প্রমাণ কিছুদিন থেকেই দিয়ে আসছেন, তবু 'কবি-প্রণাম' হাতে নিয়ে আর একবার তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালাম মনে মনে। এঁরা সত্যি একটি দায়িত্ব অতি সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে একান্ত শ্রদ্ধায় ও মমতায় পালন করেছেন যা' বাঙলার অনেক মফঃস্বল সহরেরই করা উচিত

ছিল, কিন্তু করেন নি'। সেদিক দিয়ে শ্রীহট্ট মফঃস্বল সব সহরগুলির মানরক্ষা করেছে। বাঙ্‌লার অনেক সহরেই রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো পড়েছে, এবং তা' উপলক্ষ্য করে কবির ব্যক্তি-জীবনের এবং তাঁর কবি-মানসের কিছু কিছু পরিচয় সে-সব জায়গায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। সেগুলি এখন থেকেই সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীহট্টের বাণীচক্র ভবন এ-বিষয়ে প্রশংসনীয় তৎপরতা দেখিয়েছেন, এবং সেদিক থেকে 'কবি-প্রণামে'র 'পরিশিষ্ট' অংশে যে রচনাগুলো একত্র করা হ'য়েছে তার প্রত্যেকটিরই মূল্য যথেষ্ট।

এই সঙ্কলনগ্রন্থটি শ্রীহট্টের রবীন্দ্রভক্তদের 'অনুরাগকে রূপায়িত করবার' প্রয়াসের ফল। কবিগুরুর সাহিত্য ও জীবন-সাধনার নানা দিক্ নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ, কবিতা ও কাহিনী এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে; তার ভেতর বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'গুরুদেব', এবং রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আশ্রমের পুরানো কথা' উল্লেখযোগ্য। টুকরো টুকরো অনেক খবর আরও দু'চারিটি প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। কবিতার ভেতর অমিয় চক্রবর্ত্তী মশায়ের কবিতাটি সুন্দর। কবিগুরুর নিজের দু'টি অপ্রকাশিত কবিতা, কয়েকটি ছোট ছোট লেখন, এবং কয়েকটি চিঠি এই গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্র-সাধনার পরিচয় গ্রহণ করার ঔৎসুক্য যাঁদের আছে তাঁদের উচিত একখণ্ড 'কবি-প্রণাম' সংগ্রহ করা।

শ্রীহট্টের উপর যে-কবিতাটি 'কবি-প্রণামে'র শিরোভূষণ তা' এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য :

মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাঙ্‌লার রাষ্ট্রসীমা হ'তে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পুণ্য হাতে
বাঙালীর হৃদয়ের সাথে
বাণীমাল্য দিয়া
বাঁধে তব হিয়া।
সে বাঁধনে চিরদিন তরে তব কাছে
বাঙলার আশীর্বাদ গাঁথা হ'য়ে আছে।

কবিগুরুর কথা যে কত সত্য, তা প্রমাণ করেছেন বাণীচক্রের সভ্যরা।

নীহাররঞ্জন রায়

চৈত্র, ১৩৪৮

এক পয়সায় একটি—বুদ্ধদেব বসু। কবিতা ভবন।
এক পয়সায় একটি—("মাটির দেয়াল") অমিয় চক্রবর্ত্তী।
কবিতা ভবন।

চার আনা। ষোল পৃষ্ঠার বই, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় একটি করে কবিতা। তাই এক পয়সায় একটি। শুনছি, এ রকম বই আরো বেরুবে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনেক কবিই নামবেন সাধারণের আর্থিক আয়ত্তে। আশা করি জনসাধারণ এ-আমন্ত্রণে সাড়া দেবেন।

সুরু হিসেবে দুটি বইই সার্থক সন্দেহ নেই। বুদ্ধদেব বসুর হালকা কবি-কথা, আর হালকা কথার আড়ালে অমিয়বাবুর ব্যথিত মন, দুইই রইল। উভয় রুচির পাঠকই তৃপ্ত হবেন। বর্ষার দিনে হঠাৎ চটুল রোদ, আর বর্ষার রাতে হাওয়ার গভীর দীর্ঘশ্বাস—বর্ষা বলছি, কারণ উভয়ের মনেই ভারি মেঘের চাপ, ক্লান্তি আর অবসাদ। তবু তার মধ্যে একজন ঠাট্টা বিদ্রূপ করে আসর জমাতে পারছেন, মনের ব্যথিত দিক চাপা দিয়ে কবির খেয়াল খুঁজছেন; আর একজন যখন ঠাট্টাও করেন, তার মধ্যেও একটা শীতল উদাসীনতা। বাকি সময়টা করুণায় আর ক্লান্তিতে দেহমন অবসন্ন। অবশ্য অন্য জাতের কবিতাও আছে দুটি বইতেই, মূল সুরের উল্লেখ করলাম শুধু।

বুদ্ধদেববাবু আবেগকে অবাধ মুক্তি দিয়েছেন, কেবল ছন্দ আর মিলের বৈচিত্র্য বজায় রাখতে যতটুকু কড়াকড়ি। অমিয়বাবুর কবিতায় আবেগ শুধু কড়া নজরবন্দিতে নেই, চিন্তার আরকে জরে গিয়ে একেবারে কঙ্কালসার। তাই হঠাৎ চোখে পড়ে না, প্রথম পাঠে মনে হয় এলো-মেলো কথার স্তূপ, অসংলগ্ন সংগীত। কিন্তু যখন চোখে পড়ে তখন হঠাৎ চমকে উঠি, প্রত্যেক শব্দের ইঙ্গিত তখন স্পষ্ট। ধরুন, "বড়ো বাবুর কাছে নিবেদন"—করুণা আর সমবেদনায় ভরা কবিতা, বাংলার প্রতি গভীর মমতা, কিন্তু ইঙ্গিত কী সূক্ষ্ম! বুদ্ধদেববাবুর মেজাজ এখানে অন্য, আবেগের সহজ পসারই তিনি খুঁজছেন। রবীন্দ্রনাথ যে-ধরনে লিখতেন সেই দিকেই অনুরাগ। প্রথম পাতার প্রথম কটি পংক্তিই তুলছি—

> এখনো কি তুই গানের নেশায় মশগুল,
> ওরে দুর্ভাগা, ওরে মূঢ়, ওরে কবি,
> কত-কী শেখাল জীবনের কড়া ইশকুল
> হালকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিলি কি সবি?

বুদ্ধদেববাবু অনেকদিন কবিতা লিখছেন, কবিতাকে অনেকটা সহজ করে নিয়েছেন হয়ত তাই। এদিকে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর সাধনায় ক্লান্তি নেই;

অনেক চিন্তা, অনেক শ্রম। কটাক্ষপাত আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং মুক্তকণ্ঠ স্তুতিই। কারণ কাব্যসৃষ্টিতে সাধনাকে শুধু তাঁরাই ছোট করতে সাহস পান যাঁরা একে ঐষী প্রেরণা বলে মানতে প্রস্তুত, এবং কবিরাও তখন দিব্যউন্মাদ সাজতে পারেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর কলে ছাঁটা চাল খেয়ে আর খবরের কাগজের ভারে কুঁজো হয়ে আমাদের মন বাড়ছে। ঐষী শব্দ তাই শুধু হাসির খোরাক দেয়। কবি স্রোতের মুখে হাল ছেড়ে হাওয়া খাবেন না, কড়া হাতে হাল ধরবেন তিনি, এমন কি হাতে হয়ত কড়াও পড়বে। কাব্য শুধু প্রেরণা নয়, সৃষ্টি, অনেক সাধনার সৃষ্টি। অমিয়বাবুর মধ্যে সে-সাধনায় ক্লান্তি নেই। একদিকে মনকে গঠন করা, শিক্ষা আর দৃষ্টি উভয় ভাবেই; আর একদিকে আঙ্গিকের নতুন পথ খোঁজা, যেমন ধরুন শব্দের অতি সূক্ষ্ম রেশ, সেতারের মীড়ের মত। আর আকস্মিক অদ্ভুত মিল—এত আকস্মিক যে চমকে উঠি অনেক সময়।

মিল দেবার কারিগরি বুদ্ধদেববাবুর বইতেও চোখে পড়ে, তা ছাড়া অনেক আশ্চর্য পংক্তি এদিকে সেদিকে ছড়ানো। তবু খানিকটা গা এলিয়ে লেখা, ছুটির দিনের হালকা আবহাওয়া। আমার বিশ্বাস লেখকের উদ্দেশ্যও ছিল তাই, হাল্কা কবিতা দিয়ে সুরু করবেন এই গ্রন্থমালা, কারণ, সাধারণের কাছে কবিতাকে পৌঁছে দিতে হলে সুরুতে হালকা কবিতার সার্থকতাই বেশী। আর হালকা লিখতে চেয়েছেন বলেই মনের পটভূমি এ বইতে ব্যাপক নয়। অনেকগুলি কবিতা ত' ব্যক্তিগত বলে স্বীকৃতই, তা ছাড়াও অন্যান্য কবিতার নায়ক নায়িকাকেও খুঁজে পাই আমাদের নিকট পারিপার্শ্বিকে। তারা সহরের লোক, কলকাতার লোক। এদিকে অমিয়বাবুর করুণা আর বেদনা জুড়ে আছে খাঁটি বাংলা দেশ—"কচুরি পানার শঙ্কিত শোভা"একটা উদাহরণ শুধু। "প্রবাসী", "বড়োবাবুর কাছে নিবেদন", "বিধুবাবুর মত"—সর্বত্রই গভীর স্নেহ বাংলার প্রতি। অবশ্য চাবুক যেখানে পড়া দরকার সেখানে পড়েছে, যেমন "কচুরি পানা"—বনিয়াদি ফাঁপা আয়েস, অলস, কুৎসিত।

বই দুটির যে সব পার্থক্য দেখালাম তা শুধু কবিদের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্ট করবার উদ্দেশে। তুলনামূলক যাচাই আমার উদ্দেশ্য নয়। দু'জন দু'পথে বেরিয়েছেন, সাধারণ পাঠকের কাছে কবিতা পৌঁছে দিতে চান; দুই পথের সার্থকতা পাঠকের রুচিভেদে।

বই দুটির বহিরাবরণ অপূর্ব।

আমার মতের মূল্য সংকীর্ণ জেনেও উভয়কে অভিনন্দন জানাই, আর কামনা করি "কবিতা ভবনে"র নতুন উদ্যম সার্থক হোক।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র-রচনাবলী

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র নবম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডে আছে: কবিতা ও গান—'শিশু'; নাটক ও প্রহসন—'প্রায়শ্চিত্ত'; উপন্যাস ও গল্প—'যোগাযোগ'; প্রবন্ধ—'আধুনিক সাহিত্য'। কবির পুত্রকন্যাদের যে-ক'টি চিত্র এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে, তা পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, সে-কারণেও এই খণ্ডটি বিশেষরূপে আদরণীয়। 'মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে' কবিতাটির পাশেই অশ্বপৃষ্ঠে শমীন্দ্রনাথের ছবিটি চমৎকার মানিয়েছে। 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশে রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' ও অন্যান্য প্রবন্ধের যে-সব বর্জিত অংশ মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলি নানাদিক থেকে মূল্যবান।

বাংলাদেশের এখন ঘোর দুঃসময়। বিশেষ ক'রে গ্রন্থনকর্তারা কাগজের অভাবে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত। এই অন্ধকারে তিনমাস পর-পর এক-এক খণ্ড রবীন্দ্র- রচনাবলীর আবির্ভাবে হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে সমস্ত দেশের চিত্তই ঝলমল ক'রে উঠবে। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের যাঁরা পরিচালক এই ঐতিহাসিক সংস্করণটির জন্য বাঙালিমাত্রই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ, এবং কোনো অবস্থাতেই এর ধারাবাহিক প্রকাশ ব্যাহত না হোক এই আমাদের প্রার্থনা।

'বৈশাখী'

১৩৪৮-এর বৈশাখে আমরা 'বৈশাখী' নাম দিয়ে একটি বার্ষিকী বের করেছিলাম। অনেক পাঠক জিজ্ঞেস ক'রে পাঠাচ্ছেন আগামী বৈশাখেও ঐ বার্ষিকী বেরোবে কিনা। উত্তরে জানাই যে কাগজের দুর্ভিক্ষের জন্য 'বৈশাখী' প্রকাশ স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছি। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে সেটি আবার প্রকাশিত হবে, এবং যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হবে।

গ্রাহকদের ঠিকানা বদল

সম্প্রতি 'কবিতা'র অনেক গ্রাহক—বিশেষ ক'রে যাঁরা কলকাতাবাসী—হয়তো ঠিকানা বদল করেছেন। তাঁদের আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করছি তাঁদের নতুন ঠিকানা যেন আমাদের জানান। (অল্প সময়ের জন্য হ'লে ডাকঘরের মারফৎও ব্যবস্থা করা সম্ভব।) তাঁদের একটু অনবধানতার জন্য হয়তো তাঁদের হাতে 'কবিতা' পৌঁছয় না, এবং আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়। অপ্রাপ্তি-সংবাদ পেলে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি আবার পত্রিকা পাঠাতে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সব সময় তা সম্ভব না-ও হ'তে পারে। যাঁরা ঠিকানা-বদল করেছেন কিংবা করবেন তাঁরা দয়া ক'রে একটি পোস্টকার্ড

যদি আমাদের লিখে পাঠান তাহ'লে তাঁরাও যথাসময়ে পত্রিকা পেতে পারেন এবং আমাদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না।

এক পয়সায় একটি

কবিতা সাধারণ পাঠকের সব চেয়ে অনাদৃত, এ-কুখ্যাতি প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে। এর সামাজিক কি ঐতিহাসিক কারণ যা-ই হোক, বাংলাদেশ যে এখনো কবিহীন হয়নি, এবং নতুন-নতুন ভালো কবিতাও যে লেখা হচ্ছে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। এই সব কবিরা পাঠক চান এবং কোনো-কোনো পাঠকও হয়তো এঁদের চান। কবি ও পাঠকে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার উদ্দেশে আমরা 'কবিতা' পত্রিকাটির পরিচালনা করছি, এবং আধুনিক কবিদের কাব্যগ্রন্থও কবিতা-ভবন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য কিছুটা হয়তো সফল হয়েছে, এ-কথা মনে করলে অন্যায় হয় না।

সম্প্রতি আমরা এই উদ্দেশ্য নিয়েই কবিতার একটি সুলভ গ্রন্থমালা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। এই গ্রন্থমালার নাম 'এক পয়সায় একটি'। এই নামটিতে কিছু বিদ্রূপ, কিছু হয়তো ঔদ্ধত্য আছে—তা থাক। কিন্তু নামটির সার্থকতা এইখানে যে যোলো পৃষ্ঠায় এক-একটি কবিতার বই সুন্দর মলাট দিয়ে চার আনা মূল্যে প্রকাশ করা হবে। একটি সম্পূর্ণ কবিতার বই চার আনা মূল্যে যে-কোনো শ্রেণীর পাঠকই অনায়াসে কিনতে পারবেন— এ-কথা মনে রেখেই আমাদের এই উদ্যম। বুদ্ধদেব বসু ও অমিয় চক্রবর্ত্তী প্রণীত এই গ্রন্থমালার প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে—দুটিতেই যোলো পৃষ্ঠায় ঠিক যোলোটি কবিতাই আছে, আর কবিতাগুলো প্রায় সবই একেবারে নতুন, অর্থাৎ পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। অন্যান্য যে-সব কবির রচনা এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হবে তাঁদের মধ্যে আছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, সমর সেন, জীবনানন্দ দাশ, হুমায়ুন কবির, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নিচের ঠিকানায় পাঁচ আনার ডাকটিকিট পাঠালে ভারতবর্ষের যে-কোনো ঠিকানায় একখানা বই পাঠানো হবে, দু'খানার জন্য সাড়ে ন'আনা পাঠাবেন। তাছাড়া এই গ্রন্থমালা কলকাতার সমস্ত প্রধান বইয়ের দোকানে ও স্টলে বিক্রয়ের জন্য মজুত থাকবে।

বাংলাদেশে এই পরিকল্পনা অভিনব। বিশেষত এই সময়ে যখন কলকাতায়, অর্থাৎ বাংলাদেশে, সকল স্বাভাবিক কর্ম স্থগিত থাকবার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে, তখন এইরকম প্রচেষ্টা আশা করি কবি ও পাঠক উভয় শ্রেণীকেই উৎসাহিত করবে। কবিরা তাঁদের রচনা নিয়ে প্রস্তুত, তাঁদের অভ্যর্থনা নির্ভর করে পাঠকসমাজের উপর।

আলোচনা

'বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা'

পৌষ, ১৩৪৭-এর "কবিতা"য় শ্রীযুক্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিকে'র যে-সমালোচনা আমি লিখেছিলাম তা অবলম্বন ক'রে গত ফাল্গুনের 'পরিচয়ে' শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধের নাম 'বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা'। সুভাষের কবিতা—এবং সে-সম্বন্ধে আমার মন্তব্য—তিনি অবশ্য নিছক ছান্দসিকের দৃষ্টিতেই পরীক্ষা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বাংলা ছন্দ—বিশেষ ক'রে পয়ার—নিয়ে আমি সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করেছিলাম, সে-সব কথা যে প্রবোধবাবুর মতো বিখ্যাত ছান্দসিকের কানে উঠেছে তাতে আমি আনন্দিত। আরো আনন্দিত এই দেখে যে, খুঁটিনাটিতে অমিল থাকলেও, আমার সঙ্গে মোটের উপর তিনি একমত। ছন্দোবিন্যাসে সুভাষের কৃতিত্বকে তিনি যে 'অভিনন্দন' জানিয়েছেন আমার পক্ষে সেটাও বিশেষ তৃপ্তিকর।

প্রবোধবাবু এক জায়গায় বলছেন :

'তিনি (বর্তমান লেখক) বলেছেন, "আমি আবিষ্কার করি যে পয়ারে 'কলকাতা' অনায়াসেই তিন মাত্রার জায়গা পায়।" দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

আসিলো কলকাতায়। আরো এক কাল।

কিন্তু এখানে "কলকাতা"য় তিনি কি ক'রে তিন মাত্রা "আবিষ্কার" করলেন তা বুঝতে পারলাম না। আমি তো দেখতে পাচ্ছি ও-শব্দ স্পষ্টতই চার মাত্রার জায়গা জুড়ে রয়েছে।'

নিশ্চয়ই, 'কলকাতা' এখানে চার মাত্রা বইকি। অত্যন্ত অসতর্ক মুহূর্তেই এ-উদাহরণটি আমি দিয়ে থাকবো, প্রবোধবাবু আমার এই ভুল দেখিয়ে দিয়ে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছেন। এ-জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। যে-পংক্তিটা আমার মনে ছিলো সেটা এইরকম—

দেখা দিলো কলকাতায়। আরো এক কাল।

এটার বুনোনি আরো ঠাসা করা যাক—

দেখা দিলো কলকাতায়। আরো এক সকাল।

প্রবোধবাবু যাকে সংশ্লেষণ বলেছেন, তার একটি পয়ারের এক পংক্তিতে অনায়াসেই চলে, এমনকি দুটি চাপালেও অসহ্য হয় না, এইটুকু আমার বলবার কথা ছিলো। তবে দ্বিতীয় উদাহরণে 'এক্সকাল' বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির বিরুদ্ধ প্রবোধবাবুর এ-আপত্তি মেনে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু 'এক-সকালে' সংশ্লেষণ না করে 'আরো-এক'-এ করা যেতে পারে' অর্থাৎ

ও-এ এই দুটি স্বরবর্ণ যুগ্ম উচ্চারণ করলে 'সকাল'কে বাঁচানো যায়। যা-ই হোক, দ্বিতীয় উদাহরণটা নেহাৎ উদাহরণ হিসেবেই নিতে হবে।

আমি বলতে চেয়েছিলুম যে, যে-সব যুক্তাক্ষর আমরা চোখে দেখি না, কানে শুনি, সেগুলোকে পয়ারে প্রয়োজন মতো যুক্তাক্ষরের, অর্থাৎ একমাত্রার, মূল্য দিতে দোষ কী। সম্প্রতি আমি একটি কবিতায় ('এক পয়সায় একটি'—১১নং) লিখেছি—

বিশুষ্ক বীরভূম খুলে ক্লান্ত ঠোঁট
পান করে এই প্রাণ।

এখানে 'বীরভূম' শব্দটি তিনমাত্রা ধরায় আমার এক কবি-বন্ধু, যিনি নিজে ছন্দের ব্যবহারে অসাধারণ দক্ষ, আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু কথাটা যদি 'বীর্ভূম' লিখতুম? এ-ধরনের ব্যবহার আমার কানে তো লাগে না—চোখের অভ্যেস কাটাতে পারলে অনেকেই হয়তো মেনে নিতে পারবেন। অদৃশ্য যুক্তাক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে সুভাষ অত্যন্ত সচেতন দেখে তাঁকে আমি প্রশংসা করেছিলুম; এবং প্রবোধবাবুও বলেছেন যে এ-ক্ষেত্রে সুভাষের 'বাহাদুরি আছে'।

প্রবন্ধের শেষে প্রবোধবাবু 'পদাতিক' কবিতার শেষ অংশ উদ্ধৃত ক'রে জিজ্ঞেস করছেন, 'এটা কি? এটা কি ছন্দোবদ্ধ কবিতা না স্বচ্ছন্দ-বিহারী গদ্য-রচনা? এতে ছন্দের অনুসন্ধান করতে গিয়ে হাল ছাড়তে হয়েছে। সব চেয়ে বিস্ময় লেগেছে, এ-বিষয়ে বুদ্ধদেব নীরব কেন?'

উদ্ধৃত অংশ 'স্বচ্ছন্দ-বিহারী গদ্য রচনা' প্রবোধবাবুর এ-অনুমানই সত্য। ছন্দের আলোচনার মধ্যে ওটা আসেই না, সে-জন্যই আমি ও-বিষয়ে নীরব ছিলুম। গদ্য রচনায় পদ্যছন্দের অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রবোধবাবুর মূল্যবান সময় যে নষ্ট হয়েছে সেজন্য আমি দুঃখিত।

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদক ও প্রকাশক: বুদ্ধদেব বসু। কার্যালয়: কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা।
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা থেকে
ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৯
সপ্তম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৩২

প্রার্থনা

কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে
নিরন্তর নিদারুণ দ্বন্দ্ব যবে দেখি ঘরে ঘরে
প্রহরে প্রহরে; দেখি শুধু মোহ দুরন্ত প্রয়াসে
লুব্ধতার বহ্নি দিয়ে ভস্মীভূত করে অনায়াসে
নিঃসহায় দুর্বলের সকরুণ সকল [illegible] প্রত্যাশা,
জীবনের সকল সম্বল; দুঃখীর আশ্রয় যত
নিশ্চিহ্নে ভাসিয়া যাবে দুর্দম দুরাশার হোমানলে
আহুতি ইন্ধন জোগাইতে; নিঃশঙ্ক গর্জি চলে
আত্মতৃপ্তি শীর্ষ হতে চ্যুত; দেখি আত্মদ্রোহী প্রাণ
তুচ্ছ করিবারে পারে মানুষের গভীর সম্মান
গৌরবের [illegible]; সিন্ধুর ওপার তরে
দীনের সর্বস্ব সার্থকতা দলি' দেয় ধূলি পরে
জয়যাত্রাপথে, — দেখি বিকারে ভরিয়া উঠে মন,
উচ্ছলিছে আত্মঘাতি-সাংঘাতিক মানবের প্রাণ-নিকেতন
হিংস্র নখে দন্তে বিভীষিকা,— চিত্ত মম
বিস্তৃতি সন্ধানে ফিরে পিঞ্জরিত বিহঙ্গম সম,

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৭

মুহূর্তে মুহূর্তে আসে শৃঙ্খল-নূতন অপমান
সংসারের। হেনকালে জ্বলি উঠে বজ্রাগ্নি সমান
চিত্তে তাঁর দিব্যমূর্তি, সেই বীর রাজার কুমার
বাসনারে বলি দিয়া, বিসর্জিয়া সর্ব আপনার
বর্তমান কাল হতে নিষ্ক্রমিলা নিত্যকাল মাঝে
অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে
অহমিকা বন্দীশালা হতে। — ভগবান বুদ্ধ তুমি,
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রই তব জন্মভূমি।
ভরসা হারালো যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস
তোমারি করুণা-বিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ,
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি। — আর যারা
ক্ষীণের নির্ভর ধ্বংসকারী, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্বলের মুক্তি রোধি, বোসো তাহাদেরি দুর্গদ্বারে
তপের আসন পাতি', প্রমাদ-বিহ্বল অহংকারে
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি; তাদের নিঃসীম অসম্মান
তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯ জুলাই
১৯৩৩

দুটি কবিতা

অন্নদাশঙ্কর রায়

(এই কবিতা দুটি "এক পয়সায় একটি" সিরিজে সদ্য-প্রকাশিত "উড়কি ধানের মুড়কি" থেকে সংগৃহীত ।—সম্পাদক)

প্রার্থনার উত্তর

করেছি প্রার্থনা—

আমায় সৈনিক করো, ক্রিশ্চান সৈনিক,
সকল বন্ধনহীন ক্রশ্‌বাহনিক ।
দীন পদাতিক করো, করেছি প্রার্থনা—
সকল বাসনাহীন ক্রিশ্চান সৈনিক ।

পেয়েছি উত্তর—

আমায় করেছ তুমি বিস্তানাগরিক ।
তোমার বাণীর আমি রক্ষণাগারিক ।
আমায় করেছ তুমি—পেয়েছি উত্তর—
তোমার অনন্ত রাস রসের রসিক ।

দিলীপদাকে

তোমায় বলেছি পলাতক, বলে হেসেছি কত !
নিয়তি, আমার নিয়তি !
তুমি তো পালালে সংসার হতে সুসংযত !
নিয়তি, আমার নিয়তি !
আমি পলাতক সংগ্রাম হতে ভীরুর মতো !

আমি রণছোড়, টিটকারী দেয় পুরুষ যত !
নিয়তি, আমার নিয়তি !
বলে, কাপুরুষ ! গম্বুজে বসে বাস্তরত !
নিয়তি, আমার নিয়তি !
আমারি উক্তি আমারি কর্ণে বর্ষে শত !

ওদের কী বলি, কী করে বোঝাই! সরমে নত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
জীবনের লোভে নই পলাতক সুদূরগত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
সৃষ্টির প্রেমে দৃষ্টি আমার প্রত্যাহত!

বেণুর জন্য

বিষ্ণু দে

A freeman thinks of death least of all things ; and his wisdom is a meditation, not of death but of life.—Spinoza.

কৈশোরের ঘোর
এখনো ছড়ানো চোখে।
জীবনের স্বপ্নলোকে
অবিশ্রাম আনাগোনা তার।
অবজ্ঞাকঠোর
মৃত্যুর, স্বার্থের দ্বিধা
জাতি, বর্ণ, শ্রেণী—যতো হিসাবীর বিবিধ কৌশলে
ঠগ আর বণিকের দলে
তাকে তো টানে নি।
প্রাণের উল্লাসে
তাই তো সে ভাসে অখণ্ড আকাশে,
সত্তার সুনীলে তার মুক্ত আনাগোনা।
মৃত্যু আজ আত্মঘাতী মৃত্তিকাবিলাসে,
প্রাণ তার যতই উল্লাসে,
মেঘ হতে মেঘান্তরে আজ তাই যাত্রা তার
সূর্য জানে যাত্রা তার সূর্য হানে গায়ে তার
উল্লসিত লাবণ্যের অম্লান সোনা।

সে কি জানে, কিশোর কুমার,
নবজীবনের আশা অঙ্কুরিত আকস্মিকতায়
হয়তো বা অন্ধ অপঘাতে ?
সে কি জানে স্বেচ্ছাবরে প্রেয় আজ শ্রেয় ?
মৃত্যুহীন চিরবরে সে তো জানে আদিগন্ত জীবনের অনির্বাণ গতি
সে কিশোর বীর।
ভঙ্গুর দুঃখের স্তূপে নূতন রচনা করে সে কি দুই হাতে বিপ্লবী পাথাতে
সোনালি ঈগলে তার, চোখে সূর্য, পায়ে ইরাবতী
প্রতীক্ষায় স্থির ?

কাব্যজিজ্ঞাসা (২)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কবি ঃ

ভেঙেছে সংসারস্বর্গ ; কণ্টকিত স্বপ্নের বিছানা।
পাঠালো নিষ্ঠুর সূর্য গলিত মৃত্যুর পরোয়ানা
আমাদের মোমের টুপিতে।
ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয় আকাশের সুনীল বিষয়।
উদার সমুদ্র ডাকে—
ঢেউয়ের ইসারা গিলি অন্ধকার গলির রোয়াকে।
হাতে হ্রস্ব জীবনের জরিপের ফিতে।
ছড়ানো দৃশ্যের মধ্যে কিছু নিয়ে কাব্যের জগৎ
রচনা করার ইচ্ছা ছিল বটে। ভেঙেছি শপথ—
বৃত্তি আজ একান্ত বিবাদী।
মনে মনে উড্ডীন আকাশে বাসা বাঁধি।
কেবলি নিষ্ফল বাত ছিন্নমর ঢাকে
পুরানো অভ্যাসে আজো চিকনীর পত্রপ্রশ ডাকে।

আষাঢ়, ১৩৪৯

তবুও তোমার কাছে ঋণী—
একদা আমার এই একচক্ষু হৃদয়হরিনী।
তোমার উষ্ণতা দিল বাষ্পময় আমাকে শরীর
উচ্ছল পর্বতগাত্রে। ধর্ম তাই উদ্দাম নদীর।
তবুও তুষারচক্রে পিঠে এ কী জরাগ্রস্ত কুঁজ—
দূরে দেয় হাতছানি সংঘবদ্ধ মাঠের সবুজ;
ছত্রভঙ্গ রৌদ্র হয় ফিকে—
উদ্ভ্রান্ত সঙীন দিকে দিকে।

কবিবান্ধবী:

আগুন আগুন পাড়ায় আগুন
বাড়ে হু হু।
মগজে প্রভূত দম্ভ তবু তো
আহা উহু।
মনের মহল দিচ্ছে টহল
মিঠে কুহু!
এখনো আগুন পাড়ায় আগুন
বাড়ে হু হু।

কবি:

ভাঙলো চিবুকঠেকানো হাতের নিদ্রা—
বাগানে শুকনো কঙ্কালসার বৃক্ষ,
খিড়কির পথে পালাবে কি কলাবিৎরা?
—গ্রামে ও নগরে ভিড় করে দুর্ভিক্ষ।

হৃদয়বিহীন সময়ের দুর্বৃত্ত
তোমার আমার মধ্যে দাঁড়ালো আজ যে,
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেয় আজ ভীরু চিত্ত
কাপুরুষ তা আনবো না মোটে গ্রাহ্যে।

আষাঢ়, ১৩৪৯

বুঝেছি দগ্ধ জীবনের দৃষ্টান্তে—
প্রাণ বাঁচানোর নেইকো সহজ পন্থা,
বজ্রমুঠিতে শৃংখল হবে ভাঙতে,
আমাদের ফাঁকা ভাঁড়ার প্রেমের হন্তা।

বিদায়! অলীক স্বপ্নের প্রজাপুঞ্জ!
বিদায়! চাঁদের নিরুদ্দিষ্ট কুঞ্জ!

কবিবাবুরা:

বাতাস পিঠে চাবুক হানে আকাশ আনে বন্যা
শান্তি কবে ফুঁকেছে শিঙে—বেজায় ঢিমে কান তো!

সহরে, গ্রামে নিকটে দূরে নানান সুরে শুনছি—
পেয়েছি তার খানিক রস, খানিক অস্পষ্ট:

'একলা নই, মিলিত হাত আজ আঘাত হানবে।
মুক্তিদাতা মজুর, চাষা—নতুন আশা সামনে।'

চলো না কবি, মিছিলে মিশি—অসৎ ঋষি-সঙ্গ
পতনে পথ করেছে ঢালু, গড়েছে বালুসৌধ।
আমরা দেবো বোবাকে ধ্বনি, খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ,
লক্ষ বুকে রয়েছে খনি, কুঁড়িতে ঢাকা গন্ধ।

আমরা নই প্রলয়ঝড়ে অন্ধ॥

দৈত্যপুরী

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দৈত্যপুরীর পাথরের বাড়ী কালো পাহাড়ের বুকে
মরা মানুষের কঙ্কাল দিয়ে খিলান গড়ান তা'র,
শত উদ্ধত গম্বুজ তা'র আকাশে উঠিল রুখে
আজি নীরন্ধ্র মেঘে ঢেকে দিল তা'র সে অহংকার।

আষাঢ়, ১৩৪৯

দৈত্যপুরীর পাথুরে প্রাচীর আজি ভূকম্পে নড়ে,
কালাপাহাড়ের পায়ের দাপটে চিড় খায় খনে খনে,
চকমকি ঠোকা ফুলকি আগুন মাটিতে ঠিকরি পড়ে
ঝড় উঠিয়াছে পশ্চিম হ'তে পূর্ব্ব রণাঙ্গনে।

দৈত্যপুরীর লোহার কপাটে আগুন লেগেছে আজি
অ-দীপ রাত্রে মশালের আলো দূরে দূরে যায় দেখা,
কোথা অরণ্যে ওঠে কোলাহল, দামামা উঠিল বাজি'
খোলা তলোয়ারে মরচে পড়েছে হায়রে ভাগ্যলেখা!

দৈত্যপুরীর পরিখার জল হঠাৎ উঠিল মেতে
অন্ধকারের আড়ালে লুকান অগণ্য হাতিয়ার
ঝলসিয়া ওঠে বিদ্যুৎসম তর্জ্জনীসঙ্কেতে
অস্ফুট ধ্বনি কানে কানে ছোটে ভয় নাই, হুঁসিয়ার।

স্বভাব

জীবনানন্দ দাশ

যদিও আমার চোখে ঢের নদী ছিল একদিন
পুনরায় আমাদের দেশে ভোর হ'লে,
তবুও একটি নদী দেখা যেত শুধু তারপর;
কেবল একটি নারী কুয়াশা ফুরোলে

নদীর রেখার পার লক্ষ্য ক'রে চলে;
সূর্য্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে
মানুষের শরীরের স্থিরতর মর্য্যাদার মত
তার সেই মূর্ত্তি এসে পড়ে।

সূর্য্যের সম্পূর্ণ বড় বিভোর পরিধি
যেন তার নিজের জিনিষ।
এতদিন পরে সেই সব ফিরে পেতে
সময়ের কাছে যদি করি সুপারিশ

তাহ'লে সে স্মৃতি দেবে সহিষ্ণু আলোয়
দু একটি হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে ;
যদিও লক্ষ লোক পৃথিবীতে আজ
আচ্ছন্ন মাছির মত মরে—

তবুও একটি নারী ভোরের নদীর
জলের ভিতরে জল চিরদিন সূর্য্যের আলোয় গড়াবে
এ রকম দুচারটে ভয়াবহ স্বাভাবিক কথা
ভেবে শেষ হয়ে গেছে একদিন সাধারণ ভাবে।

কবিতা

মণীন্দ্র রায়

(শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু-কে)

নিদারুণ আত্মকরুণার পরিহাস শুধু। চারিদিকে রুদ্ধশ্বাস
ধু ধু বালি, তৃণশস্পহীন। ক্ষুরধার মধ্যাহ্নের নিঃশব্দ আগুন জ্বালে
যেন চিতা। নীরস দিনের প্রান্তে তবু লিখি বিরস কবিতা, তবু
গান গাই। জীবনের সাড়া তাতে নাই : রাশি রাশি শ্মশানের
ছাই,—গায়ে মাখি, বাতাসে উড়াই।

সে ছবিতে দেখে যারা বিবর্ণ বিলাপ আর মৃত্যুর পিশাচ
নৃত্যে ধ্বংসের ইসারা, তারা কি জানে না, কবিচিত্তে আনন্দের
প্রবাহ বহে না, রৌদ্রদীর্ণ দগ্ধমাঠে সান্ত্বনার কোনো ছায়া নাই ?—কণ্ঠহীন
এ সঙ্গীতে তাই ইঙ্গিতের ইন্দ্রজালে শিহরণ মরেছে বৃথাই, মুক্তকোষ
জীবনের মুকুলিত সকল প্রয়াস গেল তাই শূন্যতার অগ্নিপরিহাস,
হ'য়ে গেল একেবারে বৃথা ! তারা জানে কি তা ?

তাদের লোলুপ দৃষ্টি রূপসৃষ্টি ব্যর্থ করে। মদস্ফীত গৃধ্নু-
হাতে জীবনের উৎস চেপে ধরে, চরাচরে হানে এক বীভৎস তাণ্ডব।
কবির লেখনীমুখে চায় তবু জীবনের স্তব, সঙ্গীতের নব সম্ভাবনা। এ কী
বিড়ম্বনা? জীবিতের অধিকারে নির্ব্বিচারে লৌহহাতে ক'রে দিয়ে বৃথা
তারা চায় কালির রেখায় জীবনের বন্দনায় অমর কবিতা।…বশম্বদ
হায়রে কবিতা!

ব্যাধ

সুধীরকুমার চৌধুরী

আজ কালের ব্যাধের রক্ত বইছে যে তার শিরায়,
একটা কিছু শিকার খোঁজে যেইদিকে চোখ ফিরায়।
হৃদয়ে তার কিসের ক্ষুধা নেই কিছু তার জানা,
দিকে দিকে ফাঁদ পাতে সে, আঁধারে দেয় হানা।
দুরাশা তার নাই ক কিছু, মনের মধ্যে ফাঁকা,
ভরতে যদি না পায় ত তার শক্ত বেঁচে থাকা।
কেউ যদি তার কাছে এসে অমনি দূরে পালায়,
কি হারাল না-ই জেনে সে জলে ক্ষোভের জালায়!

বিধির ছিল বিধান তুমি পড়বে যে তার পথে,
সাঙ্গ হল শিকার খোঁজা অরণ্যে পর্ব্বতে।
সাঙ্গ হল হাতড়ে ফেরা গহন অন্ধকারে,
তোমার আলোয় তাকিয়ে তোমায় দেখল বারে বারে।
তবু যে তার ব্যাধের রক্ত বইছে ধমনীতে,
সকল ক্ষুধার শিকার খোঁজে একটি রমণীতে।
মিটিত ক্ষুধা তোমায় নিয়ে ছুটিয়ে দিলে ঘোড়া,
কাছের মানুষ ধরতে সে ফাঁদ পাতল বিশ্বজোড়া!

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৪৭

এগিয়ে গিয়ে তোমায় হাতে রাখল না সে হাত,
টানতে সে চায়, হানতে সে চায়, সেই ত ব্যাধের ধাত।
আড়াল রচি' ছলাকলায়, লুকিয়ে থেকে দূরে
ভালবাসা চাইল দিতে তীরের মত ছুঁড়ে।
তোমার জানা ছিল না ত বনের ব্যাধের রীতি,
মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলে, তাইতে গেলে জিতি'।
হয়ত পায়ে বেধেছিল একটুখানি বাঁধন,
হৃদয়ে কেউ কেঁদেছিল এক পলকের কাঁদন।

আজকে যখন ফিরে দেখা হল তোমার সাথে,
দিয়ে থুয়ে নেই কিছু আর বাকী তোমার হাতে।
এগিয়ে গিয়ে তোমায় সে আজ বলছে সকাতরে,
হাতটি যদি রাখো হাতে তবেই ত হাত ভরে।
কিন্তু তাহার চোখ দুখানি কয় কি গো সেই ভাষা?
কালোয় তাদের সেই সেদিনের ব্যাধের ভালবাসা।
চরণ দুটির অলক্তকে, সিঁথির সিঁদুর-রাগে
রক্ত-লোলুপ হৃদয়ে তার কিসের নেশা জাগে?

হয়ত আজও জানে না সে কিসের যে তার খিদে,
মনে মনে তোমায় তবু সহস্রবার বিঁধে।
তোমার দেহমনের কোনো আড়াল নাহি মানে,
তোমার যেথায় লুকিয়ে ফেরা, সেইখানে সে হানে।
দিবসনিশি মনে মনে খোঁজে তোমার মাঝে
কোথায় তোমার ভয়ে-ব্যাকুল সহজ ভেক্ততা যে।
লাগবে না যে তোমার প্রাণে পড়বে না যে টান,
জানতে পেলে এক চুমুকে তোমায় করে পান!
আজকে জানো ব্যাধের রীতি আর জানো তার ধাত,
ভিক্ষা-মাগা হাতটিতে তার রাখলে না তাই হাত।

ঈদ

আবুল হোসেন

শুনো না আমার মানা তোমার মনেতে যদি আজ
আরবী বালির ঢেউ দোলা তুলে থাকে,
সহস্র রাত্রির সুরা মুমূর্ষু মগজে
কানায় কানায় যদি ফেনায়িত হ'য়ে উঠে থাকে,
নবীন বর্ষের জমা নিরুদ্ধ সঙ্গীত
চিত্তে তব উচ্ছ্বসিয়া ওঠে আজি যদি,
প্রাণহীন শীর্ণ নদী প্রবল বন্যায়
স্ফীত হ'য়ে উঠে থাকে শাহারা কল্লোলে,
শুনো না আমার মানা। জরির জলন্ত পাগ্‌ড়ীতে
ঢেকে দিও শির তব আফ্রিদী বিলাসে,
আতর গোলাব সুর্মা শেরোয়ানী পাজামা লেবাচে
আবরিও ক্লিষ্ট তনু। শুনো না আমার মানা কেউ,
আমার মানায় কেহ দিও নাক কান।

উৎসব প্রভাতে আমি বসে আছি বাতায়ন পাশে ;
আমারে প্রহার হানে মত্ত কোলাহল,
আমার ভাবনাগুলি নীলাকাশে বসন্ত বাতাসে
ছড়ায় বিষাক্ত হলাহল।

হে বেহেস্তবাসী বীরদল,
লহ লহ আজি মোর সহস্র সালাম।
আজিও শিরেতে বহি মৃত্যুহীন আশির্ব্বাণী তব।—
পথে পথে বেঁধেছিলে ঘর,
যৌবন শরাবে মত্ত দেশ দেশ ঘুরে
দিয়েছিলে লিখে ভালে, সারাটি জাহান।
ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিহীন নির্ব্বোধ, নির্ব্বোধ!

আষাঢ়, ১৩৪৯

আমাদের ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কালে,
আজি সে সমুদ্র-স্বপ্ন অনর্থ প্রলাপ,
শাহারা-ডিঙান সেই ইরানী উল্লাস
আজিহার জীর্ণ দেহে সুতীক্ষ্ণ শায়ক,
আমার হৃদয় আজি ঘুনধরা তরু
এনো না এনো না সেথা বৈশাখের ঝড়
আমার হৃদয় কাঁপে হাল্‌কা হাওয়ায় থরথর
আমার মনেতে নাহি সীমাহীন মরু
আমার চরণে আজি নাহি অশ্বেতর।

জীবনে পাইনি মোরা জয়ের প্রসাদ,
সমুদ্রমন্দির স্বপ্ন মিশরী বীরের,
আফ্রিদীর পাহাড়িয়া অফুরন্ত আরণ্য শরাব,
তাতার উটের মরুতৃষা ;
তবুও আসে না ঘুম নয়নে জড়ায়ে :
সুমেরীয় শীতল শিশির।
অজ্ঞান, অবোধ।

শুনো না আমার মানা। কুটিল ভাবনাগুলি মোর
কুটি কুটি ছিঁড়ে ফেলে উড়াও উড়াও নীলাকাশে,
করিনি করিনি মোরা বন্দরে নোঙর,
তরণী ঠেকেছে বালুচরে।
খুলে দাও পালগুলি, খুলে দাও বসন্ত বাতাসে,
যদি পারো মোর মানা শুনো না শুনো না ক্ষণতরে

আষাঢ়, ১৩৪৯

বসুধা

অমিয় চক্রবর্ত্তী

পোড়ো মেঠো মন
নিরন্ন নীল জীবন ;
জ্যান্ত ধানের জায়গায় ধ্যানে নিমীলিত মিথ্যে।
মাথাটা হয়নি উর্ব্বর
বই-পড়া বর্ব্বর
খুঁকুচি শিক্ষিত সহুরে বিবর্ণ চাকরির বৃত্তে ;
গুরুর বাক্যে অন্ধ, নয়, পুঁথির শানে-বাঁধা ধাঁধায়।

রোদ্দুরে জলে কাদায়
কোথাও কিছু কি গজাচ্চে, উঠ্‌চে, ঘুরন্ত ?
—বাড়ন্ত, প্রাণবন্ত ?—
তপ্ত সবুজ বাদামী
যার ধর্ম্ম আজ এবং আগামী
নয় কেবল জীর্ণ দামী ?

তারই কাছে থাকব, বাঁচব, নিশ্বাস মেলে রাখ্‌ব
পুকুর ধারে হোক্ হাটের পাশে
পাড়ার জামতলায়, বাড়ির পিছনের ঘাসে
যেখানে কারখানাঘরে কাঠ কাটচে করাত,
তুষ জমেচে, আস্তিনগুটোনো কারিগর, চকচকে লোহা নাড়চে শক্ত হাত।
জিইয়ে তুল্‌বে বর্ষার নতুন কল্মিশাক
লাউডগা, কচি শশা, কাঁচা আমড়া, তাজা লঙ্কা ;
সিঁদুরে মেঘের দূরে মৃদু ডঙ্কা,
গাছে কিচির মিচির পাখীর ডাক।
মেয়ে ছুটি পুতুল নিয়ে ব্যস্ত, ছোটো ছেলে দৌড়চ্চে দুরন্ত
—বাড়ন্ত, প্রাণবন্ত—

হালে বলদ জুৎচে,
ঝাঁপিমাথায় চাষী বৃষ্টিতে চারা পুঁতচে ;
পস্‌লা বৃষ্টিতে কালো সারালো মাটির গরম তাপ,
ধান-পাকানো তাপ ;
টন্‌টনে নেবুফুলে ঠাণ্ডা হাওয়া ;
সোনালি-কাঁটা কাঁঠাল, ভরাট আম, ঝিক্‌ঝিকে গ্রীষ্মে পাওয়া।

পোড়ো মেঠো মন
শীর্ণ নীল জীবন
চায় মগজে রোদ্দুর বৃষ্টি,
চাষের লাঙল, কাদায় সৃষ্টি,
চায় বীজের সংস্পর্শ,
শিকড়ের সংঘর্ষ।
প্রাত্যহিক অফুরন্ত
—বাড়ন্ত, প্রাণবন্ত—

খোলা চোখের দৃষ্টে
ধারিণী বিশ্বে॥

উপলব্ধি

বুদ্ধদেব বসু

এই তো প্রথম
লভিলাম তোমারে আমার প্রাণে,
হে বাংলা আমার বাংলা।
অন্ধকার যুগসন্ধিকালে
অন্তহীন মৃত্যুর মশালে
রক্তের ইন্ধন ঢালে
পূর্ব ও পশ্চিম ;

আষাঢ়, ১৩৪৭

আলায় পিশাচ-আলো নগরের নির্বাপিত দীপে
আকাশে সমুদ্রে দ্বীপে
শিল্পে কর্মে প্রেমে।
সে-আলোয় তুমি এলে নেমে
হে বাংলা, আমার বাংলা,
আমার নিভৃত ধ্যানে।
তুমি দেখা দিলে
লুব্ধতার রাক্ষসী মিছিলে
সহসা শ্যামল।
আহা কী শ্যামল স্নিগ্ধ মুখশ্রী তোমার
কত চিরন্তন বিষণ্ণতা
নৈঃশব্দ্যে কঠিন,
কত অভিশপ্ত সহিষ্ণুতা
ধূলায় বিলীন।
এতদিন জেনেছি তোমারে
পাষাণে স্তম্ভিত মূর্তি
দীন অশ্রুবিলাসীর দুর্বল আশ্রয়;
আজ এ-দুর্যোগে দেখি, না না, তা তো নয়,
তুমি সত্য, তুমি শুভ, তুমি ধ্রুবজ্যোতি।
এত দুঃখ শতাব্দী-সঞ্চিত
কেড়ে নিতে পারেনি তো
অন্তঃশীলা অমৃত তোমার।
তাই আজ বলি বার-বার
কত ভাগ্য তুমি যে আমার আর আমি যে তোমার,
কত ভাগ্য এ-প্রলয়ে
এখনো আমার বুকে রক্ত আছে, আছে এ-হৃদয়ে
অন্তহীন ভালোবাসা।
ভালোবাসা আছে, তাই আছে শেষ আশা।

মৃত্যুর আবর্ত হ'তে বাঁচাবো বিশ্বেরে
জয়ী হবো প্রেমে।
পাষাণ-প্রতিমা ভেঙে
দেখা দিলো উদ্দীপ্ত উজ্জ্বল
অথচ শ্যামল স্নিগ্ধ বাংলার ছবি।
আর আমি বাংলার কবি
পরান্নলোভীর পাপে, নরকের অশ্লীল নিঃশ্বাসে
যদিও আমিও দগ্ধ, তথাপি কবি হবার আছে দুঃসাহস।
হোক তাতে শত অপযশ
এখনো যে কবিত্বেই শ্রেয় ব'লে মানি
এ-ও তো তোমারি বাণী
হে বাংলা, আমার বাংলা।
এই যুগসন্ধিকালে
তুমি স্থির, অক্ষয়, অজেয়,
কারণ শৌর্যের চেয়ে সত্যেরে মেনেছো তুমি শ্রেয়,
মেনেছো প্রেমেরে বরণীয়
কোটি-কোটি হত্যার চেয়েও।
আজ আমি চিনেছি তোমারে।
দশভুজা চামুণ্ডা তুমি তো নও,
নও তুমি দশদিকপ্রহারিণী।
নও ধূর্ত বণিক-তারিণী।
তুমি যেন প্রাগার্য সাগরকন্যা,
শান্ত চোখে রেখেছো বাঁচায়ে
পৃথিবীর প্রাণের আদিম শ্যামলিমা।
ক্ষীণ দেহে, মৃদু কণ্ঠস্বরে
কত বন্য শতাব্দীর বর্বরতা
একান্তে করেছো জীর্ণ।
অতি ব্যস্ত জগতের এক কোণে

আষাঢ়, ১৩৪৯

প্রবলের তীব্র উৎপীড়নে
ধনদর্পিতের উপেক্ষায়
নিঃশব্দে জেনেছো তুমি জীবনের চরম মূল্যেরে।
তারি হবে জয়।
যদিও দুর্দান্ত তেজ মত্ত আজ ধ্বংসের তাণ্ডবে
তবু জানি তারি জয় হবে
সে-আদিম শ্যামল শান্তির।
আজ যারা দলে-দলে
পৃথিবী কাঁপায়ে চলে
দারুণ অস্ত্রের তেজে দিগ্বিজয়ী
বৈশ্যতার জারজ ক্ষত্রিয়,
তারা তো জানে না
হে বাংলা, আমার বাংলা,
কী যে অনির্বচনীয়
হৃদয়-মন্থন-করা তোমার অমিয়।
যেখানে দুর্বল তুমি সেখানে দুঃখের অন্ত নেই,
যেখানে তোমার শক্তি সেথা তুমি অনাক্রমণীয়।

পিড়িং মন্ত্র

ইন্দ্রাণী দেবী

"হুতোশ ডাঙার মাঠে
ওগো বুড়ো, পরম বুড়ো, সময় তোমার কাটে।
প্রখর সূর্য হান্‌লো অনল সারা দুপুর ধরে',
গাছের পাতা জিরি জিরি, ঘাস গেল সব মরে'।
সারাটা দিন কী-ই বা খেলে?
বেলা গড়ায় ম্লান বিকেলে।"

"গহীন রাতে খেয়েছিলেম স্বাতী তারার জল,
ওরে অবোধ, সারাটা দিন তাতেই পেলেম বল।
পিড়িং মন্ত্র জপিস্‌ যদি পরম ধৈর্য ধরে'
একলা কেন, সমস্ত গ্রাম তাতেই যাবি তরে'।
তাও যে তোরা জপলি নি,
একলা আমি কর্‌বো কী ?"

"ওগো পরম বুড়ো !
পিড়িং জপে' মর্‌লো সেবার গঙ্গারামের খুড়ো।
তুমি বল্‌লে করুণ চোখে, 'হায় রে অনিয়ম !
পুতস্বরের উচ্চারণে চট্‌বে না কি যম !
সঠিক রকম জপ্‌লে পরে
উপসে কি মানুষ মরে ?"

"হে পবিত্র পরম বুড়ো ! একলা তোমার তরে
আঁধার রাতে স্বাতীতারার সুধাসলিল ঝরে ;
মোদের বিপদ, ঘনায় দেখো আস্‌ছে কা'রা বেগে,
ধুলোর ঘূর্ণি উড়ছে দূরে, মিশ্‌ছে কালো মেঘে।
খাজনা-শোধের দিন বুঝি,
শূন্য ভাঁড়ার, নেই পুঁজি।

কেটেছিলেম খাল,
ঘরে তাঁদের ঢুকিয়েছিলেম, সেই তো হ'লো কাল।
এখন আসে দলে দলে পঙ্গপালের প্রায়,
একগুছি ধান রাখ্‌বে নাকো এককড়িপুর গাঁয়।
ঠেকেছি আজ বিষম দায়ে,
বাঁচ্‌বো বলো কোন্ উপায়ে।"

"দুদিন না হয় দিলিই উপোস, রে নির্বোধের দল,
অনুতপ্ত হ'বেই ওরা যতোই হোক্ না খল।

অনুতপ্ত না-ও যদি হয়, না হয় নাই বা হো'লো,
সবাই বল্‌বে, কী পুণ্যবান্! পিড়িং জপেই ম'লো।
পিড়িং মন্ত্র সার কথা,
নেইকো উপায় অন্যথা।"

*　　*　　*

তালপুকুরের ধারে
কৌতূহলী অশ্বারোহী দাঁড়ায় সারে সারে।
দিনের আলো মিলায় তবু উড়ে বেড়ায় কাক,
হুতোশ ডাঙার মাঠে ও কি ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক!
ছায়াদেহীর মতন কা'রা
পিড়িং পিড়িং চেঁচিয়ে সারা!

হুতোশ ডাঙার মাঠে
হাল ধরেনা গাঁয়ের চাষা, লোক চলে না বাটে।
ভিন্নদেশী রাহী আজো শোনে মাঠের মাঝে
শুক্‌নো হাড়ের খঞ্জনিতে পিড়িং মন্ত্র বাজে।
পিড়িং পিড়িং রাত্রিদিন
শব্দ ওঠে বিরামহীন।

তা'রে আমি কহিলাম একদিন

সুরেশচন্দ্র সরকার

তা'রে আমি কহিলাম একদিন স্বপ্নের নির্জনে
সন্ধ্যার নদীর তীরে, 'তোমারে ভুলিবো নাকো, সখী,
যতদিন বাঁচিবো ধরায়।' ছায়া-হিজলের ঘাটে
শুয়ে ছিল বিদেহিনী। অতীতের সুদূর পবনে
স্পষ্ট দেখিনু নড়ে রাঙা ফুতো শোলার পাখার

নড়েছিল সেদিন যেমন, যেন সে বলিতে চায়,
'আমি তো গিয়েছি থেমে বহুকাল, স্মৃতির হাওয়ায়
নড়ি ছায়াবৎ। কঠিন অ্যাম্বারে ধরা মরা মাছি,
তা'রি মতো নিরর্থক তোমার স্মরণে রয়ে আছি।'

পঙ্কজ

গোলাম কুদ্দুস

গাগরী ভাসায় রাধা জলে,
রাত বারোটায় পীচঢালা পথে
লোকটা কোথায় চলে।

ক্লান্ত শহর তন্দ্রামগ্ন, স্তব্ধ দিনের পাখা,
কর্মের নদী নির্জন সরোবর।
অতল সলিলে খসিল আঁচোল কাঁচুলী অলরাখা,
লুপ্ত খণ্ড খণ্ড বালুর চর।

বৃত্তাকারেই সর্পিল পথ বারে বারে প্রসারিত,
দেহের অতলে হাজার মৃত্যু আসে।
পঙ্ক এখন কেবলি জৈব যাতনা-সশঙ্কিত
পঙ্কজহারা কাঁপিছে শয্যাপাশে।

গাগরী ভাসায় রাধা জলে।
মৃত্যুশীতল নূপুরের খোঁজে
বুঝি বা লোকটা চলে।

নীল যমুনার জলতরঙ্গ ক্লান্ত অশ্বখুরে,
ছায়াকর্দম টবের মৃত্তিকায়,
মুরলীর ধ্বনি মিলায় কলের বাঁশির তীক্ষ্ণ সুরে—
দীর্ঘ কেশের জলে ঘুম ভেঙে যায়।

আষাঢ়, ১৩৪৭

স্তব্ধ আকাশ, শূন্য আকাশ, বন্ধু আকাশ তবু
কোনো কোনো দিন বক্ষ ভরিয়া জাগে,
এখানে ওখানে প্রথম চৈত্রে কৃষ্ণচূড়ায় কভু
বর্ণবিলাসে সুরের আগুন লাগে।

রাধার গাগরী ভরে জলে।
রক্তমুখর নীল যমুনায়
সাঁতার দিয়ে কে চলে।

আকস্মিকা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

তোমায় দেখিনি আমি স্বয়ম্বরা সূর্য্যসভাতলে
অথবা কিংশুকহাসি দ্বাপরের মর্ম্ম-তপোবন—
আত্মায় জ্বালেনি দীপ সলজ্জ শিখায়
ঋজুদেহ কাঁপেনি পুলকে
রোমাঞ্চিত ঐক্যতানে জাগেনিকো পৌরাণিক প্রেম
কাল্পনিক কবিতায় অত্যুক্তির মত।

তবু তুমি অপরূপ আশ্চর্য্য সুন্দর
তবু তুমি বিরহিণী ক্ষণদীপ্ত প্রথম দর্শনে
নিমেষে সমস্ত প্রাণে আধিপত্য করেছ আমার;
অথচ তুমি তো প্রিয়া নও
নও তুমি প্রিয়তমা, সর্ব্বস্বান্ত করোনি নিজেরে
গতানুগতিক ত্যাগে—আত্মসমর্পণে;
তুমি তাই সার্থক স্মরণ।
মনে পড়ে একদিন মানসিক ঝড়ের রাত্রিতে

আষাঢ়, ১৩৪৭

তুমি এলে মেঘকন্যা হে বিদ্যুল্লতা
চিরায়ুর মরীচিকা মায়াবিনী সোনালি ঝলকে !
জীবনশর্ব্বরী জুড়ে বিকাশ তোমার
অলক্ষ্য প্রেমের বাষ্পে বিরহের মেঘে ।
তুমি নও জনতার জনগণমনের নায়িকা,
নও তুমি সম্রাটনন্দিনী,
অহঙ্কারে রূপে গর্ব্বে জীবন্ত লালসা ।
বুদ্ধিদীপ্ত রূপে তুমি চির অনিন্দিতা
সাবলীল লীলালাস্যে চঞ্চল বিহ্বল
শ্যামল যৌবনশিখা তব
তারুণ্যে শ্যামায়মান হে মোর শ্যামলী ।
তাই আমি তৃপ্ত তবু সর্ব্বস্বান্ত করিনি নিজেরে
হে কবিতা বিদ্যুৎরূপিণী ।

এ জীবন অরণ্যের ঘন পল্লবিত শাখে শাখে
অন্ধকারে অনাদৃতা কুসুমিতা বল্লরীবিতানে
হে আমার ক্ষণদীপ্তি অতীন্দ্রিয় সুরভিসঞ্চার
তুমি মোর মহাশ্বেতা স্বর্ণপদ্মাসনা
নিভৃত বাসরকক্ষে হে বরবর্ণিণী ।
সমস্ত চিন্তার বোঝা শূন্য করে দিয়ে
লঘুমন ভেসে যায় দুরাশার ঝড়ে
বেদনার মেঘে মেঘে অতৃপ্তির দুঃসহ আঘাতে
বার বার জেগে ওঠো বিদ্যুৎরূপিণী—
বার বার জ্বলে ওঠো এ যৌবন-জলদ পঞ্জরে
অলক্ষ্য প্রেমের ক্ষিপ্রশিখা
অকস্মাৎ এ-জীবনে আধিপত্য করেছ যেমন ।
তাই তো তোমার দেওয়া শাস্তি সকরুণ
অগ্নিগর্ভ মেঘে মেঘে ভারাক্রান্ত করেছে আমার ।

তুমি নও প্রিয়তমা
গতানুগতিক ত্যাগে আত্মসমর্পণে
সর্ব্বস্বান্ত করোনি নিজেরে
তুমি মোর স্বর্ণদীপ্তি জীবনের মেঘে
হে কবিতা সার্থক স্মরণ !

নূপুর

গোপাল চট্টোপাধ্যায়

চলতি পথের বাঁকে পেলেম দেখা,
চলতি পথের বাঁকে।
চলতি পথের বাঁকে দেখি চরণ ছুটি লঘু
গাছের ফাঁকে ফাঁকে
কাঁকর ছাড়ি তৃণে।

ভেবেছিলেম শুনব নূপুর।
আমলকী আর কচিপাতার গন্ধে কণ্টকিত
স্তব্ধ দুপুর
শুনতে তো চায় তোমার নূপুরধ্বনি
কিন্তু শুনি
বুঝি তারি বুকের ধ্বনিটুকু,
বুঝি আমার নিজেরি স্পন্দন।

খুট খুট খুট খুট—
ব্যতিক্রমের ভয়ে
মেট্রোনোমের মতন বাঁধা তালে
সতর্কতার শাসন দিয়ে বাঁধা

প্রাণের শাসন দিয়ে বাঁধা
রক্তচলার মত।
দ্বিপ্রহরের তন্দ্রাতে অচল
পাতার হ্রস্বশ্বাস।
কাঁটার ঝোপে ফুলের উঁকিঝুঁকি।
আপন বোনা জালের একটি কোণে
মাকড়সা কি শোনে
মাছির গুঞ্জরণ।
বনের আঁচল নাইক বুকে।
কেবল ওঠে নামে
নগ্ন বুকে সুধার ছুটি ঢেউ
কাঠবিড়ালির নিলাজতায় শিরশিরিয়ে উঠে
আবার দোলে,
আবার ছুটি ঢেউ।

বনের লজ্জা বুঝি
হরণ হবে তোমার পায়ে এই ভয়েতে হলেম লজ্জাহত।

আলতাবিহীন তোমার পায়ে আঁচলখানি তার
জানায় নমস্কার,
লজ্জাবিহীন অবাধ নমস্কার।
দেখি আজো আলতা আছে আঁকা
তোমার ঠোঁটে,
বনের সবুজ লাজ
আঁকা আছে তোমার চোখের কোণে।

অভিসারের লজ্জাটুকু তেমনি আছে আজো
অমর হয়ে,
গোপন হয়ে,

ঐ যেখানে গোড়ালিটির ঈষৎ বক্রতাতে
ঈষৎ ক্ষয়ের রেখা
নিয়মিত চলার তালে
ঘটায় অনিয়ম
কাঁকর হতে আমার রোমে রোমে

নীল ঘোড়া

মনজুর আহ্‌সান

জীবনের যুদ্ধে চরম হার মেনেছি :
চূর্ণ সকল আশা, স্বপ্ন ;
যেবার জয়ের সে স্বপ্ন আকাশে মিলোয় !
তবু এই সার জেনেছি,—
হৃতরাজ্য ফেরাতেই হবে।
তাই পলাতক,
সহায় নীল ঘোড়া চৈতক,
গতিবেগ দুর্ব্বার,
পেরোলাম কত জনপদ, পাহাড়।
আগুনের ফুল্কি ওঠে ঘোড়ার খুরে,
রাজপুতনার কত আগুনতাতা মরুভু
পশ্চাতে মিলোল দিগন্তে,
আমাদের ঘোড়া উধাও
তীরের বেগে দূরদেশে।

আমরা উধাও :
প্রেম তো শুধু বিলাস, জড়তা ও মৃত্যু,
আমরা সৈনিক,
দুরন্ত, নির্ব্বোধ, নির্ভীক।

তবু পলাতক,
তোমাদের পিছু ডাক নিষ্ফল,
ঝড়ের বেগ আমাদের ঘোড়ার পায়ে।
পাহাড়ের শক্ত গায়ে
ঘোড়ার খুরে উঠছে শব্দ ;
তোমাদের পুরানো পিছু ডাক,
'হো নীল ঘোড়েরে আসওয়ার'
নৈঃশব্দ্যে মিলোয় বারবার।

শুধু শোনা যায়
পাহাড়ের শক্ত বুকে,
আমাদের বুকের গহ্বরে
উঠচে প্রতিধ্বনি,
নীল ঘোড়ার শক্ত খুরের আওয়াজ।

গীতা

হীরালাল দাশগুপ্ত

মদির আলস্য নাই মহুয়ার বনে !
নীল পত্র মর্ম্মরে মর্ম্মরে
সহস্রের সঙ্গীতের স্বর কভু শুনিতে না পাই !
ঘন-কৃষ্ণ পল্লবের তলে
বিবর্ণ আঁখির তারা—
নাহি সেই রভষিত প্রথম রাত্রির
মুহূর্ত্তের মৃত্যুর ইসারা !
ধমনীর ক্ষীণ রক্তস্রোতে নাই
আদিতম অশরীরী অন্ধ উন্মাদনা
অসংবৃতা উর্ব্বশীর স্তনহার হোতে
আর নাহি "অকস্মাৎ নভস্তলে খ'সে পড়ে তারা !"
বিদূষিত নাহি হয় বাত্যবিদীর্ণ বদ্ধ স্বপ্ন-সিংহদ্বার !

আষাঢ়, ১৩৪৭

কান পেতে শুনি শুধু পাণ্ডুর পৃথিবী বক্ষে প্রেতায়িত পীত পদক্ষেপ!
আর দেখি
লৌহ-যন্ত্র-দানবের বিরাট ব্যাদিত মুখে
মানুষের লাল রক্ত নিরন্তর ধোঁয়া হোয়ে উড়ে উড়ে যায়
বেদনা পীড়িত রক্ত অতি পুরাতন
শোভিতেছে অর্থহীন অজ্ঞাত আকার
ভারসাম্যহীন
বিশ্বব্যাপী বিমূঢ় বুভুক্ষা
অন্ধ উপক্ষয়
নিষ্ঠুর মৃত্তিকা...
হে ভারত, প্রবুদ্ধ ভারত,
সেই তব সৌম্য শান্ত তপোবন সমুত্থিত শাশ্বত শান্তির বাণী
মৃত্যু লভি লৌহযন্ত্র নগ্ন নিষ্পেষণে দীর্ণ করে বিবর্ণ আকাশ!
তোমার অতীত শুধু অর্থহীন স্মৃতির কঙ্কাল,
প্রাবল্যের পদতলে বৈশ্ববিক বৈকল্যের পরম প্রাঞ্জলি!

হে মৃত্তিকা, নিষ্ঠুর মৃত্তিকা,
আবর্ত্ত দেখিতে পাও দিকচক্রবালে
রচিতেছে মহাঘূর্ণি অদৃশ্য ঝঞ্ঝার?
দেখিতে কি পাও?
শুনিতে কি পাও ঐ মহাকাল মন্দিরার মৃত্যু-মন্ত্র বাজে?
শুনিতে কি পাও?
উঠিবে—উঠিবে ঝড়—
মহাকাল-বৈশাখীর ঝড়।
উড়ে যাবে জীর্ণ যবনিকা—
পুরাতন পৃথিবীর জঞ্জালের স্তূপ!
যে-শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম আর ইতিহাস
যুগে যুগে দানবের গাহে জয়গান
ভস্ম হবে তার পাণ্ডুলিপি!
লুপ্ত হবে লুব্ধ বৈশ্য কপট ব্রাহ্মণ
ধ্বংস হবে মিথ্যার মন্দির
পৃথিবী দেখিবে এক নতুন পৃথিবী!
নতুন মানুষ আর নতুন ঈশ্বর!

সংকেত

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

যদি ছুটি চাই
অনির্দিষ্ট অন্ধকারে দুরন্ত চড়াই।
তখনো মনের কোণে সূর্যরাঙা আমন্ত্রণে
তোমার শরীরী স্মৃতি ফিরে পাই।
কবে কোন্ শরতের প্রথম নেশায়
সাঁওতালি সবুজ ক্ষেত
স্পন্দিত সংকেত
এনেছিলো রক্ত কণিকায়।
চুলে দিয়েছিলে ফুল সে কি ভুল, সে কি ভুল?
(সে রাত্রি কোথায়?)
আকাশের স্বচ্ছ চোখে
প্রেমমৃত্যু তুলে রেখে
অন্ধকারে অন্ধ চোখে ছুটি চাই।

শেষ কবিতা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নে দেখেছি কৃষ্ণকায় কৃষ্ণদন্ত পুরুষ!
তারপর মাঝরাতে
তীব্র বাঁশীর আর্তনাদে
ঘুম ভেঙে যায়।
অস্পষ্ট আলোয় পৃথিবী স্বপ্নে কথা কইছে
রাত্রের ডাক কি গভীর!

তাপর সিঁড়ির তলায় যাই—
—ওরা জ্বালে আমার আকাশে
পারিজাতের কেশর নিয়ে নয়।
সিগারেট দিয়ে তাই
অশান্ত আয়ুকে ভোলাই।

কিশোর কবি

প্রতিভার পূর্ণবিকাশ যতই মনোহর, তার প্রাথমিক উন্মেষও ততই হৃদয়গ্রাহী, সাধারণ পাঠকের পক্ষে না-হ'লেও সাহিত্যের বিশেষজ্ঞের কাছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনে প্রথম যে-কবিতাটি লেখেন, আর যে-কবিতায় 'দ্বিরেফ' শব্দটি ব্যবহার ক'রে গুরুজনের কাছে লাঞ্ছিত হন, সেগুলি আজ উদ্ধার করা সম্ভব হ'লে বাঙালিজাতির অমূল্য সম্পদ হিসেবেই গণ্য হ'তো। কিন্তু জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত সেই নীল কাগজের খাতাটি বহুদিন লুপ্ত, বালক রবীন্দ্রের আরো অনেক রচনাচর্চাই নিশ্চয়ই ধুলোয় বিলীন হ'য়ে গেছে—এমনকি, তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনের অনেক মুদ্রিত গ্রন্থও এতদিন প্রচারের বহির্ভূত ছিলো। দু'চারজন উৎসাহী গ্রন্থবিলাসীর সংগ্রহের মধ্যে হয়তো 'কবিকাহিনী' কি 'বনফুল' চোখে পড়তো, কিংবা 'বালক' ও 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় দেখা যেতো কবির বাল্যরচনা; 'রচনাবলী'র দুই খণ্ড অচলিত সংগ্রহে কবির সমগ্র কৈশোরিকা আজ আমাদের অধিগম্য।

এ-সব গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশে রবীন্দ্রনাথের নিজের উৎসাহ ছিলো না, তিনি বরঞ্চ এর বিরোধীই ছিলেন। অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের 'নিবেদনে' শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন :

'এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে সুতীব্র বিরাগ তিনি নানা উপলক্ষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগকালেও তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছেন,

"বিশ্বভারতী-গ্রন্থপ্রকাশমণ্ডলী আমার সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থাবলী বলতে বোঝায় অনেকখানি অংশ যা প্রাগৈতিহাসিক। যার সঙ্গে আমার সাহিত্য-ইতিহাসের দূরবর্তী যোগ আছে কিন্তু তার চলতি কারবার বন্ধ হ'য়ে গেছে। অতীতের ঘষে-যাওয়া-তামার ফলকে তার বাণী যে অক্ষরে চিহ্নিত, তাকে গুপ্ত-যুগের লিপি বলা যেতে পারে। সেই লিপির অস্পষ্টতা থেকে অর্থ উদ্ধার করবে বসে বিজ্ঞানী, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাকে স্বীকার করতে চায় না। কেন না যে বাণীর শিল্প-

---

* রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ, ১ম ও ২য় খণ্ড। প্রথম খণ্ডে আছে : 'কবি-কাহিনী,' 'বন-ফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'কাল-মৃগয়া,' 'বিবিধ প্রসঙ্গ,' 'নলিনী,' 'শৈশব সঙ্গীত,' 'বাল্মীকি প্রতিভা' (প্রথম লেখন)। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে : 'আলোচনা' 'সমালোচনা', 'মন্ত্রি অভিষেক,' 'ব্রহ্ম মন্ত্র,' 'উপনিষদ ব্রহ্ম,' 'সংস্কৃত শিক্ষা' (২য় ভাগ), 'ইংরেজি সোপান', 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা,' 'ইংরেজি সহজ শিক্ষা' 'অনুবাদ চর্চা' 'সহজ পাঠ' (১ম ও ২য়), ইংরাজি পাঠ (১ম), 'আদর্শ প্রশ্ন'। বিশ্বভারতী।

আবরণ গেছে জীর্ণ হ'য়ে, সাহিত্যের দরবারে তার প্রবেশ করবার মতো আব্রু নেই।..."

এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতুলনীয় ভাষায় এ-কথাটাই বলেছেন যে যে-রচনার মূল্য শুধু ঐতিহাসিক তার কোনো মূল্যই নেই। তা পাণ্ডিত্যের উপাদান হ'তে পারে, কিন্তু সাহিত্যভোক্তার পরিত্যাজ্য। বিশেষত তাঁর নিজের অপরিণত রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে সংকোচ এত প্রবল ছিলো যে তিনি 'মানসী'র আগে সমস্তই বর্জন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু বাঙালি পাঠক যে তাঁর এই ইচ্ছা স্বীকার করতে পারেনি, এমনকি তাঁর বাল্যরচনার সংগ্রহ প্রকাশেও আজ আনন্দিত তার কারণ শুধুই প্রগল্‌ভ কৌতূহল কিংবা ভক্তির উন্মাদনা নয়। অবশ্য এই বই দুটি স্বভাবতই সাধারণ পাঠক অপেক্ষা সমালোচক কিংবা পণ্ডিতের পক্ষেই বেশি মূল্যবান, কিন্তু সাহিত্যের একটা ঐতিহাসিক দিক তো আছেই, সেটা অগ্রাহ্য করাও সম্ভব নয়। রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ এই অচলিত সংগ্রহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, তার মৃদু আভা থেকে শুরু ক'রে, মধ্যাহ্ন-সূর্যের জ্যোতির্ময়তা পার হ'য়ে সান্ধ্য সোনার ঐশ্বর্য পর্যন্ত সমগ্র বিবর্তনের লীলা অনুসরণ ক'রে যাওয়া—এ কাজটি হৃদয়ের যেমন প্রিয় বুদ্ধির পক্ষে তেমনি উত্তেজক।

সুতরাং এই অচলিত সংগ্রহ প্রকাশের প্রয়োজন ছিলো। যদিও কবি নিজে বলেছেন,

> বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা
> বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা;—
> আবর্জনারে বর্জন করি যদি
> চারিদিক হতে গর্জন করি উঠে
> 'ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে
> যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি।'

তবু আমরা জানি যে আলোচ্য গ্রন্থগুলির মূল্য শুধুই ঐতিহাসিক নয়। কাঁচা বয়েসের কাঁচা লেখার ভিতর দিয়ে থেকে-থেকে ঠিকরে পড়ছে প্রতিভার ঝলক। তাকে প্রতিভা ব'লে সে-যুগে অল্প লোকই বোধ হয় চিনতে পেরেছিলো; সকলের আগে এবং সব চেয়ে বেশি ক'রে চিনতে পেরেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি যে কত গভীর ছিলো তা কিশোর-রবীন্দ্রনাথকে তাঁর মাল্যদানের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

অচলিত সংগ্রহের কাব্যাংশ প'ড়ে সব চেয়ে যেটা বিস্ময়কর মনে হয় সেটা এই যে তৎকালীন খ্যাতিমান কবিদের কোনো প্রভাবই যেন এই কিশোর কবির মনে রেখা পড়েনি। মধুসূদন তাঁকে স্পর্শ করেননি, হেম-নবীনের বিউগলের আওয়াজে সাড়া দেয়নি তাঁর মন। একদিকে ভারি ওজনের

মহাকাব্য, অন্যদিকে ঈশ্বর গুপ্ত ধরনের প্রাচীন-কবিগানপন্থী লোক-হাসানো পদ্য—খ্যাতির এ দুই সহজ পথ ছেড়ে আধুনিক বাংলায় তিনি সেই নতুন জাতের কবিতা সৃষ্টি করলেন ইংরেজিতে যাকে বলে লিরিক। বিশাল গীতি-প্রতিভার কুঁড়ি তখন থেকেই একটি দুটি ক'রে ফুটছে। প্রথম থেকেই এটা স্পষ্ট যে তাঁর বাণী একেবারে নতুন, এবং এই অপূর্বতার জন্য তিনি তরুণ বয়সে ভালোবাসা যত পেয়েছেন, তার অনেকগুণ পেয়েছেন বিদ্বেষ। তাঁর সব চেয়ে সন্নিকট অনুপ্রেরণা ছিলো বৈষ্ণব কবিতা, আর উনিশ শতকের ইংরেজি কাব্য। সমসাময়িক বাঙালি কবিদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র বিহারী-লালের কাছেই তিনি ঋণী। সেকালের প্রসিদ্ধ কবিদের মানলেন না, অথচ কম-খ্যাত বিহারীলালকে যে গ্রহণ করলেন এতে তাঁরই মনের বিশেষ ঝোঁকটি বোঝা যায়। এটা জানা গিয়েছে যে বিহারীলাল ছিলেন তাঁদের পরিবারেরই প্রিয় কবি; তাঁর বৌঠাকরুন অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহধর্মিণী তাঁকে প্রায়ই এ-কথা ব'লে সস্নেহ লাঞ্ছনা করতেন যে 'তুমি কক্ষনো বিহারীলালের মতো ভালো লিখতে পারবে না'। এদিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই কবিকে গুরু ব'লে স্বীকার করেছেন 'আধুনিক সাহিত্যে' অন্তর্গত বিহারীলাল সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধে। 'বর্তমান সমালোচক এককালে "বঙ্গসুন্দরী" ও "সারদামঙ্গলে"র কবির নিকট হইতে কাব্য শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ, ছন্দে এবং ভাষায় শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক। এই প্রসঙ্গে আমার সেই কাব্যগুরুর নিকট আর একটি ঋণ স্বীকার করিয়া লই। বাল্যকালে "বাল্মীকি-প্রতিভা" নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া…অভিনয় করিয়াছিলাম।… সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের "সারদামঙ্গলে"র আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।'

বিহারীলাল যে রবীন্দ্রনাথকে এতখানি মুগ্ধ করেছিলেন তার কারণ কী। তার কারণ বিহারীলালের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন বৈষ্ণব কবিদের পরে প্রথম বাঙালি গীতিকবি। তাঁর একটি স্তবক উদ্ধৃত ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা।' কোনো বাঙালি কবি সহজ স্বাভাবিক ভাষায় নিজের মনের কথাটি বলছেন, শুধু এই জিনিসটি রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর আনন্দের হিল্লোল তুলেছিলো। তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লিরিক কবির মুখ থেকে একজন ক্ষুদ্র লিরিক কবির উদ্দেশে এই অকৃপণ স্তুতিবর্ষণ।

অবশ্য 'বঙ্গসুন্দরী' বা 'সারদামঙ্গল' বিশুদ্ধ লিরিকের পর্যায়ে পড়ে না, কারণ দুটিই দীর্ঘ কাব্য। তবে তারা জাতে লিরিক নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথের

কৈশোর রচনাও তা-ই। 'কবিকাহিনী' ও 'বনফুল' আখ্যান-কবিতা, কিন্তু আখ্যানের অংশ তাতে তুচ্ছ, 'ভগ্নহৃদয়ে'র চেহারাটা নাটকের কিন্তু তাতে নাটকীয়ত্ব কিছুই নেই—তা আগাগোড়া একটি লিরিক দীর্ঘশ্বাস। 'রুদ্রচণ্ড' ও 'কালমৃগয়া'য় নাটকীয় উপাদান কিছু আছে, আবার গদ্যনাটক 'নলিনী'তে ঘটনাচক্রের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা হৃদয়াবেগের সহজ উচ্ছ্বাসই বেশি। এই গ্রন্থগুলি তারুণ্যের সমস্ত অপরাধেই চিহ্নিত, আবার তারুণ্যের মাধুর্য দিয়েই গড়া। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাতেই যে-একটি অবর্ণনীয় লাবণ্য আমাদের আচ্ছন্ন করে, এই কিশোর কোরকগুচ্ছেও তার স্পর্শ আছে—বর্ণনার আতিশয্য, অকারণ দীর্ঘতা, কাহিনীর অসঙ্গতি, কুশীলবদের অবাস্তবিকতা—এই সমস্ত অপরাধ কাটিয়ে উঠেও সেই লাবণ্যসৌরভ আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত হয়। আর হঠাৎ এমন এক-একটি ছোটো-ছোটো কাব্যাংশ আমাদের চমকে দেয়, যা এমনকি কবির পরিণত রচনার পাশেও স্থান পেতে পারে।

সখি, ভাবনা কাহারে বলে?
সখি, যাতনা কাহারে বলে?
তোমরা যে বল দিবস রজনী
ভালবাসা ভালবাসা
সখি, ভালবাসা কারে কয়?

কিংবা

শুন নলিনী খোল গো আঁখি
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি!
দেখ, তোমারি দুয়ার' পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি।

কিংবা

আমার কুসুম-কোমল হৃদয়
কখনো সহে নি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি
সহেনি ভ্রমর চরণ-ভর।

এ-সব স্তবক কবি নিজে বর্জন করলেও আমরা করিনি, বাঙালি পাঠকের মনে চিরকালের মতো এরা মুদ্রিত হ'য়ে আছে। এবং এ-রকম আরো অনেক আছে।

'শৈশব-সঙ্গীতে'র 'অপ্সরা-প্রেম' কবিতায় একটি 'গীত' আছে যাকে বলা যেতে পারে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র পূর্বাভাস :

কেন গো সাগর এমন চপল
এমন অধীর প্রাণ,
শুন গো আমার গান
স্থবে শুন গো আমার গান। ...

'ভগ্নহৃদয়ে'র একটি গানও অতি প্রবলভাবে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র স্মারক :

কি হ'ল আমার? বুঝি বা সজনি
হৃদয় হারিয়েছি।
প্রভাত কিরণে সকাল বেলাতে
মন লোয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি, চেতনা পাইয়া
সহসা সজনি দেখিনু চাহিয়া,
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি।

এর ধ্বনি, এর সুর, এর অতিশয়োক্তিটুকু পর্যন্ত 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র কথা মনে করিয়ে দেয়। বোঝা যায় ঐ কবিতা রচিত হবার আগে অনেকবার তার মহড়া হ'য়ে গেছে।

'ভগ্নহৃদয়ে'রই আর-একটি উদ্ধৃতি নেয়া যাক, এটি 'পতিতা'র পূর্বধ্বনি :

গীতস্বর শুনি চমকি উঠিনু
শুনিনু মধুর বাঁশরী বাজে,
গীতের প্লাবনে আকাশ পাতাল
ডুবিয়া গেল গো নিমেষ মাঝে।
আকাশ-ব্যাপিনী জ্যোছনায়, সখি,
মরমে মরমে পশিল গান,
পৃথিবী-ডুবান জ্যোছনারে, সখি,
ডুবায়ে দিল সে মধুর তান।

এ-সব অংশ প'ড়ে নিঃসংশয়েই মনে হয় যে কিশোর রবীন্দ্রনাথ আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ যে-কোনো কবি অপেক্ষাই অগ্রসর ছিলেন। এক 'ভগ্নহৃদয়ে' যতখানি ছন্দের বৈচিত্র্য আছে তা পূর্ববর্তী সমস্ত কবিদের সমগ্র রচনাবলীতেও বোধ হয় দেখা যায়নি। সেকালে কবিরা বলতে গেলে পয়ার ছাড়া আর-কিছু জানতেনই না (বলা বাহুল্য যাকে ত্রিপদী বলা হ'তো তাও পয়ার ছাড়া কিছু নয়, এবং অমিত্রাক্ষর তো অবশ্যই পয়ারজাতীয়), কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বালক বয়েস থেকেই তিনমাত্রার ছন্দ ব্যবহার করছিলেন। এটি বিহারীলালের কাছে তাঁর প্রধান ঋণ: তাঁর রচনাতেই একটি অভিনব ছন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হন যার চরম ব্যবহার তিনি করেন 'পতিতা' কবিতায়।

আষাঢ়, ১৩৪৯

একদিন দেব তরুণ তপন
　　হেরিলেন সুরনদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারী রতন
　　খেলা করে নীল নলিনী দলে।
　　　　　　　　　(বিহারীলাল—'বঙ্গসুন্দরী')

এ থেকে 'পতিতা' বেশি দূরে নয়, বরং প্রথম দর্শনে এমনও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিহারীলালের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণের ভার বড়ো বেশি। আসলে অবশ্য তা নয়, আসলে এই ছন্দের মূল সূত্রই বিহারীলাল আবিষ্কার করতে পারেননি, করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে এই ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি বলছেন যে 'এ ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে যুক্ত অক্ষরের স্থান নাই।' উদাহরণ স্বরূপ দুটি শ্লোক পাশাপাশি উদ্ধৃত করেছেন। একটি উপরে দেয়া হয়েছে, আর একটি এই :

অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে
　　ধরিয়ে ললিত করুণ তান;
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে
　　গাহিছে আদরে স্নেহের গান।

দ্বিতীয় শ্লোক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এই : '"অপ্সরী কিন্নরী" যুক্ত অক্ষর লইয়া এখানে ছন্দ ভঙ্গ করিয়াছে। কবিও এই কারণে "বঙ্গসুন্দরী"তে যথাসাধ্য যুক্তাক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।…কিন্তু বাংলা যে-ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না সে-ছন্দ আদরণীয় নহে।'

যুক্তাক্ষর ছাড়া বাংলা ছন্দে জমে না, এ-কথা সত্য, কিন্তু আশ্চর্য এই যে আলোচ্য ছন্দে যুক্তাক্ষরের স্থান নেই এত বড়ো ভুল ১৩০১ সালেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। এ-ছন্দে যুক্তাক্ষর অসঙ্গত এ-জ্ঞান বিহারীলালেরও ছিলো, কিন্তু তিনি যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে শিখেছিলেন মাত্র, রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন এ-ছন্দে যুক্তাক্ষরের ব্যবহার। ঠিক কোন সময়ে করলেন সেটা গবেষণার বিষয়, আশা করি খুব জটিল গবেষণার নয়। তবে 'অচলিত সংগ্রহে'র সমস্ত কাব্যেই তিনমাত্রার ছন্দে তিনি বিহারীলালকে অনুসরণ করেছেন—অর্থাৎ যুক্তাক্ষর পারতপক্ষে ব্যবহার করেননি, কিন্তু যেখানেই যুক্তাক্ষর বসেছে সেখানেই ছন্দ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' সম্ভবত একটিও যুক্তাক্ষর নেই।* কিন্তু তিনমাত্রায় যুক্তাক্ষরকে দু'মাত্রা ধরলে

* কিন্তু 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'ও যুক্তাক্ষরের যথার্থ প্রয়োগ আছে—'মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়'। এখানে 'উল্লাসে' চার মাত্রা। অতএব বলতে হয় ১৩০১-এর অনেক আগেই কবির সহজ প্রবৃত্তি দিয়ে তিনি যে-রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন, তা বুদ্ধির বিচারে ধরা পড়তে অনেকদিন কেটে গিয়েছিলো।

যে তার ধ্বনি অনেক বিচিত্র ও রস অনেক গাঢ় হয় এ-কথা আবিষ্কার করতে রবীন্দ্রনাথের খুব বেশি দেরি হয়নি, 'মানসী'তে এসেই পাওয়া গেলো, 'নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি', তারপর 'সোনার তরী'তে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। 'পতিতা' যদিও ১৩০৪ সালের রচনা, 'মানসী' প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে, সুতরাং ১৩০১ সালে রচিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে এত বড়ো একটা ভুল করেছিলেন তার কারণ নিছক অনবধানতা ছাড়া আর-কিছু হ'তে পারে না। হয়তো সে-মুহূর্তে তাঁর খেয়াল হয়নি যে 'নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া' আর 'বঙ্গসুন্দরী'র ছন্দ আসলে একই, তাই এমন বিস্ময়কর কথা বলতে পেরেছিলেন যে ও-ছন্দে যুক্তাক্ষরের জায়গা নেই। আমরা এখন জানি যে যুক্তাক্ষর না-থাকলে ও-ছন্দ কিছুক্ষণ পরেই ক্লান্তিকর হ'য়ে ওঠে; পয়ারের সঙ্গে ওর জাতেরই তফাৎ, তবু পয়ারের মতোই ও যুক্তাক্ষরনির্ভর, অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের বিচিত্র লীলাতেই ওর সম্মোহন। এবং এ-জ্ঞান আমরা লাভ করেছি রবীন্দ্রনাথের কাছেই।

> ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী
> চরণপদ্মে নমস্কার—
> * * *
> তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর
> এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

এ-সব পংক্তি এত যে সুন্দর তার কারণই তো যুক্তাক্ষরের সুমিতপ্রয়োগ।

'কবিকাহিনী' 'ভগ্নহৃদয়' 'শৈশবসঙ্গীতে' তিনি তিনমাত্রায় হাত পাকাচ্ছেন, মূল রহস্যটা ধরতে এখনো দেরি। পয়ারও আছে প্রচুর, আছে অমিত্রাক্ষর, 'রুদ্রচণ্ডে'র অমিত্রাক্ষর তো রীতিমতো ভালো। শুধু ভালো নয়, মৌখিক ভাষার ছন্দের সঙ্গে অমিত্রাক্ষরকে মেলাবার চেষ্টা সেখানে আছে—মধুসূদন সেটা মনে-মনে চেয়েছিলেন, কিন্তু কেমন ক'রে করতে হয় জানতেন না।

> চুঁসনে চুঁসনে মোরে, রাক্ষসী, চুঁসনে ('রুদ্রচণ্ড')

এ-ধরনের পংক্তি মধুসূদনের পক্ষে লেখা সম্ভব ছিলো না। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের কিশোর প্রতিভা কী ছন্দে কী প্রসঙ্গে সব বিষয়েই নবীনের সন্ধানী; এবং কিশোর বয়সেও তাঁর কৃতিত্ব যে কতখানি তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে এখন দুরূহ, কারণ তাঁরই দীর্ঘজীবনের সাধনার ফলে আমাদের মনে কাব্য ও সাহিত্যের আদর্শ এখন অনেক উঁচু। যদি নিরপেক্ষ-চিত্তে হেমচন্দ্র কি রঙ্গলালের রচনার সঙ্গে 'ভগ্নহৃদয়ে'র তুলনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহ'লে বোঝা যাবে যে এ-তফাৎ দুয়ে আর চারের নয়, এক

আর একশোর তফাৎ। সে-যুগে বাংলা কবিতার যা অবস্থা ছিলো তার আদর্শে বিচার করলে এই কিশোরকেই যুগান্তকারী লেখক ব'লে স্বীকার করতে হয়। যে-কালে 'হয়েছে'র সঙ্গে 'করেছে'-র মিল চলতি ছিলো, সেকালে মিলেরই বা কী ঐশ্বর্য—যদিও সে-সব মিল বহু অভ্যাসে এখন আমাদের অতি সাধারণই মনে হয়। তবু হঠাৎ 'নলিনী'র সঙ্গে 'ছলিনি'-র মিল চমক লাগিয়ে দেয়, আর এক-একটি রূপক আমাদের স্তম্ভিত করে। 'সংবাদের আবর্জনা-ভিক্ষুক কুক্কুর'—স্পাইএর এর চেয়ে ভালো বর্ণনা আর কী হ'তে পারে?

অবশ্য সব চেয়ে বড়ো কথা গীতিকাব্যের মধুর আবহাওয়া—যা বাংলা সাহিত্যে এর আগে বলতে গেলে ছিলোই না। তরুণ হৃদয়ের প্রেমের কথা স্বভাবতই বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে, কিন্তু সে-কথাই সব নয়। ষোলো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'কবিকাহিনী', তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। তার শেষ সর্গে এমন অনেক কথা আছে যা মনে হয় আজকের এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীরই কথা, তা যেন ভবিষ্যৎবাণীর মতো শোনায়।

কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে,
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে মানব-মনে বিষ মিশাইয়া।
কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে …।
স্বাধীন, সে অধীনেরে দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু!
সবল, সে দুর্বলেরে পীড়িতে কেবল,
দুর্বল, বলের পদে আত্মবিসর্জিতে! …
সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন,
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙিয়া,
তবুও মানুষ বলি গর্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহংকার!
কত রক্তমাখা ছুরি হাসিছে হরষে,
কত জিহ্বা প্রণয়েরে ছিঁড়িছে বিঁধিছে! …
প্রেম? প্রেম কোথা হেথা এ অশান্তি মাঝে
প্রণয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া যেথায়
বিচরে ইন্দ্রিয়সেবা, প্রেম সেথা আছে?
প্রেমে পাপ বলে যারা, প্রেম তারা চিনে? …

আষাঢ়, ১৩৪৯

সেথা যদি প্রেম থাকে তবে কোথা নাই!
তবে প্রেম কলুষিত নরকেও আছে!
কেহ বা রতনময় কনকভবনে
ঘুমায়ে রয়েছে সুখে বিলাসের কোলে,
অথচ সুমুখ দিয়া দীন নিরালয়
পথে পথে করিতেছে ভিক্ষার সন্ধান!
সহস্র পীড়িতদের অভিশাপ লোয়ে
সহস্রের রক্তধারে ক্ষালিত আসনে
সমস্ত পৃথিবী রাজা করিছে শাসন ...।
এ-অশান্তি কবে, দেব, হবে দূরীভূত! ...
কবে দেব এ রজনী হবে অবসান? ...
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি!
নাইক দরিদ্র, ধনী, অধিপতি, প্রজা, ...
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস!

এ-সব কথা বিজ্ঞ ব্যক্তি হয়তো ভাবপ্রবণ বালকের হৃদয়োচ্ছ্বাস ব'লে উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু এর অন্তরালে যে-তীব্র বেদনাবোধ রয়েছে তা চিরকালের, এবং তার মূল্যও চিরকালের। এ-কথা বললে বোধ হয় অন্যায় হয় না যে মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমলে আপাতত রণহীন জগতে সুখে-শান্তিতে বসবাস ক'রে এ-সব কথা লেখায় শুধু কবিত্বশক্তির নয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যে-কথা যথাসময়ে প্রমাণিত হয়, কবির আবেগ-প্রবণ হৃদয়ে তা ধরা পড়ে অনেক আগেই—যদিও সে-সময়ে তা কবি-স্বপ্ন ব'লে উপহাসের বস্তুই হয়। কবিরা যে প্রফেট তার মানে তো এই।

'কবিকাহিনী'তে বৃদ্ধ কবির বর্ণনা আর-একটি ভবিষ্যৎবাণী:

বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি গম্ভীর মুরতি,
প্রশস্ত ললাটদেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হোত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃ-দেব!

ষোলো-বছরের রবীন্দ্রনাথের হাতে আঁকা আশি বছরের রবীন্দ্রনাথের ছবি।

'অচলিত সংগ্রহে'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'সমালোচনা' অংশের প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য—সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য 'মন্ত্রি অভিষেক', তাঁর প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ থেকে তাঁর শেষ রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট' কত দূরে!

দ্বিতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ও সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকগুলি এবং দুই খণ্ড 'সহজ শিক্ষা'ও সংগৃহীত হয়েছে। এ-বইগুলির সব ক'টি অচলিত নয়।

কিন্তু যেগুলি অচলিত, সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে যথোচিত চিত্রসজ্জাসমেত প্রকাশ করতে বিশ্বভারতীকে অনুরোধ করি, আমাদের বিদ্যার্থীদের তাতে মহৎ উপকার হবে।

বুদ্ধদেব বসু

সমালোচনা

Poems, Rabindranath Tagore. Visva-Bharati, Rs 2/8/-

এ-বইটি রবীন্দ্রনাথের নিজের করা ইংরেজি অনুবাদের সংগ্রহ। ইতিপূর্বে অন্য-কোনো গ্রন্থে এর কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়নি, হয়তো সাময়িক পত্রে হয়েছে। সব সুদ্ধ ১২২টি রচনা আছে, কালক্রম অনুসারে চার খণ্ডে ভাগ করা। শেষের ন'টি ছাড়া সবই কবির স্বকৃত অনুবাদ।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা পড়তে-পড়তে প্রথমেই যে-কথা মনে হয় তা এই যে এ যেন অনুবাদ নয়, নতুন সৃষ্টি। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে মুহূর্তেই ধরা পড়ে যে অনুবাদ বলতে যা বোঝায় তা তিনি কখনোই করেননি, রচনাগুলির জন্মান্তর ঘটিয়েছেন। এ যেন একই কবিতা দু'বার ক'রে লেখা, একবার বাংলায়, একবার ইংরেজিতে; বলবার কথাটা এক, এ ছাড়া মূলে ও অনুবাদে কখনো-কখনো সাদৃশ্য সামান্যই। বস্তুত, ইংরেজি কাব্য-সভায় একটি বিশিষ্ট আসনই রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য—তাঁর সমগ্র ইংরেজি রচনা একত্র করলে পরিমাণেও বড়ো কম হবে না—কিন্তু ইংরেজিভাষী জগতে তাঁর প্রাপ্য তিনি এখনো পাননি। এবং এই অবহেলার কারণ সম্পূর্ণই অসাহিত্যিক।

যা-ই হোক, রবীন্দ্রনাথের সমাদরের জন্য জগতের কাছে হাত পাতবার দরকার নেই। হয়তো একদিন ভারতের দিন আসবে, রবীন্দ্রনাথের দিন আসবে। সেই শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় আমরা স্বদেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের চর্চা যত বেশি ক'রে এবং যত ভালো ক'রে করতে পারি, তাঁর আন্তর্জাতিক অভ্যর্থনার ক্ষেত্র ততই প্রস্তুত হবে।

নিজের ভাষায় যিনি প্রতিভাবান স্রষ্টা, তিনি যদি কখনো বিদেশী ভাষায় রচনা করেন, তাহ'লে সেই ভাষায় নতুন একটি রস সঞ্চার তিনি না-ক'রেই পারেন না। রবীন্দ্রনাথও সেটা করেছেন। তাঁর ইংরেজি ইংরেজের ইংরেজি নয়। রোটেনস্টাইনকে লেখা একটি চিঠিতে শ্রীযুক্ত এডওআর্ড টমসন অবশ্য খুব সহজে বলেছেন, '...So far as the English influence on his work goes he (রবীন্দ্রনাথ) belongs to the Tennysonian age.'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনায় উনিশ শতকের কোনো ইংরেজ কবিরই কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না, এমনকি কোনো সময়ের কোনো ইংরেজের রচনার সঙ্গেই তাঁর রচনা কিছুমাত্র মেলে না। যদি মিল খুঁজে বেড়াতে হয় তাহ'লে হয়তো বাইবেলের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আবিষ্কার করা সম্ভব, কিন্তু আসলে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর রক্তের যোগ অনুসন্ধানের চেষ্টাই নিষ্ফল। কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নিজের খেয়ালে নিজের মনের মতো ক'রেই ইংরেজি লিখেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের কোনো বাঁধা আদর্শের সঙ্গে নিজের রচনাকে মেলাতে ভুলেও কখনো চেষ্টা করেননি; আর তাই তাঁর লেখা ইংরেজির একটি বিশিষ্ট স্বাদ, একটি অভিনব সূক্ষ্ম সৌরভ ইংরেজি সাহিত্যের যে-কোনো ছাত্র বইয়ের পাতা খুললেই অনুভব করেন।

রবীন্দ্রনাথের একটা মস্ত সুবিধে ছিলো এই যে আমাদের পাঁচজনের মতো তিনি ইংরেজশাসিত ভারতের স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করেননি। ইংরেজি তিনি একটু বেশি বয়েসেই শেখেন, এবং সে-ভাষার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় ম্যাকমিলানের কিংস্ রীডরের সাহায্যে নয়, ইংরেজি সাহিত্যেরই মধ্যস্থতায়। কিশোর বয়সে বিলেতে গিয়ে তিনি যে কিছুদিন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলেন, সেখানেই ইংরেজি সাহিত্যরসউপভোগে তাঁর দীক্ষা হয়। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সেই তাঁর প্রথম প্রীতির বন্ধনে কোনো ভেজাল ছিলো না। ভাগ্যক্রমে বাঙালি অধ্যাপকের ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো তাঁকে কখনো শুনতে হয়নি ব'লে শেক্সপিয়র টেনিসন ব্রাউনিং কখনো তাঁর কাছে নোট-কণ্টকিত বিভীষিকা হ'য়ে উঠতে পারেন নি। তরুণ বয়সে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যেটুকু খাদ্য তিনি পেয়েছিলেন তার সবটুকুই খাঁটি, আর তাঁর গ্রহণশক্তিও ছিলো অসামান্য, তাই সবটুকুই রক্তে গিয়ে মিশতে পেরেছিলো। তাঁর পরিণত রচনায় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রতি উল্লেখ বিরল, সাহিত্যসম্পর্কিত প্রবন্ধেও তাই, কিন্তু তাঁর প্রথম বয়সের নানা রচনা (যা সম্প্রতি 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র অচলিত সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে) পড়লে বোঝা যায় যে সমসাময়িক পাশ্চাত্য লেখকদের সঙ্গে যৌবনের সূচনা থেকেই তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিলো। পরীক্ষা পাশ করবার দায় ছিলো না, ডেপুটি হবার উচ্চাশাও পোষণ করতে হয়নি, তাই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটা অতিকায় সম্ভ্রমের গুরুভারে তাঁর চিত্তের স্বাভাবিক স্ফূর্তি কখনো নষ্ট হয়নি, যা আমাদের সকলেরই ছাত্রাবস্থায় হয়েছে এবং হচ্ছে। শুধু ছাত্রাবস্থা কেন, সমস্ত জীবনই হয়তো আমাদের এই মানসিক বন্দী-দশায় কাটতো যদি না রবীন্দ্রনাথ এ থেকে আমাদের মুক্তি দিতেন আমাদের আত্ম-সম্মানবোধ ফিরিয়ে এনে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছেলেবেলা থেকেই ইংরেজি সাহিত্যকে দেখেছেন নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে, আমাদের দারিদ্র্যের তুলনায় ওর

অবিশ্রান্ত ঐশ্বর্যে অভিভূত হ'য়ে পড়েননি, এবং ইংরেজি ভাষা তাঁর জীবিকার উপায় হ'তে পারেনি ব'লে সে-বিষয়েও তাঁর বিদেশীজনোচিত উদাসীন অনুরাগ ছিলো। তিনি ইংরেজি পড়েছেন, চর্চা করেছেন এবং উপভোগ করেছেন, কোনো ইংরেজ যেমন ফরাসি সাহিত্যের চর্চা করে; অর্থাৎ ইংরেজি তাঁর পক্ষে একটি বিদেশী ভাষাই ছিলো, রাজভাষা নয়। ইংরেজি ভাষার প্রতি দাসবৃত্তিতে আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর স্বাভাবিক প্রতিভার অনেকখানিই বিনষ্ট হয়, রবীন্দ্রনাথের বেলায় শুধু যে তা হয়নি তা না, উল্টোটা হয়েছিলো, অর্থাৎ তাঁর প্রতিভার বিকাশে ইংরেজি সাহিত্যের অনুপ্রেরণা তিনি সম্পূর্ণই ব্যবহার করতে পেরেছিলেন নিজের সহজ ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র হানি না ক'রে। এটা আমাদের পক্ষে অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। ইওরোপ থেকে নিতে গিয়ে যেটুকু লাভ করি দাম হয়তো তার বেশি দিয়ে ফেলি, শিল্পকলা শিখতে গিয়ে নিজেকেই ফেলি হারিয়ে। এ-দুর্ঘটনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মধুসূদন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংরেজির সম্পর্ক প্রথম থেকেই বন্ধুতার। তাই 'a' এবং 'the'-র দুর্ভেদ্য রহস্য নিয়ে তিনি কখনো উদ্‌ভ্রান্ত হননি, 'ভালো' ইংরেজি লেখবার চেষ্টা কখনো তাঁকে পীড়ন করেনি। ইংরেজি রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে বিদেশী নিজের সম্বন্ধে এই বিনয় এবং এই শ্রদ্ধা তাঁর শেষ পর্যন্ত ছিলো। তারই ফলে, পরিণত বয়সে যখন গীতাঞ্জলির অনুবাদ উপলক্ষ্যে প্রথম ইংরেজি রচনায় হাত দিলেন, তখন নেহাৎই ভালো ইংরেজি লিখলেন না, ইংরেজি ভাষার একটি নতুন রূপই আবিষ্কার করলেন। ছত্রে-ছত্রে জ্ব'লে উঠলো তাঁর প্রতিভার আভা।

অথচ ইংরেজি অনুবাদগুলি তিনি যে কত যত্ন নিয়ে করতেন, আলোচ্য **Poems** প'ড়েও তা বোঝা যায়। তিনি জানতেন ইংরেজি আর বাংলা দুই ভাষার ধাত আলাদা, তিনি জানতেন বাংলা স্বভাবতই অলঙ্কৃত আর ইংরেজি ভূষণবিরল, তার উপরেও তাঁর বাংলা রচনায় বাণীর সমারোহ— এই দুই বিপরীতকে মেলানো সহজ নয়। তাই ইংরেজিতে তিনি রচনাটিকে একেবারেই নতুন ক'রে ঢালতেন, উড়ে যেতো কত উৎকৃষ্ট উপমা, কত আশ্চর্য পংক্তি, এমনকি স্তবককে স্তবক ছেঁটে ফেলতেও তাঁর কুণ্ঠা হয়নি। এ-নির্মমতা ছিলো ব'লেই তাঁর ইংরেজি রচনা সার্থক হ'তে পেরেছে। এবং সব চেয়ে সার্থক হয়েছে স্বল্পভাষী ক্ষুদ্র লিরিকের, অর্থাৎ গানের ক্ষেত্রে। ওর মধ্যেও যেগুলির প্রধান নির্ভর ভাষার ঝঙ্কার, যেমন 'দেশদেশ নন্দিত করি' কিংবা 'জনগণমন-অধিনায়ক' তার অনুবাদ আমাদের তৃপ্তি দেয় না; রূপকের পর রূপকে গাঁথা চিত্ররূপময় কবিতা, যেমন 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে', তাও অনুবাদে বড়ো ফিকে হ'য়ে আসে, কিন্তু যেখানে বলবার

কথাটি ছোটো অথচ গভীর সেখানে অনুবাদ হঠাৎ-খাপ-থেকে-খোলা তলোয়ারের মতো জ্ব'লে ওঠে—কখনো-কখনো এমনও মনে হয় যে অনুবাদ যেন মূলের চেয়েও ভালো। Poems-এর ৪৭নং কবিতা ধরা যাক। এটির মূল 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে,' কিন্তু ব'লে না দিলে চেনা শক্ত। মূল কবিতাটি ১০০ লাইনের, অনুবাদে—যদি একে অনুবাদ বলা যায়—আছে ঠিক দশটি বাক্য। দুয়ের পারম্পর্যেও মিল নেই; মূল থেকে কয়েকটি লাইন বেছে নিয়ে তিনি নতুন একটি কবিতা সাজিয়েছেন। উপায়টা যা-ই হোক, ফল হয়েছে আশ্চর্য। কয়েকটি লাইন তুলনা করা যাক :

মূল :

আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়
আনন্দ আছে নিখিলে।...
ধূলা সাথে আমি ধূলা হ'য়ে রব
সে গৌরবের চরণে।
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল
তাঁর পূজারতি বরণে।
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন-তরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি
ধন্য এ মোর ধরণী।

অনুবাদ :

There is love in each speck of earth and joy in the spread
of the sky.
I care not if I become dust, for the dust is touched by
his feet.
I care not if I become a flower, for the flower he
takes up in his hand.
He is in the sea, on the shore; he is with the ship that
carries all.
Whatever I am I am blessed and blessed is this earth
of dear dust.

এখানে মূলের চেয়ে অনুবাদ অনেক বেশি সংহত ও গভীর তা বোধ হয় মানতে দোষ নেই। রবীন্দ্রনাথের নির্বাচনের ক্ষমতাও লক্ষ্য করতে হয়, অত বড়ো কবিতার মধ্যে ঠিক কোন-কোন পংক্তি ইংরেজিতে ভালো আসবে তা তিনি তাঁর নিখুঁত শিল্পবোধ দিয়ে ঠিক বুঝেছিলেন। উদ্ধৃত অংশের চেয়ে ভালো (ও বেশি বিখ্যাত) লাইন মূল বাংলা কবিতাটিতে আছে, কিন্তু

ইংরেজিতে সেগুলো হয়তো নেতিয়ে পড়তো। এদিকে এ-পংক্তি ক'টি ইংরেজিতে মূলকেও প্রায় ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এই মাত্রাজ্ঞানে, ভাষা ও বিষয়ের এই সুমিত সংগতিতে রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ অনুবাদই উজ্জ্বল। যেখানে অনুবাদ সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না, সেখানে, বলা যেতে পারে, মূল কবিতাটিই অননুবাদ্য। বর্ণনাবহুল বা ধ্বনিনির্ভর রচনা স্বভাবতই অনুবাদের অনুপযোগী, বিদেশী ভাষায় তা বসাতে হ'লে অন্যরকম কলাকৌশল দরকার, যা প্রয়োগ করা মূল লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। বলতে গেলে, যে-কোনো কবিতারই অনুবাদ অত্যন্ত দুরূহ, কারো-কারো মতে অসম্ভব, আর এও সত্য যে শুধু অনুবাদ প'ড়ে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশালতা কিংবা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোনো ধারণাই হয় না। তবু, পৃথিবীতে যখন অনেকগুলি ভাষা আছে তখন অনুবাদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, যতদিন জগতে সাহিত্য সৃষ্ট হবে, অনুবাদককেও বরখাস্ত করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য অনুবাদক বললে ভুল হয়, নিজের (কিংবা অপরের) রচনা তিনি যখনই ভাষান্তরিত করেছেন, কাজটি অনুবাদকের মতো করেননি, স্রষ্টার মতোই করেছেন। তাঁর ইংরেজি অনুবাদগুলিও তাঁর বহুবিধ সৃষ্টিরই অন্যতম। নিজের কিছু-কিছু রচনা তিনি যে এমন একটি ভাষায় পুনরায় সৃষ্টি ক'রে গেছেন, যা আজকের দিনে অর্ধাধিক পৃথিবীতে প্রচলিত, এর জন্য সমস্ত জগৎই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কালক্রমে তাঁর অন্যান্য রচনাও ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হবে নিশ্চয়ই, হয়তো খুব ভালো-ভালো অনুবাদও বেরোবে, কিন্তু তাঁর স্বাক্ষরবাহী এই ইংরেজি কাব্যগুচ্ছের জ্যোতি কোনোদিনই ম্লান হবে না।

Poems-এর শেষ ন'টি কবিতা অনুবাদ করেছেন অমিয় চক্রবর্তী। এর মধ্যে তিনটি 'আরোগ্য'র ও ছ'টি 'শেষ লেখা'র। 'সমুখে শান্তি পারাবার' 'তোমার সৃষ্টির পথ' 'দুঃখের আঁধার রাত্রি,' এ-সব রচনার অনুবাদ অমিয়বাবু যথেষ্ট সাহস ও শক্তির সঙ্গেই করেছেন, 'রূপনারাণের কূলে,' 'প্রথম দিনের সূর্য' আর শূন্যচৌকির বুক-ফাটা কবিতাটিও বাদ দেননি। নিজের রচনা সম্বন্ধে কবির যে-স্বাধীনতা ছিলো অন্য কারো অবশ্যই তা নেই, যথাসম্ভব আক্ষরিক ও নির্ভুল অনুবাদই ছিলো অমিয়বাবুর লক্ষ্য, এবং যে-সততা ও স্বচ্ছতার সহিত এ-কঠোর কাজটি তিনি সমাপন করেছেন, তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয়, বিশেষ ক'রে যখন ভাবি যে এই শেষের দিককার রচনাগুলির কোনো-কোনোটি কবির দুরূহতম রচনার মধ্যে পড়ে।

পরিশেষে একটি প্রশ্ন। 'Notes' অংশে বইয়ের চতুর্থ খণ্ডের সবগুলি কবিতাই ('রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ও 'শেষ লেখা'র অন্তর্গত) শ্রী ভর্মে রচিত ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ঐ কবিতাগুলি তো স্পষ্টতই গদ্যে,

বেশির ভাগই সমিল এবং সর্বত্রই নিয়মিত পদ্যে, তাকে ফ্রী ভর্স বলবার সার্থকতা কী? এ-সব কবিতা ফ্রী ভর্স হ'লে তো 'বলাকা' কিংবা 'পলাতকা'ও ফ্রী ভর্স। আমার মতে, ফ্রী ভর্স বলতে ঠিক যা বোঝায় রবীন্দ্রনাথ তা কখনোই লেখেননি, হয় রীতিমতো পদ্যে নয় রীতিমতো গদ্যে কবিতা রচনা করেছেন। পদ্য কখনো ধ্বনিতে ও চরিত্রে গদ্যের খুব কাছাকাছি এসেছে (যেমন 'পরিশেষে'), কিন্তু ছন্দের বন্ধন সর্বদাই অটুট। আমার ধারণা এই যে, ফ্রী ভর্স, যাতে নিয়মিত ছন্দের শাসন নেই, অথচ rhythm-এর স্পষ্টতার জন্য রীতিমতো গদ্যও যা নয়, তা রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থেই নেই, যদি না 'লিপিকা'র কোনো-কোনো রচনাকে সে-শ্রেণীতে ফেলা যায়।

বুদ্ধদেব বসু

শিবির—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কবিতা ভবন, কলকাতা। পৌষ, ১৩৪৮। ৭১পৃ। ১॥০ টাকা।

নববসন্ত—আবুল হোসেন। বুলবুল হাউস, কলিকাতা। আশ্বিন, ১৩৪৭। ৪৮পৃ। ১॥০ টাকা।

শকুন্তলার স্বপ্ন—জোতির্ময়ী রায়চৌধুরী। কবিতা ভবন, কলিকাতা। পৌষ, ১৩৪৮। ৩৬পৃ। ১৲ টাকা।

স্নায়ু—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। কবিতা ভবন, কলিকাতা। আশ্বিন, ১৩৪৮। ৩২পৃ। ১৲ টাকা।

দক্ষিণায়ন—বিমলচন্দ্র ঘোষ। কবিতা ভবন, কলিকাতা। বৈশাখ, ১৩৪৮। ৮৭পৃ। ১॥০ টাকা।

শ্রাবণ—বীরেন্দ্র মল্লিক। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা। আশ্বিন, ১৩৪৮। ৩৭পৃ। ১৲ টাকা।

কিছুদিন আগে ১৯৪০ খ্রীষ্ট-বৎসরে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে রচিত হিন্দী বইয়ের একটা সংখ্যাগণনা করা হ'য়েছিল। তা'তে দেখা যায়, এক বছরে যত বই বেরিয়েছিল তার ভেতর কবিতার বই'র সংখ্যা সব চেয়ে বেশী, মননশীল সাহিত্যের কথা দূরে থাক্, গল্প উপন্যাসের বইয়ের সংখ্যাও বহুদূর ছাড়িয়ে গিয়েছিল কবিতার বইয়ের সংখ্যা। এ রকম একটা সংখ্যাগণনা বাঙ্‌লা বই সম্বন্ধে করে দেখলে মন্দ হয় না, সামাজিক মন বুঝবার কিছু সাহায্য তা'তে

হ'তে পারে। তবে সংখ্যাগণনা না করেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাঙ্‌লা সাহিত্যেও হিন্দী সাহিত্যের অনুরূপ সংবাদ ধরা পড়বে। প্রশ্ন জাগে মনে, কবিতার বইয়ের এই প্রাচুর্যের সামাজিক কারণটা কি; এটা কি কালগত, না জাতিগত, না কোনো সমসাময়িক সমাজ-সমস্যা গত? অথচ, বছরখানেক আগে ব্রিটীশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন থেকে ১৯৩৫-৪০ এই পাঁচ বছরের প্রকাশিত বইয়ের যে বিশ্লেষণ বেরিয়েছিল, তাতে দেখা যায়, ইতিহাস ও অর্থনীতির বই কবিতাকে ত বটেই, গল্প-উপন্যাকেও অতিক্রম করেছে। এর তুলনামূলক কারণটা জান্‌বার ঔৎসুক্য হওয়া খুব স্বাভাবিক। আমরা যারা নিছক পাঠক, নিদেনপক্ষে সমালোচক, তাদের ভেতর থেকে নানারকম উত্তর শোনা যাবে, কিন্তু কবি ও গল্প-উপন্যাস লেখকেরা নিজেরা কি মনে করেন সেটা একবার জান্‌তে পারলে মন্দ হয় না।

একসঙ্গে এই ছ'খানা বই হাতে নিয়ে যে-কথাটা প্রথমেই মনে হ'লো, ধান ভান্‌তে শিবের গীতের মতন শুনালেও তা না বলে পারলুম না। কারণ, আমি মনে করি, এ-জিনিস ভাব্‌বার প্রয়োজন আছে—এমন কি কবিদেরও।

কবিতার বই রেখে রেখে একটু একটু করে পড়তে ভাল লাগে; একসঙ্গে পড়লে ঠিক উপভোগ করা যায় না, অবশ্যি উপভোগ্য বস্তু যদি কিছু থাকে। এ-বই ক'খানিও তেমন করেই পড়তে চেষ্টা করলুম। সব কবিতাই যে আমার ব্যক্তিগত রসবোধ পরিতৃপ্ত করেছে, একথা বল্‌তে পারিনে; তবে, একটা কথা মোটামুটিভাবে নিঃসংশয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের বিপুল উত্তরাধিকারের ফলে সমসাময়িক বাঙ্‌লা কবিতা শব্দসম্পদে ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতায়, ছন্দ-বৈচিত্র্য ও কল্পনার অবাধ লীলায় এমন একটা স্তর স্পর্শ করেছে যখন খুব খারাপ, নেহাৎ পদ্য মাফিক কবিতা লেখা আর বুঝি সম্ভব নয়। রসোত্তীর্ণ, সার্থক উঁচুদরের কবিতা হয়ত সচরাচর চোখে পড়ে না, কিন্তু মোটামুটি ভাল কবিতা অনেকেই লেখেন। এটা কিন্তু খুব তুচ্ছ কথা নয়। এবং একথা এই ছ'খানি বই'র লেখকদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই বলা চলে।

আর একটা জিনিসও খুব চোখে পড়ে। সেটা হ'চ্ছে এই যে, বিভিন্ন উপাদান, বিভিন্ন আঙ্গিক, কথাবস্তুর নানা পার্থক্য সত্ত্বেও, ছ'জন কবির সকলেরই মনের আকাশ রোম্যান্টিক। কামাক্ষীপ্রসাদের মনও রোম্যান্টিক, জ্যোতির্ময়ী দেবীরও। কোনো কবিতায় এই রোম্যান্টিক দৃষ্টি স্মৃতি-নির্ভর, কোথাও কল্পনা-নির্ভর, কোথাও স্বচ্ছ, কোথাও ঘোলাটে, কোথাও ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঁধা, কোথাও বা স্বপ্নাকাশে নিরঙ্কুশ বিচরণ। কিন্তু রোম্যান্টিক হওয়া তো কিছু নিন্দের কথা নয়; এ তো বস্তুকে দেখ্‌বার একটা ভঙ্গী মাত্র। আর আজকের এই বাঙ্‌লা দেশে যে সমাজ-বিন্যাসের মধ্যে এবং সমাজের যে-স্তরে যে-আব্‌হাওয়ার মধ্যে আমাদের বাস, সেখানে

রোম্যান্টিক হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। অপরাধ হ'চ্ছে মনন ও কল্পনার ছদ্মবেশ; সেই ছদ্মবেশের কিছু কিছু পরিচয় আলোচ্য বইগুলির কোনো কোনো কবিতায় পাওয়া যায়, কোথাও সূক্ষ্ম আবরণে গোপন, কোথাও স্থূলতায় স্বপ্রকাশ। বস্তুকে বস্তুর স্বধর্মে দেখবার, কল্পনা ও অনুভব করবার প্রত্যয় যার জন্মায়নি, তেমন কবির পক্ষে রিয়ালিস্ট হ'বার মিথ্যা নিরর্থক প্রয়াস করার চেয়ে সোজাসুজি রোম্যান্টিক হওয়া একশ'বার কাম্য। 'ভাবের ঘরে চুরি করা চলে না' একথা শুধু ধর্মসাধনায় নয়, কাব্যসাধনায়ও সত্য।

কামাক্ষীপ্রসাদ তাঁর 'শিবির'-এ সে-চেষ্টা করেন নি, এই জন্যে তাঁর কতকগুলি কবিতা আমার ভাল লেগেছে। 'শিবির' তাঁর কবি খ্যাতিকে দৃঢ়তর করবে কিনা জানিনে, তবে শিথিল করবে না, এ কথা বলা যায়। সবচেয়ে আমার ভাল লেগেছে তাঁর অনুভূতির তীব্রতা; স্পর্শালু যে তাঁর মন এটা ধরা পড়ে অতি সূক্ষ্ম অস্পষ্ট আব্‌ছা আলোর মূর্তি-কল্পনার মধ্যে। তাঁর ভাব-কল্পনাও সবল, এবং উপমা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে ও স্থান-যথার্থতায় সার্থক। এই সব ক'টি উক্তিরই উদাহরণ সংগ্রহ করা কঠিন নয়, কিন্তু তার স্থানাভাব। 'মৈনাক' ও 'শিবির'-এ আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করলুম; সে'টি হ'চ্ছে এই যে কামাক্ষীপ্রসাদ ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে একটু সজ্ঞান চেষ্টা করেছেন। ঐতিহ্যবাদী আমার কাছে এটা ভাল লেগেছে। ছন্দে ও প্রকাশভঙ্গীতে কৃতিত্বের পরিচয় তিনি আগেও দিয়েছেন, 'শিবিরের' কবিতাগুলিতে এ-পরিচয়ের অভাব নেই। তাঁর কবিতা স্বল্পবাক্: বহু বর্ণনায় বা কল্পনার দায়িত্বহীন বিস্তারে অথবা রূপচিত্র রচনায় বর্ণবাহুল্যে তিনি তাঁর কবিতাকে ভারাক্রান্ত করেন না। এ গুণটি উল্লেখ করবার মতন। খারাপ লেগেছে, কোনো কোনো জায়গায় অনুপ্রাস মোহের দাসত্ব ও শিথিল বিশেষণের ব্যবহার। তার চেয়েও যা' আমার কাছে আপত্তিকর সেটা হচ্ছে সাম্প্রতিক ইংরাজী কবিতার কিছু কিছু উদ্ভট ম্যানারিজমের অনুকৃতি। যাঁর ভেতর কবি-প্রেরণা আছে তিনি কেন পরের অভিভবের অধীন হতে যাবেন? কামাক্ষী-প্রাসাদের মননাভ্যাস একটু বাড়লে তাঁর কাব্য ভাবগভীর হ'বে বলে' আমার ধারণা; এর অভাব আমার মতন পাঠক যাঁরা আছেন তাঁদের অতৃপ্ত রাখে বই কি! তবু 'শিবির' যা তৃপ্তিদান করেছে তার জন্যে রচয়িতাকে ধন্যবাদ।

তুলনায় আবুল হোসেনের 'নব বসন্তে'র কবিতা বহুবাক্ বলা চলে; তাঁর বক্তব্য সবটাই পরিস্ফুট এবং ভাবদৃষ্টির সাহায্যে যতটুকু দেখেছেন ততটুকু সবটা বলে না ফেলে তিনি ক্ষান্ত হননি'। ভাবের ব্যঞ্জনাও দু'চারিটি কবিতায় আছে; কিন্তু তাদের সংখ্যা কম। আবুল হোসেনও

রোম্যান্টিক এবং অনেকের মত তাঁর কবিতারও অবসর-পুষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের পরিচয় পরিষ্কার। তবু তাঁর কয়েকটি কবিতা পড়ে মন তৃপ্ত হ'লো; তাঁর রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর বলিষ্ঠতা প্রশংসনীয়। তিনিও আত্মাকেন্দ্রিক, কিন্তু তাঁর এই আত্মকেন্দ্রিকতা মেরুদণ্ডহীন ভাবালুতা নয়। শব্দের ধ্বনি সম্বন্ধে তিনি সচেতন, তাঁর বাক্‌ভঙ্গী বলিষ্ঠ ও সরল, দৃষ্টি গভীর এবং কল্পনাসমৃদ্ধ না হলেও স্বল্প পরিসরের মধ্যে স্বচ্ছ। আরো ভাল লাগ্‌লো জীবন-সম্ভাবনায় তাঁর বিশ্বাস; 'সিনিসিজম' মনের ও কাব্যের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। কিন্তু হোসেন সাহেব তাঁর অপরিণত কবিতাগুলো ছাপ্‌লেন কেন? কয়েকটি কবিতা এত দুর্বল ও শিথিল যে হঠাৎ তাঁর কবিশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ ধরিয়ে দেয়। এগুলো ছেড়ে তিনি তাঁর নিজের প্রতি একটু অন্যায় করেছেন।

জ্যোতির্ময়ী রায়চৌধুরীর 'শকুন্তলার স্বপ্ন' আগাগোড়াই রবীন্দ্র-প্রতিভাদীপ্ত তাঁর শব্দসম্ভার এবং শব্দবয়ন দুইই রবীন্দ্র-কাব্যভাণ্ডার থেকে আহৃত, এমন কি তাঁর ভাবকল্পনার ভঙ্গীও। রবীন্দ্র-ছন্দও তিনি প্রশংসনীয় চাতুর্যে আয়ত্ত করেছেন। নিজস্ব বক্তব্য তাঁর আছে, কিন্তু এখনও তা' বৃহত্তর কবিপ্রতিভায় আচ্ছন্ন। তিনি সূর্যকবির বন্দনা করেছেন; তার আলোকচ্ছটায় যেদিন এই আচ্ছন্নতা কেটে যাবে, সেদিন তাঁর কবিপ্রেরণা মুক্তি পাবে বলে আশা করি। উপাদান প্রস্তুত আছে, বেদীও তৈরী, দেবতার পদধ্বনিও শোনা যাচ্ছে, তিনি এখনও এসে আসন গ্রহণ করেননি।

'আয়ু' কবি মঙ্গলাচরণের মনে আধুনিক কালের ছোঁয়াচ সুস্পষ্ট। কিন্তু তার কিছুটা ছদ্মবেশ, কিছুটা ভিন্‌দেশীয় কাব্যিক মুদ্রাদোষের অনুকৃতি। হয়ত তিনি তা' কাটিয়ে উঠ্‌তে পারবেন, যদি তিনি আমাদের ঐতিহ্যবস্তু এবং সমসাময়িক সমাজবস্তুর নিবিড়তর বৈজ্ঞানিক পরিচয় গ্রহণে কুণ্ঠিত না হ'ন। যে-সব বিশেষ শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গীকে তিনি বারবার ব্যবহার করে একটা মোহের পরিচয় দিয়েছেন তাও তাঁর কাটিয়ে ওঠা দরকার। মঙ্গলাচরণের অনেকগুলি কবিতাই এ দোষদুষ্ট, এবং ভাব-কল্পনার দৃষ্টিও সর্বত্র স্বচ্ছ নয়। আধুনিক কাব্যের বাহ্যলক্ষণ সম্বন্ধে তিনি সচেতন, কিন্তু আধুনিকতা ত বাহ্য লক্ষণের মধ্যে নেই, সে ত মনে। শেষের দিকে 'আয়ু' পর্যায়ের কবিতাগুলিতে সেই আধুনিক মনের কিছু সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়; সেখানে ছদ্মবেশ অনেকটা খসে পড়ে' গেছে, এবং অপরের মুদ্রাদোষ ও বাকৃভঙ্গি অনেক কম।

বিমলবাবুর 'দক্ষিণায়নে' এই আধুনিক মনের সার্থক কাব্যময় প্রকাশ দেখে মনে খুসী হ'লো। তাঁর কবিতা এই প্রথম পড়লুম, মনে হ'লো আগে পড়িনি' কেন? অথবা পড়েও হয়ত থাকবো সাময়িক পত্রের

পাতায়, কিন্তু দু'টি একটি কবিতা খাপছাড়া ভাবে পড়ে' কবির মনের ছবিটি ধরতে পারিনি' বলে তা' হয়ত আর মনে নেই। এখন সবগুলি কবিতা একত্র পড়ে' তাঁর মনের ছবিটা সুস্পষ্ট হ'লো। বিমলবাবুর কবিপ্রেরণা সত্য ও সার্থক; ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ তার নিবিড়, তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ ও অনুভূতি গভীর, সর্বোপরি তিনি নিজের সঙ্গে কোথাও ছলনা করেন না। তাঁর বাক্‌ভঙ্গী জোরালো, শব্দের ধ্বনি সম্বন্ধে তিনি সচেতন, এবং শব্দ ও কল্পনাচিত্রের ভাণ্ডার সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা, পুরাণ-ঐতিহ্য দ্বারা সমৃদ্ধ। ভাল কথা, বিমলবাবু কি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র? হোন বা না হোন্, তাঁর রচনায় ঐ সাহিত্যের স্পর্শ সুস্পষ্ট, এবং আমার বলতে দ্বিধা নেই, সে-সাহিত্যপাঠ তাঁর সার্থক হ'য়েছে। নানা রকমের ছন্দও তাঁর আয়ত্তে, মুদ্রাদোষও তাঁর নেই বল্‌লেই চলে। আর, প্রাক্তন কবিদের যে-দীপ্তি তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে ধরা পড়ে তা' অনুকৃতি নয়, তিনি তাকে নিজস্ব দীপ্তি দ্বারা শোধন করে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। আধুনিক কাল সম্বন্ধে তিনি সচেতন, তাঁর কবিমানসও সেই অনুযায়ী, কিন্তু কোথাও আধুনিকপনার চিহ্ন পড়েনি' তাঁর কবিতায়। 'দক্ষিণায়ন' পড়ে যথার্থ তৃপ্তি পাওয়া গেল; বিমলবাবুর কবিপ্রতিভা অনস্বীকার্য।

'শ্রাবণে' বীরেন্দ্রবাবু যে ক'টি কবিতা একত্র করেছেন তার প্রত্যেকটির গোড়ায় রচনার উপলক্ষ্যটি পাইকা অক্ষরে ব্র্যাকেটের ভেতর ছেপে দিয়েছেন। এর সার্থকতা কি বুঝ্‌লুম না। অন্ততঃ আমার কাছে তা স্পষ্ট নয়। অধিকাংশ কবিতাই আত্মবিলাসী প্রেমের বিচিত্র অনুভূতির সহজ প্রকাশ; বাক্‌ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য যে খুব আছে বলা যায় না। তবে ছলনাহীন আবেগে বলা হ'য়েছে বলে একটা মাধুর্য সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। প্রথম রচনা বলে কথার বর্ণমোহে লেখকের আস্থা একটু বেশী বলে মনে হয়। কয়েকটি সার্থক ও সুন্দর কবিতা আছে, যেমন, 'উপেক্ষা,' জেলো না আলো'; কিন্তু দুইই নিছক আত্মবিলাস।

নীহাররঞ্জন রায়

কবিতার প্রকৃতি—শ্রীনবেন্দু বসু। ভারতী ভবন, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম দু'টাকা।

নবেন্দুবাবুর কবিতা-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি যখন 'বিচিত্রা' ও 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তখন থেকেই রসজ্ঞ পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। আশা করেছিলাম সেগুলি শীঘ্রই গ্রন্থাকারে সমগ্রতা পাবে। অনেকদিন পূর্ব্বেই এ বই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য,

ইতিমধ্যে যে দু'একখানি বই কাব্যতত্ত্বের ওপর লিখিত হয়েছে তাদের সঙ্গে নবেন্দুবাবুর বই-এর কোনো মিল নেই। তার প্রথম কারণ নবেন্দু-বাবুর দৃষ্টিভঙ্গী তো পৃথক্ বটেই, তাঁর মনের গড়ন আলাদা। বইখানি আদ্যন্ত পড়ে' দুটি কথা স্বতই মনে হয়। নবেন্দুবাবুর মন তত্ত্বদর্শী নয়, অথচ তাঁর পদ্ধতি বিশ্লেষণ-মূলক। আর দ্বিতীয়ত, তাঁর লেখায় এমন একটি প্রসন্নতা আছে, যা সংক্রামক। অর্থাৎ নবেন্দুবাবু যে শান্ত ও সংযত মনে কাব্যরসের ব্যাখ্যা করেছেন, পাঠকের মনেও সেই রসোপলব্ধি জাগে, অন্তত যে-প্রশান্তির ফলে কাব্যবোধের জন্ম হয়, তার স্পর্শ একটি জাগ্রত হাওয়া বইয়ে দেয়।

নবেন্দুবাবু কবিতার সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করেছেন একটি নিজস্ব রীতিতে। কিন্তু তাতে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অথবা দার্শনিকতার জটিল আভাস সেই। যেটুকু এসে গেছে সেটা নৈর্ব্যক্তিক উপভোগের ও বিচারের আনুষঙ্গিক। তাঁর মননশীলতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় এ বইয়ের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে কিন্তু তাদের সংশ্লিষ্ট আসন নিতান্তই সহ-জ, জুড়ে বসেনি। দর্শন ও অলঙ্কার-বিচারের কূটতা এড়িয়ে মধ্যপথ অবলম্বন করে' এমন একখানি নিষ্কণ্টক উপভোগ্য সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

নবেন্দুবাবুর পদ্ধতিটা এই। একটি বিশেষ কবিতা বা কবিতার অংশকে নিয়ে তিনি পাঠকের সঙ্গে খানিকটা সমবেতভাবে অথচ স্বগত আলোচনা করেছেন। এবং সেই আলোচনা বিশদ হতে গেলে অর্থপূর্ণ পঙ্‌ক্তি ও পদের সুনিপুণ বিশ্লেষণ করা দরকার। আবার এই আলোচনা থেকে তিনি কয়েকটি প্রতিপাদ্য বক্তব্যে এসে পৌঁছেচেন যেগুলি কবিতার আকৃতি নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর পদ্ধতি বিশ্লেষণমূলক এবং তা তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। উদ্দেশ্য রস ও বিচারের সমন্বয়ে কবিতার স্বাদগ্রহণ। নবেন্দুবাবুর সাবধানতা ও সংযম প্রশংসার বস্তু। আর একটু অসাবধান হলে তাঁর রচনা কাব্যের জ্যামিতিকী হতে পারতো অথবা কাব্য সাহিত্যের কয়েকটি মূল তত্ত্বের আধা-বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে দুষ্ট হবার আশঙ্কা ছিল। অতিরিক্ত বিশ্লেষণে হয়তো কবির আঙ্গিক-বিচার করা সম্ভব কিন্তু রসোত্তীর্ণ কাব্যের স্বরূপ পুরোপুরি ধরা যায় না। যেখানে শিল্পী সচেতন সেখানে পূর্বোক্ত পদ্ধতি সম্ভব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কল্পনার আগুনে ভিন্নমুখী চিন্তাধারার মধ্যস্থতায় একটা অখণ্ড সত্যের আকস্মিক রূপ ঝলসে ওঠে। সেখানে চুলচেরা আলোচনা শব-ব্যবচ্ছেদের নামান্তর। কীট্‌সের 'নাইটিংগেল' পড়তে গেলে কবির চিত্রকল্পের বিন্যাস, শব্দ যোজনা, কবিতার ভাষা, এ সবের বিচার প্রাসঙ্গিক। পূর্ণতর স্বাদ বা আনন্দ-উপভোগের জন্যে তাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু তার বেশি দূর গেলে পাখীটির অস্তিত্ব ও তার সঙ্গীতের ব্যঞ্জকতা ভুলতে হয়, অন্তত কবিতাটির ভাবকেন্দ্র থেকে অনেক

ঘুরে সরে যেতে হয়। নবেন্দুবাবু এই আত্মঘাতী বিশ্লেষণ করেননি। তথ্যকে তিনি গ্রহণ করেছেন বিচারের মশলা হিসেবে, কিন্তু পাঠকের ও লেখকের যে চিত্তস্পর্শের ফলে সৌন্দর্য্য-আবিষ্কার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, সে খেয়াল তাঁর আছে। কবিতার বিচারে তিনি বিচার্য্যকে অযথা প্রাধান্য দিয়ে বিচারক পাঠকের বুদ্ধির ওপরে অবিচার করেন নি।

বইখানি ভালো করে পড়া দরকার এবং একাধিকবার। নইলে এই অনাড়ম্বর যুক্তিপূর্ণ প্র-বন্ধ কেমন করে কাব্য-বন্ধের গ্রন্থি-উন্মোচন করে' ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব-প্রতিপাদনের চেয়ে বড় কবিতার নিগূঢ় রূপটিকে প্রথম বোঝার আনন্দে রূপান্বিত করতে পেরেছে তা সম্পূর্ণ ধরা যায় না। নবেন্দুবাবুর রীতিতে বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের ফলে কাব্যের সমগ্রতা ধরা দিয়েছে। এর জন্যে দায়ী তাঁর অন্তর্নিবিষ্ট মনের সততা এবং বোঝবার ও বোঝাবার আন্তরিক প্রচেষ্টা। কাব্যের বিকাশ অনুসন্ধানে তিনি ব্যক্তিত্ব ও বাস্তবিক সত্যকে অবহেলা করেন নি।

'কবিতার প্রকৃতি'তে অনেকগুলি খণ্ড পরিচ্ছেদ আছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সার্থকতা অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, "ভাব, রস ও রূপ", "অর্থালঙ্কার" ও "কবিতার ভাষা" সব চেয়ে বেশি উপভোগ করেছি। "ছন্দ" পরিচ্ছেদটি বেশ নতুন মনোভাব নিয়ে লেখা, কারণ নবেন্দু-বাবু এখানে ছন্দকে যান্ত্রিক শৃঙ্খলা হিসেবে শুধু গ্রহণ না করে তাকে ভাবের ঐক্যসৃষ্টির সহায়ক এবং ছন্দের দোলাকে অনুভূতির নির্দেশক বলেই গ্রহণ করেছেন। ফলে, গদ্য কবিতা ও কবিত্বময় গদ্যের বিচার এই অধ্যায়টিতে নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত স্থান পেয়েছে। শেষ অধ্যায়ে কবিতার প্রকারভেদ সম্বন্ধে সব পাঠক লেখকের সিদ্ধান্ত মেনে না নিতে পারেন কিন্তু এর সরসতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

নবেন্দুবাবু যে সূক্ষ্ম মন ও রসবোধের পরিচয় দিলেন এই স্বতন্ত্র ও নতুন ধরনের বইখানিতে, তাতে তিনি সাহিত্যামোদীর ধন্যবাদের পাত্র। আমরা আশা করতে পারি এ ধরনের আর একখানি বই তিনি লিখবেন 'কবিতার আকৃতি' নিয়ে। অবশ্য কবিতার অর্থ আর গড়নের সুগভীর সম্বন্ধ আছে, যার সার্থক মিলনে কবিতার জন্ম। কিন্তু সেই জন্মের পিছনে যে 'কারুকৃৎ'-এর পরীক্ষা আছে তার একটি পরিচিতি দরকার। এই আঙ্গিকের সৌষ্ঠব আর গঠনভঙ্গীর ব্যাখ্যায় তিনি যদি আধুনিক কবিদের রচনা নিয়ে আলোচনা করেন, তাহ'লে সেটি শুধু সময়োপযোগী নয়— একটা স্থায়ী ও মূল্যবান কাজ হবে। দীক্ষিত মনের দ্বারাই মাত্র সদ্বিচার সম্ভব।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আষাঢ়, ১৩৪৯

মাইকেল মধুসূদন: জীবনী-ভাষ্য। প্রমথনাথ বিশী। দুই টাকা

মধুসূদন সম্প্রতি আধুনিক লেখকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। কিছুদিন আগে শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি প'ড়ে আনন্দিত হয়েছিলাম, এবারে প্রমথবাবু 'মাইকেল মধুসূদন' নিয়ে উপস্থিত। এ-বইটিকে তিনি তিনি ঠিক জীবনী না-ব'লে জীবনী-ভাষ্য বলেছেন; পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত এ নয়, কিন্তু জীবনচরিতের উপাদান অনেকখানি রয়েছে। মধুসূদনের জীবনের মূল ঘটনাগুলি নিয়ে বিশী মহাশয় নিপুণ হাতে মালা গেঁথেছেন, তথ্যের দিক থেকে ভারি ওজনের না-হ'লেও বইটির শিল্পগত পূর্ণতা আছে, এবং আমার মতে সেটাই প্রধান। বইটির আগাগোড়াই আমি উপভোগ করেছি, এবং শেষ পরিচ্ছেদে মধুসূদনের মৃত্যুর ছবিটি ঈষৎ এলোমেলো হ'লেও সুন্দর ফুটেছে।

প্রমথবাবুর মূল উদ্দেশ্য ছিলো মধুসূদনের চরিত্ররূপ ফোটানো, এবং সে-উদ্দেশ্য তাঁর সার্থক হয়েছে। জ্যান্ত মানুষটাকে হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধত, প্রতিভাবান যুবক, অসীম উচ্চাশা নিয়ে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ভেসে বেড়াচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের চরমে এসে জীবনের ক্ষণপ্রদীপ অকালেই নিবিয়ে দিয়ে চ'লে গেলো—এই তো মধুসূদন। মধুসূদনের প্রতিভা ছিলো, পাণ্ডিত্য ছিলো, ছিলো দরাজ হৃদয় আর খোলা হাত, কিন্তু কোনো-একটা জিনিসের অভাবে তাঁর জীবনের এই ব্যর্থতা। সে-অভাব সংক্ষেপে এই: মধুসূদন শুধু কাব্যসাধনাই করেছিলেন, জীবন-সাধনা করেননি। তাঁর স্থৈর্য ছিলো না, আত্মিক শক্তি ছিলো না। হয়তো তাঁর স্বভাবেই অসংযমের বীজ ছিলো, কিংবা হয়তো সেকালে প্রচলিত বায়রনিয়ানার মোহে তিনি নিজের জীবন গ'ড়ে তুলেছিলেন—অর্থাৎ ভেঙে ফেলেছিলেন। মোটের উপর তাঁর মতো ট্র্যাজিক জীবন অন্য কোনো বাঙালি কবির ভাগ্যে এ-পর্যন্ত ঘটেনি। জীবনী লেখবার পক্ষে তাঁর জীবন প্রথম শ্রেণীর উপাদান।

মধুসূদনের এই বিচিত্র ব্যক্তিত্ব প্রমথবাবুর গ্রন্থে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটেছে। কাব্যসমালোচনার রাস্তা তিনি বড়ো একটা মাড়াননি, তবে মধুসূদনের তিনি গভীর ভক্ত এটা বেশ বোঝা যায়। কবির জীবনী প্রসঙ্গে কাব্যালোচনা অসঙ্গত নয়, সুতরাং এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই যা প্রমথবাবু এড়িয়ে গেছেন। সেটা এই যে অতখানি প্রতিভা নিয়েও মধুসূদনের রচনা তাঁর গ্রন্থাবলীতেই আবদ্ধ রইলো কেন—অর্থাৎ, তিনি বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের মতো পরবর্তী লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে কেন পারলেন না। তার কারণ—আমার মনে হয়—বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁর অনভিজ্ঞতা। আসলে বাংলা তিনি ভালো জানতেনই না, অভিধান দেখে-দেখে ভাড়া-করা

পণ্ডিতের সাহায্যে রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাই তাঁর রচনাশক্তির একটি আশ্চর্য নমুনা হ'য়েই রইলো, বাঙালিজাতির মর্মে প্রবেশ করলো না। অথচ মধুসূদন ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী ও প্রগাঢ় পণ্ডিত, তাই অমিত্রাক্ষরের মূলসূত্র তিনি বুদ্ধি দিয়ে আবিষ্কার করতে পারলেও কার্যত প্রয়োগ করতে পারেননি। প্রমথবাবুর গ্রন্থে উদ্ধৃত তাঁর একটি চিঠিতে তিনি বলছেন, 'নাটকের অমিত্রাক্ষরের আবৃত্তি যদি যথাযথ হয়, তবে ইংরেজী অমিত্রাক্ষর যেমন ইংরেজী গদ্যের মত শোনায়, বাংলায়ও তেমনই শোনাইবে; অবশ্য গদ্যের স্বাধীনতার সঙ্গে কাব্যের মাধুর্য্যের ছাপ জড়াইয়া থাকিবে।' তাঁর আদর্শ ছিলো ম্যাকবেথের অমিত্রাক্ষর, কিন্তু তাঁর নিজের রচনা একেবারেই গদ্যের মতো শোনালো না—আবৃত্তি যে-ভাবেই করা হোক সেটা সম্ভবই নয়। বাংলাভাষায় যথেষ্ট দখল ছিলো না ব'লেই মধুসূদনের এই ব্যর্থতা, তাঁর অমিত্রাক্ষর মৌখিক ভাষার ছন্দে স্বতঃ-উৎসারিত হয়নি, তা নির্মিত হয়েছে খুব বেশি যান্ত্রিক উপায়ে। এই কারণেই পরবর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব এত কম।

প্রমথবাবু সাহিত্যালোচনা না-করলেও সামাজিক বিষয়ে তাঁর মতামত মাঝে-মাঝে দিয়েছেন। তাঁর কোনো-কোনো মত অনেকের কাছেই অদ্ভুত ঠেকবে। 'আবার রহস্য এই যে, কেহ কেহ ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের নামেই সমাজকে ভাঙিতে আরম্ভ করিল—যেমন ব্রাহ্মসমাজ; ব্রাহ্মসমাজ সমাজহীন সমাজ; আর সমাজ না থাকিলে ধর্ম্ম থাকিবে কি করিয়া!' এখানে কথার চটক থাকলেও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি একটি অস্পষ্ট বিরুদ্ধভাব ছাড়া আর-কিছু প্রকাশ পেয়েছে ব'লে আমার মনে হয় না। বাংলার সামাজিক বিবর্তনে ব্রাহ্মসমাজের দান যে অত্যন্ত মূল্যবান এ-কথা অস্বীকার করায় ঐতিহাসিক অজ্ঞতা ছাড়া আর কি কিছু প্রকাশ পায়? নতুন গড়বার জন্যেই যেখানে ভাঙা সেখানে যারা ভাঙে তারা কালাপাহাড় নয়, তারা প্রগতির মুখপত্র।

ভাষার ব্যাপারে প্রমথবাবু মোটামুটি বঙ্কিমপন্থী। তাঁর ভাষা সুখপাঠ্য, কিন্তু তাতে rhetorics-এর পরিমাণ কিছু বেশি, এবং যতটা কবিত্ব থাকলে এ-জাতীয় আতিশয্য সহ্য হয় তাও নেই। অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত মত হিসেবেই দাখিল করছি, সকলে যে এ-মত মানবেন তা হয়তো নয়। তবে মধুসূদনের চিঠিগুলির অনুবাদে (মধুসূদন চিঠিপত্র তো সর্বদা ইংরেজিতেই লিখতেন, প্রমথবাবু তার বাংলা ক'রে দিয়েছেন) প্রমথবাবুর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের কাছে আরো কৃতিত্ব আমরা আশা করেছিলাম। 'অভিশপ্ত র‍্যাফেল'-এর মতো না-ইংরেজি না-বাংলা ভাষার চাইতে সোজাসুজি ইংরেজিই ভালো।

আষাঢ়, ১৩৪৭

বোটের উপর, এই গ্রন্থপ্রণয়নের জন্য প্রমথবাবুর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, কারণ এতে সাহিত্যিকরা যথেষ্ট চিন্তার ও বিতর্কের উপাদান পাবেন, আর সাধারণ পাঠক পাবেন নভেল পড়ার আনন্দ।

বুদ্ধদেব বসু

সম্প্রতি শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুর 'নির্বাণ' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, তাতে আছে কবির জীবনের শেষ অধ্যায়ের বর্ণনা। কবির পুত্রবধূ লিখিত এই বিবরণ তথ্য হিসেবে অমূল্য, তাছাড়া এতে আছে সাহিত্যরসের স্বাদ। বইখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অনিন্দ্য। বইখানি এখনও ঠিক 'প্রকাশিত' হয়নি, শুধু বন্ধুমহলে প্রচারের জন্য ছাপা হয়েছে; কিন্তু আমরা আশা করি বিশ্বভারতী অচিরেই এ-গ্রন্থটি সকলের অধিগম্য করবেন। আমাদের পাঠক সাধারণ এই বইটি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

ক্ষণ-শাশ্বতী, জগদীশ ভট্টাচার্য। দেড় টাকা।

প্রায় দশ বছর আগে শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য 'অষ্টাদশী' নামে একটি ক্ষীণকায় কবিতার বই বের করেছিলেন সে-রচনাগুলিতে শক্তির প্রতিশ্রুতি ছিলো। আজ তাঁর 'ক্ষণ-শাশ্বতী' হাতে পেয়ে খুশি হলাম। প্রথমেই উৎসর্গ-কবিতাটি সুন্দর, এবং অন্যান্য কবিতাগুলির জন্য পাঠকের মনকে প্রস্তুত করে।

> হাত ধ'রে চল সখি, সুরু হলো জীবনের যাত্রা—
> নিসঙ্গ সংসার, যেতে হবে প্রান্তর পারায়ে;
> এ পথে দোসর নাই, দুঃখেরো নাই কোনো মাত্রা;
> পথেরো চিহ্ন নাই, অদূরে রেখাটি গেছে হারায়ে।

ছন্দের ঝঙ্কারটি উপভোগ্য, এবং 'ক্ষণশাশ্বতী'তে ছন্দের বৈচিত্র্য ও দক্ষতা লক্ষ্য করবার। বক্তব্য বিষয়ে অভিনবত্ব বা বৈশিষ্ট্য না-থাকলেও ছন্দের মোহে পাঠক আবিষ্ট হবেন। প্রেমের কবিতাগুলিতে একটি করুণ মাধুর্য আছে।

বু. ব.

দুপুরের স্বপ্ন, বিষ্ণু ভট্টাচার্য ও যজ্ঞেশ্বর রায়। এক টাকা

যাত্রারম্ভ
চাঁদ ও রাহু } **প্রজেশকুমার রায়।** ৳০ ও ১৲

"দুপুরের স্বপ্ন" বইটি জীবনানন্দ দাশের পরিচয় পত্র নিয়ে দেখা দিয়েছে। জীবনানন্দ দাশের গদ্য জটিল; তবু সহজ-বুদ্ধিতে মনে হয় লেখকদের প্রশংসাই করেছেন। তাঁর মতো কবির মতামত সম্পূর্ণ অমান্য করতে সাহস হয় না, তাই নিজের ভাল লাগা খারাপ লাগার কথা তুলতে চাই নে। তবে খারাপই যে খুব লেগেছে তাই নয়, বস্তুত কবিজীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ হিসেবে বইটি মন্দ নয়।

প্রজেশকুমার রায়ের কবিত্ব স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এঁর লেখা সত্যি ভাল লাগল। প্রথিতযশা ব্যক্তির কাটা তিলক নেই তাঁর কপালে, ছাপা বাঁধাই অনাড়ম্বর, আত্মপ্রচারের আর সব উপায়গুলিও তিনি এড়িয়ে এসেছেন। তবু এঁর লেখা মনে দাগ কাটে, মাথা তুলে নিজের পরিচয় দিতে পারে। এঁর শব্দচয়নে সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় আছে, বিষয় নির্ব্বাচনে বৈশিষ্ট্য তিনি খোঁজেন না, নিতান্ত সাধারণ আর দৈনন্দিন তুচ্ছতাকে অনেক সময় অপরূপ করে তুলেছেন। এক-একটা টুকরো উপমা হঠাৎ এসে চমকে দেয় যেন।

তবে তাঁর রচনায় অপরিণতির লক্ষণ এখনো আছে, বড় কবিতাকে তিনি আয়ত্তে আনতে এখনো পারেন না, তাই কয়েকটি আকস্মিক সুন্দর পংক্তি সত্ত্বেও পুরো কবিতা অনেক সময় উত্তীর্ণ হয় না। আমার বিশ্বাস তাঁর ছোট কবিতাগুলোই ভাল। প্রত্যেক রসিক পাঠককে "দিনান্তে", "বৈশাখ", "সূর্য্যাস্ত", ইত্যাদি কবিতা পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সোনার কপাট, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
উড়কি ধানের মুড়কি, অন্নদাশঙ্কর রায়।
'এক পয়সায় একটি' সিরিজ। কবিতা ভবন। প্রতি গ্রন্থ চার আনা।

সম্প্রতি 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের আরো দুইখানা বই বেরিয়েছে। একখানা কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার কপাট' আর একখানা অন্নদাশঙ্কর রায়ের—'উড়কি ধানের মুড়কি।'

কামাক্ষীপ্রসাদ খ্যাতনামা লেখক এবং তাঁর কবিতার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। আর এ-কথাও অনস্বীকার্য যে তাঁর কাব্যচর্চা সার্থক। ছন্দের কারুকলায় ইনি দক্ষ। তাঁর কবিতা ভাষার সৌন্দর্যে সর্বদাই হৃদয়গ্রাহী, এবং 'সোনার কপাট' এর ব্যতিক্রম নয়। এ-বইটিতে সুন্দর কয়েকটি কবিতা যা মাত্র একবার পড়েই শেষ হয়ে যায় না। আজিকের নানারকম কলাকৌশল আছে পাতায় পাতায়, উপমার নবত্ব থেকে থেকে মনকে নাড়া দেয়। যেমন ৭নং কবিতায়:

বিচক্ষণ সার্জেনের মত
কন্‌কনে হাওয়া আমার মধ্যে ছুরি চালালো।

মিল লুকিয়ে আছে আড়ালে আবডালে, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চমকে দেয়—চোখে তাদের দেখা যায় না, কানে শোনা যায়:

হেমন্তের সূর্যভাঙা সন্ধ্যার আলোর ঝুমঝুমে ক্লান্ত চোখ চম্‌কালো। ঘুমঘুমে নেশায় নিজেকে ভাল লাগ্‌লো। (সূর্য, তোমার এত আলো।)

চিত্ররূপের বিশেষত্বও লক্ষ্য করবার:

আমার বসন্তে রং ধরেছে আর কোনো মেয়ে এসিয়ার আকাশ জয় করেছে।
... ...

'হে সূর্য হে অলস মাঠ,
আমার পুড়িয়ে খোলো সোনার কপাট।'

আষাঢ়, ১৩৪৯

মোটের উপর, প্রথম আর শেষ কবিতাটি আমার সব চেয়ে ভালো লাগলো। এই সুদৃশ্য ছোট্ট বইটি যে-কোনো শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই লোভনীয়।

এই যুদ্ধের বাজারে মানুষের মন যখন স্বতঃই ভারাক্রান্ত এবং নানারকম মতবাদের সংগ্রামে কাতর, তখন অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'উড়কি ধানের মুড়কি' খানা হাতে নিয়ে সত্যিই মনটা নিমেষে হাল্‌কা হয়ে উঠ্‌লো। চৈত্রমাসে হঠাৎ যেমন বসন্তের হাওয়া লাগলে মনটা খুশি হ'য়ে ওঠে—এও ঠিক তেমনি। প্রথমেই ভাল লাগলো বইয়ের প্রচ্ছদপটটি। কয়েকটি রেখায় নিপুণ বিন্যাস। চোখে পড়তেই যেন শিবের ছবি মনে হয়। আকৃতি নেই অথচ আছে। এই তাণ্ডবের সময়োপযোগী ছবিই বটে। এবং নামটিও চমৎকার।

উড়কি ধানের মুড়কি কয়েকটি লঘুরসের পদ্য এবং ছড়ার সমাবেশ। ছড়াগুলো এমন মজার যে পড়তে পড়তে মনটা যেন ছেলেমানুষের মত অকৃত্রিম খুসীতে ভরে যায়। থেকে থেকেই মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে ফিরছে।

করেছি পণ, নেব না পণ
বৌ যদি হয় সুন্দরী।
কিন্তু আমায় বলতে হবে
বর্ণ দিবে কয় ভরি। (৩নং)

খুড়ো হে খুড়ো গর্ত খুঁড়ো
গর্তে ঢুকে গপ্‌প জুড়ো।
সঙ্গে রেখো নস্যি গুঁড়ো
হঠাৎ হাঁচির কামান ছুঁড়ো। (৭নং)

'উড়কি ধানের মুড়কি'র বেশির ভাগ কবিতাই লড়াই নিয়ে লেখা, সেটা এর বাড়তি আকর্ষণ। 'গেরিলার গান', 'পোড়ামাটি', 'উভয়সঙ্কট', এ-সব নাম শুনলেই বোঝা যাবে কবিতাগুলি কোন জাতের। এতে বিশুদ্ধ হাস্যরস আছে, বিদ্রূপ আছে, আছে সমাজ-সমালোচনা, তার উপর ছন্দ-মিলের বাহাদুরিও আছে। মতে না-মিললেও কাব্যরস উপভোগে বাধা নেই। শেষ কবিতা দুটি ('প্রার্থনার উত্তর' ও 'দিলীপ-দাকে') সব চেয়ে সিরিয়স রচনা, বোধ হয় সব চেয়ে সুন্দরও। বর্তমান সংকটে লেখকের নিজের মনোভাবটি ঠিক কী, তাও এতে বোঝা যাবে।

এই দুর্মূল্যের সময়েও এই সিরিজের দাম যে মাত্র ষোলোটি ক'রে পয়সা, এটাই সব চেয়ে আশ্চর্য মনে হয়। এত অল্প খরচ ক'রে এমন মধুর ও গভীর আনন্দভোগের সামগ্রী যে আমরা পেতে পারি এ-কথা ভাবতে অবাক লাগে। বইগুলি নেড়ে-চেড়ে দেখতেও ভালো।

প্রতিভা বসু

প্রাচীর—সোমেন চন্দের স্মৃতিতে দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশন ৫এ, ইন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। মূল্য চার আনা।

বইখানা যে সোমেন চন্দের স্মৃতিতে প্রকাশিত এ থেকেই বোঝা যায় পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য ফ্যাশিজম্‌-এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ, এবং যে আদর্শের জন্য সোমেন চন্দ্র প্রাণ দিয়েছেন সে আদর্শের জয়গান। সে হিসেবে এর মূল্য প্রচুর। বই খানিতে অমিয় চক্রবর্ত্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মণীন্দ্র রায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অবন্তী সান্যাল, নীহার দাশগুপ্ত ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা এগারোটি কবিতা আছে। লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ বিখ্যাত, অধিকাংশই সুপরিচিত, সম্পূর্ণ অপরিচিতও দু'একজন আছেন। রচনা হিসেবে সবগুলোই সমান পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু সৌভাগ্য এই যে কারো কণ্ঠই দুর্বল নয়। যে-বিষাক্ত মতবাদ অর্ধ পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে' আমাদের দেশেও জনসাধারণের মধ্যে ভয়াবহরূপে সংক্রমিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এই এগারোটি কণ্ঠের সম্মিলিত প্রতিবাদের মূল্য সামান্য নয়।

কবিতা হিসেবেও কয়েকটি রচনা মনে স্থায়ী দাগ কেটে দেয়। যে আবেগ কবিতার জন্ম দেয়, তা কয়েকটি কবিতায় জাজ্জ্বল্যমান। বইখানির বিস্তৃত প্রচার আজ একান্ত বাঞ্ছনীয়, বিশেষত যাদের চিন্তা জীবন্ত এবং যাঁরা কবিতা ভালোবাসেন তাঁরা বইখানি পড়ে' খুশিই হবেন। বইখানা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় ছাত্রসমাজ, এবং তাঁদের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

অজিত দত্ত

রবীন্দ্রনাথ, দেবজ্যোতি বর্মণ। কুলজা সাহিত্য মন্দির, পাঁচ সিকা।

এই বইখানা রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত একটি জীবনী। ঠিক জীবনীও নয়, কবির জীবনের প্রধান ঘটনাগুলো সাংবাদিকধরনে ধারাবাহিকরূপে গ্রথিত করা হয়েছে। ক্যালকাটা ম্যুনিসিপ্যাল গেজেটে কিংবা বিশ্বভারতী কোয়াটার্লিতে প্রকাশিত 'Tagore Chronicle' যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে এ-বই নূতন ঠেকবে না; তবে ঐ পত্রিকা দুটি সকলে সংগ্রহ করতে নিশ্চয়ই পারেন নি, তাছাড়া ও দুই-ই ইংরেজিতে লেখা। বাংলায় গ্রন্থাকারে এ রকম একটি ঘটনাপঞ্জীর প্রয়োজন ছিলো, পাব্লিক লাইব্রেরিতে ও রবীন্দ্রভক্ত পাঠকসমাজে বইখানার কাটতি হবে বলে আশা করা যায়। অনেকগুলি ছবি ও একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী আছে। দিনেন্দ্র ও শমীন্দ্র এ দুটি নামের ভুল বানান ছাপা হয়েছে, আশা করি পরবর্তী সংস্করণে লেখক শোধনের সুযোগ পাবেন।

সম্পাদকীয়

সোমেন চন্দ

ঢাকায় তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ-র হত্যার সংবাদে বাংলার মনীষীমহলে যে-উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে তা একান্তই সঙ্গত। প্রথমত, সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে এ-হত্যাকাণ্ডের পিছনে পূর্বসংকল্প ছিলো, এবং এর নিছক নৃশংসতাও অকথ্য। দ্বিতীয়ত, নামহীন আততায়ীর রক্তাক্ত ছুরিকার আঘাতে যিনি প্রাণ হারালেন তিনি ছিলেন বয়েসে তরুণ, প্রতিশ্রুতিশীল সাহিত্যিক, তার উপর গণ-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কর্মী। ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘ থেকে প্রচারিত 'ক্রান্তি' বইটিতে তাঁর রচনায় সাহিত্যের স্বাদ ছিলো, এবং তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব পূর্ণতায় মুঞ্জরিত হ'তে পারলে নানাদিক দিয়েই তিনি তাঁর সমসাময়িক জীবনে আপন স্বাক্ষর এঁকে দিতে পারতেন। এই হত্যার সংবাদে মর্মাহত হননি, সাহিত্যিক ও ছাত্রসমাজে এমন কেউ যে নেই তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিলো—তাতে তাঁরা শুধু অকালে বিনষ্ট জীবনটির জন্য অনুশোচনা প্রকাশ ক'রেই ক্ষান্ত হননি, যে-জঘন্য মনোভাব এই হত্যার জন্য দায়ী তারও তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তারপর সম্প্রতি ছাত্রসমাজ একই সঙ্গে নিহতের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও হত্যাকারীর প্রতি তাঁদের ঘৃণা প্রকাশ করেছেন 'প্রাচীর' নামক কবিতার সংগ্রহটি সোমেন চন্দ-র স্মৃতিতে উৎসর্গ ক'রে। এ-শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অত্যন্ত শোভন হয়েছে, কারণ 'প্রাচীর' বইটিতে বাংলার অনেক কবি তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যে-মনোভাব সংস্কৃতি ও প্রগতির শত্রু। আমরা আশা করি ঢাকা থেকে সোমেন চন্দ-র বন্ধুরা তাঁর সম্বন্ধে একটি স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ করবেন, তাতে তাঁর নিজের কিছু-কিছু রচনা ও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে বন্ধুদের প্রীতি-তর্পণ সংগৃহীত হ'তে পারে। বইটি আকারে যদি ক্ষুদ্রও হয়, তবু আজকের দিনে তার মূল্য হবে প্রচুর।

The P. E. N. Books

আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংসদ পি. ই. এন্-এর ভারতীয় শাখা মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়ার পরিচালনায় বোম্বাইতে অধিষ্ঠিত, এ-খবর অনেকেই জানেন। সম্প্রতি ভারতীয় পি. ই. এন. "The Indian Literatures" নামে একটি গ্রন্থমালা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। এ-সিরিজে প্রত্যেক ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একটি ক'রে ইংরেজি বই প্রকাশিত হবে, তাতে

থাকবে ঐ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সেই সঙ্গে ইংরেজি তর্জমায় কিছু গদ্য-পদ্যের সংকলন। ভারতে আন্তর্প্রাদেশিক যোগাযোগের, ও ভারতের বাইরে আমাদের বিভিন্ন সাহিত্যের প্রচারের দিক থেকে এ-উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। গ্রন্থমালার প্রথম বই "Assamese Literature" প্রকাশিত হয়েছে, লেখক শ্রীযুক্ত বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া। আসামি সাহিত্যর সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজ লেখক ভালো ক'রেই সম্পন্ন করেছেন, কয়েকটি অনুবাদও উপভোগ্য। বইটির ছাপা কাগজ ও খদ্দরের বাঁধাই অতি শোভন। দাম দেড় টাকা। প্রাপ্তিস্থান—The International Book House Ltd., Ash Lane, Fort, Bombay।

অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন এ-গ্রন্থমালার প্রথম বই আসামি সাহিত্য কেন। তার কারণ ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে 'Assamese' সর্বপ্রথম এসেছে। দ্বিতীয় বই 'Bengali'—লেখক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। যথাক্রমে অন্য সব সাহিত্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমরা এ-সিরিজের অন্যান্য বই দেখতে উৎসুক থাকবো।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা

'কবিতা'র এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'প্রার্থনা' নামক একটি কবিতা কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হ'লো। বর্তমান সময়ে এ-কবিতাটি গভীর ইঙ্গিতময়। এতে যে-উদ্দীপনার বাণী আছে নানা মতে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশে আশা করি তা একেবারে ব্যর্থ হবে না এবং ঐক্যসাধনেও সহায়তা করবে। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা'য়।

মূল পাণ্ডুলিপি আমরা পেয়েছি শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর সৌজন্যে এবং বিশ্ব-ভারতীর অনুমতিক্রমে কবিতাটি এই আকারে এখানে প্রকাশিত হ'লো।

সংশোধন

গত চৈত্র সংখ্যা 'কবিতা'র ১৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'মহিমা' কবিতাটির লেখকের নাম ভ্রমক্রমে ছাপা হয়নি। কবিতাটির লেখক শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে।

চৈত্র সংখ্যা 'কবিতা'র ৩৫ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'বন্দীর বন্দনা'র সমালোচনায় একটি মারাত্মক ছাপার ভুল র'য়ে গেছে। Ode on the Intimations of Immortality—ছাপা হয়েছে Ode on the Imitations of Immortality।

'কবিতা'র আষাঢ় সংখ্যা

বর্তমান সংকটজনক অবস্থার দরুন 'কবিতা'র আষাঢ় সংখ্যা বৈশাখেই প্রকাশিত হ'লো।

আষাঢ়, ১৩৪৯

বসন্ত
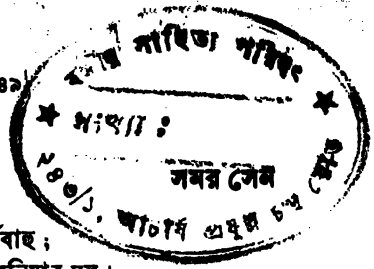
মহাত্মা স্তব্ধপ্রায়, ওয়ার্ধায় উর্ধবাহু;
এদিকে আসর জমায় অন্যান্য বেনিয়ার দল।
যদিও দিগ্বিদিকে লোকক্ষয়, সহর গ্রাম উজাড়
তামাম দুনিয়ায় চলে প্রতিবিপ্লবের ব্যভিচার
তবু আমাদের স্বার্থ শুধু নিঃস্বার্থ কারবার।
সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ অনেক দিনই করেছি বরবাদ
শুধু সঙ্গোপনে রসদ জোগানোয়
মিলে মিলে অন্ধকার বোম্বাই, আমেদাবাদ।

আসমুদ্র হিমাচল হে হিন্দুস্থান,
কানে বাজে •
ক্ষুরধার নদীসঙ্কুল চীনের আহ্বান,
কৃষ্ণসাগর থেকে বল্টিক পর্যন্ত
বিপর্যস্ত সোভিয়েটভূমির মৃত্যুঞ্জয় গান,
পোড়ামাটিতে কি চিড় ধরে, সবুজ অঙ্কুর ভিড় করে,
হে হিন্দুস্থান ?

বজ্র বাজে মধ্য আকাশে,
বসন্ত আসন্ন,
ধূলোয় ঘূর্ণী লাগে, রক্ত ছড়ায় দিনশেষের সূর্য।

ললিত বসন্তের, বেশী কথার দিন বিগত,
স্বদেশে বিভীষণ ধরে গুপ্তঘাতী হাতিয়ার,
ক্ষাত্রবীর্যের আত্মম্ভরিতায়
বিদেশী বর্বর সাজে সভ্যতার বান্দাপরওয়ার,
বিদ্যুৎগতি মৃত্যুতে
পূর্ব সীমান্তে সমাধি হোক্ তার।
ভারতসীমান্তে উদ্যত, হ্রস্ব পীত বন্ধু তার
মধ্যদিনে জলে স্থলে ফেলে দীর্ঘকায় ছায়া।
গ্রহণ লেগেছে প্রাচীন সূর্যে ;
এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হবো
যে মৃত্যু প্রাণ আনে, তার ফিনিক্স্‌ গানে,
প্রগতির সম্মিলিত বীর্যে, অক্লান্ত আত্মদানে।

ছড়া

অজিত দত্ত

১

আমার কথাটি ফুরুলো কিন্তু ফুরুলো না,
শুরু হ'লো এক নতুন সুতোয় তাঁত বোনা।
সোনালি সুতোর কারবার ছিলো বেশি মুনাফার ঝোঁকে,
আশ্বাস ছিলো নগদ জমাটা রেখে যাওয়া যাবে থোকে।
ঘরের চালায় লাগলো আগুন, রূপো পুড়ে হ'লো খাক,
পোষাকি শাড়ির বদলে এবার চেলি-টেরি বোনা যাক।

২

সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলে কুবুদ্ধি ঘনালো
আগুন-বোমা নিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছা মারিলো।
ব্যাংরা গেলো ক্ষেপে ধরলে তারা চেপে
জোয়ান সেই তাঁতিকে
তাঁতি বললে ভয় কী? কাছাড়া হয় কী?
এই কথা নাও শিখে।
তোমরা যদি মরতে পারো কিছু না-ব'লে
নিজের হাতে নিরেট মাটি খুঁড়বো শাবলে।
গড়িয়ে দেবো ছোট্টো একটা কুয়ো,
তাতে তোমরা স্বাধীনভাবে খেয়ো এবং শুয়ো।
এই না শুনে ব্যাংরা বললে, 'ভাই,
স্বাধীন আমরা হবো এবার আর তো চিন্তা নাই।'

একটি এপিগ্রাম

চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়

সোশ্যাল-শোভিনিস্ট্

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ রহে মোর প্রার্থনা—
শত্রু মিত্র বোঝাপড়া হবে শেষে।
সুযোগ বুঝে সময় মতো
মন্দ কিবা মন্ত্রণা—
শেয়ালে ছাগলে কোলাকুলি হয় দেশে।

আষাঢ়, ১৩৪৭

জীবন ও বসন্ত

নরেশ গুহ

পলাশ ফুলের নির্লাজ গৌরব
করো সার্থক আমার এ যৌবনে
রক্তিম বেশ, স্পর্দ্ধিত উল্লাস
দেবেনা? দেবে না আমার সুপ্ত মনে?
এক বসন্তে শেষ হয় যদি আলো
নিভে যায় যদি আকাশের সান্ত্বনা
বনভূমি যদি মৃত্যুর দাবী রাখে
করিব না শোক, কোনো শোক করিব না।

তবু একদিন সূর্য্য ডুবিলে পরে
স্তবকে আমার প্রদীপের শিখা জ্বালি
সন্ধ্যারে আমি করিব মধুরতর
জীবনেরে রঙে করিব বর্ণশালী।
কোন সুরম্য অপলক কালো চোখে
তুলিব জ্বালায়ে কালপুরুষের আলো—
দীপ্ত ব্যথায় উদ্দাম সুখে হাসি'
মৃত্যুর মায়া বক্ষে বাসিব ভালো।
তারপরে যদি বাদুড়েরা পাখা নেড়ে
এঁকে যায় নভে মরণের আলপনা,
আঁধারের বাঁশি বিদায়ের সুরে বাজে,
করিব না শোক, কোনো শোক করিব না।

সৈনিক

রবীন্দ্রনাথ সরকার

রত্নাকর সমুদ্রের স্থির জলে দিনান্তে ডুবুরী সূর্য্য নামে।
দূর-দ্রাক্ষা-কুঞ্জ-নিবাসিনী
প্রেয়সীর আরক্ত ওষ্ঠের মোহ দিগন্তের বিস্রস্ত আভায়;
চকিত স্মরণে তার সীসকের মতো ভারী বিদায়ের বিষণ্ণ চুম্বন।
আর বিদীর্ণ শেলের
মৃত্যুবাহী চকিত চুম্বনে
তোমার অস্তিত্বে নামে কাল-পরম্পরাগত মানবীয় বন্ধুত্বের স্বাদ।
কালো রক্তে রুদ্ধ বালুকার স্তরে স্তরে
ক্লাণ্ডার্সের উপকূলে স্বপ্নচর কামনার যুগলে সমাধি।

বিশ্বরূপ

'বাস্তব'

বাপ-দাদাদের দালান কোথায় ?
ইটের পাঁজা দেখছি পড়ে'
তবু আছে বনেদি ঘর
দেমাক তা'রি আগলে ধরে'।
পরের দোরে চাকরি খোঁজা ?
মান খোয়ানো বৈ ত নয় !
ব্যবসা করা ? জুচ্চোরি ঘোর,
পুণ্যবানের তাও কি সয় !

শকুনি গিয়েছে' চলে, পাশা গেছে ফেলে।
ইজ্জৎ নিয়ে তাই আজো ওরা খেলে ॥

সোমবার আপিসেতে সমরেশ রায়
সাহেবের তাড়া খেয়ে ক্ষোভে হয়রান
নিতে হবে শোধ এর কী করে উপায়
রাখিবে কেমন করে কেরাণীর মান !
ডালাখানি ধরে মেম সাহেবের পায়
হাসিমুখে দুটি কথা : 'থ্যাঙ্কিউ বাবু।'
পরদিন ছুটে গিয়ে সমরেশ রায়
হেঁসে কয় : "করেছি সাহেবে খুব কাবু।"

সম্পাদক ও প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু। কার্যালয় : কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা। মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা থেকে ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত।